Recommended by the Board of Secondary Education, West Bengal as a text Book on General Science for Classes IX and X of Higher Secondary, Multipurpose and School

সাধারণ বিজ্ঞান

[*FOR CLASSES IX & X*]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্. এস্-সি, বি. টি.

প্রাক্তন অধ্যক্ষ

ব্রহ্মানন্দ স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়,

রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া।

উত্তরপাড়া, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান-শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগের প্রাক্তন মুখ্য পরিদর্শক

ও

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র নাথ, এম. এস্-সি, বি. টি.

অধ্যাপক

ব্রহ্মানন্দ স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়,

রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া।

[মহাকালগুড়ি মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নাকতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের (কলিকাতা-৪৭) ভূতপূর্ব শিক্ষক]

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

1953

Published by :
M. M. Chakraborty
, Shyamacharan Dey Street,
Calcutta-12

Printed by :
Subodh Chandra Mandal
Kalpana Press Private Ltd.
9 Shibnarayan Das Lane,
Calcutta-6

REVISED SYLLABUS

(a short outlines only)

CLASS IX

A. Mechanics :—

(1) Units of length, mass, volume and time, (2) Weight, Friction and Inertia make work hard, (3) Simple machines such as Lever, Inclined plane and simple Pulleys, make work easier, (4) Newtons's laws of attraction, Elementary ideas of movements of the moon, the artificial satellites and of tides.

B. Light :—

(1) Light travels in a straight line, formation of shadows, Eclipses (both solar and lunar), (2) Reflection of light at plane and spherical mirrors. Formation of Images by plane and spherical mirrors, (3) Refraction of light, Formation of images by lenses, (4) A few common phenomena and examples due to refraction.

C. Heat :—

(1) Source of heat—Sun, mechanical action, chemical reactions, electricity, (2) Heat energy causes expansion of solids. liquids and gases, Liquids are more expansive than solids and gases are the most expansive, Expansion or [illegible] matters is utilised in various ways, (3) Heat causes change of state, Melting points of different pure elements and compounds are different, so also are the boiling points of pure liquids, Evaporation and boiling, (4) Measurement of temperature, Thermometers such as Mercury-in-glass Thermometer, Alchohol-in-glass, Doctor's clinical Thermometer, (5) Transmission of heat—conduction, Convection and Radiation, Thermoflask.

D. Chemical Reaction : -

(1) To test acids and bases with indicator (use vinegar, citric acid, Hcl, H_2So_4, Na_2 Co_3, Na Hco_3, Nacl, lime water, Caustic soda), Litmus and methyl orange and phenolphthalene as indicators—Vanishing colour. (2) Common salt, Sodium carbonate Caustic soda and lime—Nitrogeneous compounds such as Ammonium sulphates and Nitrates which are used as fertilisers, (3) Basic requirements of the soil in Agriculture, Commonly used manures.

Fixation of nitrogen by plants, Ammonium Sulphate and its use, Use of other fertilisers. (4) Our food, Protein, fats and carbohydrates—Sources and their usefulness, Names of important vitamines with Sources; their functions.

E. Human body :—

Human blood, Blood-circulation, Process of Digestion takes place in the alimentary Canal by means of mouth, teeth, tongue, gullet, Stomach, intestine, pancreas, liver.

CLASS X

A. Sound :—

(1) Sound is caused by vibration. A material medium is necessary for propagation of Sound, Reflection of Sound, Echo, Velocity of Sound is less than that of light, Lightning is seen before thunder is heard.

B Electricity :—

An electric cell (A simple voltaic cell is to be described), A few modified cells such as Daniel and Leclanche. (No explanation of Chemical reaction is required) (2) Effects of Electric current, Electromagnet—its use in Electric bell, Telephone, Telegraph. (3) Interaction of Electricity and Magnetism. (4) Electromagnetic induction. Principle of electromagnetic induction is utilised in a generator. (No detailed discussion is required) Dynamo and Motor simple outline of the principle is only required. (5) Functions of fuse-wire, Construction of a heater, regulator, Electric bulb.

C Metal and their alloys :—

(1) The physical properties and uses of the metals (iron, Copper, aluminium, zinc, silver and gold) are to be studied along with their occurence—hardness, maleability, (2) Important alloys such as Brass, Bell-metal, german-Silver.

D. Minerals and ores :—

Some alloys of iron, copper, zinc, aluminium, coal, coke and petroleum. Their origin and uses.

E· Living Beings—Elementary idea about the structure and life-history of Amoeba, Yeast and Fern.

॥ সূচীপত্র ॥

নবম শ্রেণীর পাঠ্য

দ্বিতীয় খণ্ড

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

সাধারণ বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

বলবিদ্যা
MECHANICS

মাপের একক (Unit of Measurement):

মাপ জিনিষটি আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে অপরিহার্য। হাটে-বাজারে যত ক্রয়-বিক্রয়, সবই মাপের মাধ্যমে হইয়া থাকে। আমরা যখন চাল, ডাল প্রভৃতি ক্রয় করি তখন উহাদের ওজনের (weight) পরিমাণ কিলোগ্রাম হিসাবে ধরি। কিছুদিন পূর্বে সের হিসাবে ধরিতাম। আবার, যখন কাপড় ক্রয় করি তখ: উহার দৈর্ঘ্যের (length) পরিমাণকে গজ কিম্বা মিটার হিসাবে ধরি। আবার গোয়ালা যখন আমাদের দুধ দেয় তখন সে দুধের আয়তনের (volume) পরিমাণ লিটার হিসাবে বা সের হিসাবে ধরে। তোমাদের স্কুলের দপ্তরী যখন ঘণ্টা দেয় তখন সে ঘণ্টা ও মিনিট হিসাবে দেয়। তোমরা যখন ত্রিভুজের কোণ মাপ কর তখন তাহা ডিগ্রী ধরিয়া কর। এইরূপ সর্বত্র।

তবে, উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইটি বুঝিতেছ যে, সব জিনিষের মাপ এক ধরণের হয় না। কোনটি গ্রাম, কোনটি মিটার অথবা লিটার আবার কোনটি মিনিট, ঘণ্টা, ডিগ্রী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়। এই নামগুলিকেই মাপের একক (Unit) বলে। ইহাদের পরিমাণ সর্বদাই সুবিধাজনকভাবে লওয়া হয়। যেমন ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য সুবিধাজনক একক হইল, সেন্টিমিটার। কাপড় মাপিবার সুবিধাজনক একক, মিটার। কিন্তু রাস্তার দৈর্ঘ্যের সুবিধাজনক একক, কিলো-মিটার। অতএব, **যে বস্তু মাপা হইবে তাহারই একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট পরিমাণকে (Standard) একক বলা হয়।**

এক্ষণে, এই সব এককের মধ্যে আমরা কেবল দৈর্ঘ্য (length), ভর (mass), আয়তন (volume), এবং সময়ের (time) একক লইয়া আলোচনা করিব।

দৈর্ঘ্যের একক (Unit of Length):

দৈর্ঘ্যের একক সেন্টিমিটার।

সাধারণতঃ সেন্টিমিটারকে দৈর্ঘের একক ধরা হয়। তবে খুব ছোট দৈর্ঘ মাপিবার জন্য সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশকেও (যেমন মিলিমিটার) একক ধরা হয়। আবার বড় বড় দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সেন্টিমিটারের গুণিতাংশকে (যেমন কিলোমিটার) একক হিসাবে ধরা হয়। সেন্টিমিটার হইল এক মিটারের একশত ভাগের এক ভাগ। এক মিটার দুই হাতেরও কিছু বেশী (1 মিটার = 39·37 ইঃ লম্বা)। ফরাসী দেশের এক জায়গায় (International Bureau of Weights and Measures) রক্ষিত একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ডের (যাহার তাপমাত্রা 0° সেন্টিগ্রেড্) উপর দুইটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যবর্তী দূরত্বকে এক মিটার ধরা হয়।

ভরের একক (Unit of Mass):

ভরের একক গ্রাম।

সাধারণতঃ গ্রামকেই ভরের একক ধরা হয়।

১০০ গ্রাম ভরের চিনি মানে ১০০ গ্রাম ওজনের চিনি নয়, উহার মানে ১০০ গ্রাম পরিমাণের চিনি নামক পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাহাকেই সেই বস্তুর ভর (mass) বলে। আমরা কিন্তু অনেক সময় ভরকেই ওজন ধরিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বিজ্ঞানের ভাষায় ওজন হইল বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণের (force) পরিমাণ। অতএব, ভর (mass) বলিতে পদার্থের পরিমাণ (Quantity of matter) বুঝায়, আর ওজন (weight) বলিতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি (force of gravity) বুঝায়।

প্যারিসে-রক্ষিত একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম খণ্ডের ভরকে বলা হয় কিলোগ্রাম। আর এক কিলোগ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে বলা হয় গ্রাম। অবশ্য সাধারণভাবে এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ জলকে 4°C (সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রায় রাখিলে উহার ভরকেই এক গ্রাম ধরা হয়।

আয়তনের একক (Unit of Volume)

আয়তনের একক ঘন-সেন্টিগ্রাম।

এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, এক সেন্টিমিটার প্রস্থ ও এক সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানে যে পরিমাণ বস্তু ধরে তাহাকেই সেই বস্তুর একঘন

সেন্টিমিটার (1 cubic-centimetre or 1. c. c.) বলে। গ্যাসীয় বা তরল পদার্থের বেলায় বহু ক্ষেত্রে লিটারকেও (litre) আয়তনের একক ধরা হয়।

1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিলিটার

সময়ের একক (Unit of Time)

সময়ের একক সেকেণ্ড।

এক সৌর দিনের অর্থাৎ 24 ঘণ্টার, $\frac{1}{24\times60\times60}$ অংশকে এক সেকেণ্ড বলা হয়।

কার্য (Work) :

কর্মময় এ জগৎ। এখানে কাজের অন্ত নাই। কেহ মোট বহিতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ মাঠে চাষ করিতেছে কেহবা অফিস-আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু শুধু যে দৈহিক পরিশ্রম করিয়াই মানুষ কার্য করিতেছে তাহা নহে। মানুষ যখন চুপচাপ বসিয়া থাকে বা নাক ডাকাইয়া ঘুমায় তখনও তাহাদের হৃদ্‌পিণ্ড ধুক্ ধুক্ করিয়া কাজ করিয়া চলে।

সাধারণভাবে কোন কিছু করাকেই আমরা কাজ বলি। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় 'কার্য' কথাটির সংজ্ঞা একটু পৃথক। নিম্নের আলোচনা হইতে ব্যাপারটি স্পষ্ট হইবে; দুষ্টু ছেলেরা যখন মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, পুকুরে ডিগ ডুবিয়া
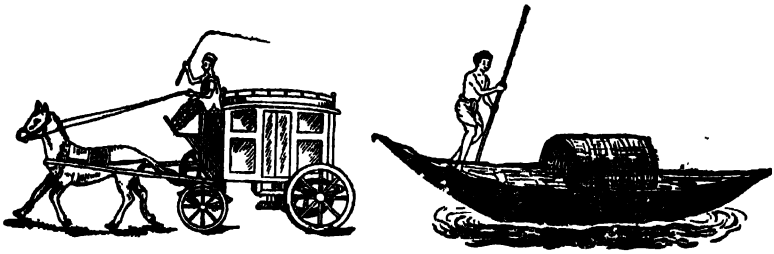
ঘোড়া গাড়ি টানিয়া এবং মাঝি নৌকা বাহিয়া কার্য করিতেছে।
১নং চিত্র

মারে, অথবা সাঁতার কাটে তখন কিন্তু সাধারণভাবে তাহাকে আমরা কার্য করা বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলিও এক এক প্রকার কার্য। আবার মনে কর কোন লোক একটি বড় পাথরের খণ্ডকে সরাইবার জন্য

বার বার ধাক্কা দিতেছে কিন্তু সেটি সরিতেছে না। ফলে, সে গলদঘর্ম হইয়াও পাথরখণ্ডকে একটুকু সরাইতে পারিল না। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা বলিব যে লোকটি পাথর খণ্ডটিকে সরাইবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম অর্থাৎ কার্য করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় লোকটির দ্বারা কোন কাজই হয় নাই। কারণ, যে বস্তুর উপর সে বলপ্রয়োগ করিয়াছে তাহার এতটুকু স্থানচ্যুতি ঘটে নাই।

কাজেই, বিজ্ঞানের দিক হইতে কার্য সম্পাদিত হওয়ার জন্য কিছু বলের (force) যেমন প্রয়োজন, বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটাও তেমনি প্রয়োজন।
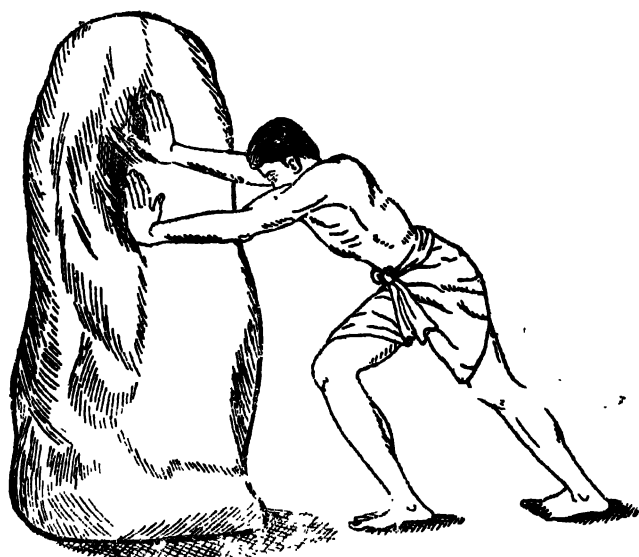
বার বার ধাক্কা দিয়াও পাথর খণ্ডের স্থানচ্যুতি না হওয়ায় কোন কার্য হয় নাই।

২নং চিত্র

অতএব বিজ্ঞানের ভাষায় কার্যের সং হইবে—"কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে যদি সে বস্তুতে গতির সঞ্চার হয়, তবেই আমরা বলিব যে কার্য হইতেছে।"

বস্তুতে যে গতির সঞ্চার হয় তাহা অবশ্য প্রযুক্ত বলের অভিমুখে, বা বিপরীত অভিমুখে, দুইই হইতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বল কর্তৃক কার্য করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। তবে, প্রথম ক্ষেত্রে কার্য বলের পক্ষে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলের বিপক্ষে ধরা হইবে। গাছ হইতে যখন আম

পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য মাটিতে পড়ে তখন আমের স্থানচ্যুতি প্রযুক্ত বলের অভিমুখে হয়। আর যখন আমরা কূয়া হইতে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে জল উপরে তুলিয়া আনি তখন জলের স্থানচ্যুতি আকর্ষণ-বলের বিপরীত অভিমুখে ঘটে।

কার্যের মাপ (Measure of work):

কোন কার্যের পরিমাপ করিতে গেলে দুইটি জিনিষের জ্ঞান দরকার হয়। যথা (১) প্রযুক্ত বল কতটা এবং (২) বলের প্রয়োগ-বিন্দুর স্থানচ্যুতি কতটা। নিম্নের উদাহরণ হইতে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে—

মনে কর একজন মজুর এক কুইন্টাল কয়লা একটি বাড়ীর একতলায় ছাদে উঠাইল। অপর একজন মজুর ঐ কয়লা দুই তলার ছাদে উঠাইল। উভয়েই সম পরিমাণ কয়লা ছাদে উঠাইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে উভয়েরই কার্যের পরিমাণ সমান। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে মজুর দুইতলায় কয়লা উঠাইয়াছে তাহার কার্যের পরিমাণ বেশী। কারণ, সে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কয়লার অধিক স্থানচ্যুতি ঘটাইয়াছে। অতএব, কার্য কম করা হইল, কি বেশী করা হইল তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইলে বস্তুর উপর কতটা বল প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে এবং উহার ফলে প্রয়োগ-বিন্দুর কতটা স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহার হিসাবও করিতে হইবে। যদি কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল P এবং প্রয়োগ-বিন্দুর স্থানচ্যুতি S (দূরত্ব) হয় তাহা হইলে কার্য (W) কিরূপ হইবে তাহা নিম্নে চিত্র এবং সূত্রাকারে দেখান হইল।

কার্যের পরিমাণ = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগ-বিন্দুর স্থানচ্যুতির দূরত্ব।

= প্রযুক্ত বল × অপসারিত দূরত্ব।

অর্থাৎ, $W = P.S.$
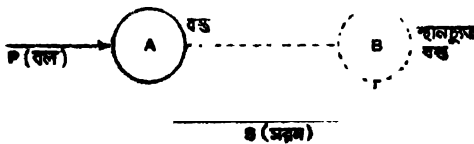
কার্যের মান নিরূপণ

৩নং চিত্র

কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ?

তোমরা সকলেই জান যে কাজ করিতে কিছু না কিছু কষ্ট হয়। যখন মজুর মাল বহন করে ঠেলাওয়ালা মালবোঝাই গাড়ী টানে, ছেলেরা খেলাধূলা করে, অথবা গরু গাড়ী টানে,—তখন তাহাদের প্রত্যেককেই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেখায়। তাহাদের ঘর্মাক্ত দেহ দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে কাজ করিতে বেশ কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কেন কষ্ট হয় ?

আমরা জানি প্রত্যেক কাজ করিবার সময়ই কিছু না কিছু বাধা (resistance) অতিক্রম করিতে হয়। বাধা অতিক্রম করিতে হয় বলিয়াই বলের প্রয়োজন হয়। ঐ বল আমরা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বস্তুতে প্রয়োগ করিয়া থাকি। তাহারই ফলে, আমরা কার্য করিবার জন্য ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি। কার্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তিন প্রাকার বাধা আসিয়া থাকে। যথা,

(ক) বস্তুর ওজনের (weight) দরুণ বাধা, (খ) ঘর্ষণ (friction) জনিত বাধা ও (গ) বস্তুর জড়তা বা জাড্য (inertia) জনিত বাধা। নিম্নে উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

বস্তুর ওজনের দরুণ বাধা ঃ—

পৃথিবীর সব বস্তুই আমাদের কাছে কিছু না কিছু ভারী বোধ হয় কিন্তু কেন ভারী বোধ হয় ? কারণ, পৃথিবী সব বস্তুকেই তাহার নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আবার ঐ একই কারণে ফল পাকিলে গাছ হইতে মাটিতে পড়িতেছে, আকাশে উঠিতেছে না। পৃথিবীর এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণকে অভিকর্ষ (gravity) বলে। অভিকর্ষ জনিত বলের জন্যই প্রত্যেক বস্তু ভারী বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিবে। যে বস্তুর পরিমাণ যত বেশী হইবে পৃথিবীর আকর্ষণও তাহার উপর তত বেশী হইবে। ফলে, ওজনও বাড়িয়া যাইবে। এক প্যাকেট চাউলের চাইতে একবস্তা চাউলের ওজন বেশী হইবে।

যখন আমরা কূপ হইতে জল তুলি তখন আমরা কষ্ট অনুভব করি ইহার কারণ জলভর্তি বালতিকে পৃথিবী নিচের দিকে টানিয়া রাখিতে চায়, আর ঐ টানের বিরুদ্ধে আমরা বালতিকে টানিয়া উপরে তুলি। পৃথিবীর নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ বালতির উপর পড়ে, ফলে উহার ওজন হয়। এই ওজন-জনিত বাধা কাটাইয়া কার্য করিতে হয় বলিয়াই আমরা কষ্ট অনুভব করি। এই ভাবে যে কোন জিনিষকে মাটি হইতে উপরে তুলিতে আমাদের কষ্ট হয়। যদি পৃথিবীর আকর্ষণ না থাকিত তবে কোন বস্তুরই ওজন থাকিত না এবং আমাদেরও কার্য করিতে কষ্ট হইত না।
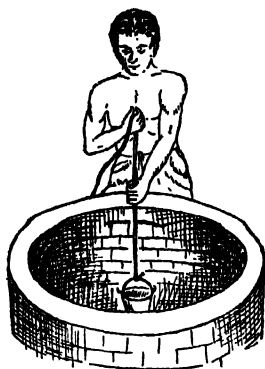
এক বালতি জল তুলিয়া ওজন-জনিত বাধা অতিক্রম করিতেছে।
৪নং চিত্র

ঘর্ষণ-জনিত বাধা :

কার্য সম্পন্ন করিবার দ্বিতীয় বাধা হইল ঘর্ষণ-জনিত বাধা। একটি বলকে যদি অমসৃণ মাঠে গড়াইয়া দাও তবে দেখিবে কিছুদূর গিয়াই বলটি থামিয়া যাইবে কিন্তু যদি পাকা রাস্তার উপর গড়াইয়া দাও, তবে উহা অনেক দূর পর্যন্ত গিয়া তারপর থামিবে। তোমরা অনেকেই জান যে বালি বা ঘাসের উপর সাইকেল চালাইতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু পিচ ঢালা রাস্তায় সহজেই সাইকেল চালান যায়। একটি কাঠের গুড়িকে টানিয়া গতিশীল করার চাইতে গড়াইয়া গতিশীল করা অনেক সহজ। ইহার কারণ আছে।

কারণ এই যে, যখন দুইটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে এবং উহাদের একটিকে বল প্রয়োগ করিয়া গতিশীল করার চেষ্টা করা হয় তখন বস্তু দুইটির মিলন-তলে একটি বিপরীত বলের সৃষ্টি হয়। প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে ইহা ক্রিয়া করে। এই বাধাকেই ঘর্ষণ-জনিত বাধা বলে। ঘর্ষণ-জনিত বাধা বস্তুর ওজন এবং দুই মিলন-তলের মসৃণতার উপর নির্ভর করে। বস্তুর একক

যত বেশী হইবে এবং উহার মিলন-তল যত বেশী অমসৃণ হইবে ঘর্ষণ-জনিত বাধাও তত অধিক হইবে। সেইজন্যই মালবোঝাই ঠেলাগাড়ী অপেক্ষা খালি
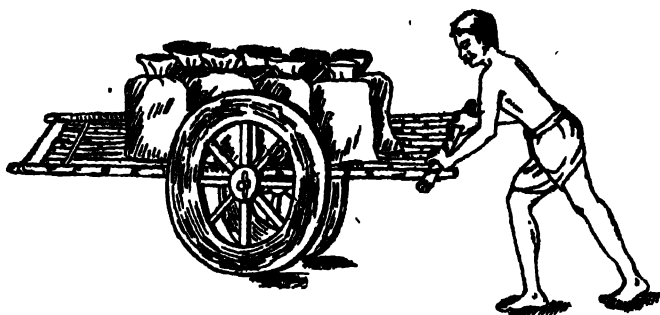
গাড়ি ঠেলিয়া ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতেছে।
৫নং চিত্র

গাড়ী টানা সহজ। আবার অসমতল ঘাসের মাঠ অপেক্ষা পিচ ঢালা রাস্তা গাড়ী টানা সহজ হয়। মনে রাখিবে, গাড়ীকে আমরা যে দিকে গতিশীল করিতে চাই ঘর্ষণ-জনিত বাধা তাহার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অর্থাৎ গাড়ীর গতিকে কমাইতে চেষ্টা করে। গাড়ীর গতিকে কমাইবার জন্য যে বাধার সৃষ্টি হয় তাহাকে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়াই আমরা গাড়ী টানিতে কষ্ট পাই। ঠিক একই কারণে অসমতল মাঠের উপর দিয়া যখন রোলার টানা হয় তখন কষ্ট হয়। চলন্ত মোটর গাড়ী বা এরোপ্লেনকে বায়ুর ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে হয়। সেজন্য আজকাল উহাদের দেহ এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যেন ঘর্ষণ-জনিত বাধা যথাসম্ভব কম হয়।

তবে ঘর্ষণ যেমন একদিকে আমাদের অনেক কাজকে কঠিন করে তেমনি অন্যদিকে কিছু কিছু কাজে অনেক সুবিধাও করিয়া দেয়।

যদি ঘর্ষণ-জনিত বাধা না থাকিত তবে আমরা কোন জিনিষকে সহজে হাতে রাখিতে পারিতাম না,—উহা পিছলাইয়া হাত হইতে পড়িয়া যাইত পিচ্ছিল রাস্তায় হাটিতে গেলে আমরা প্রায়ই পিছলাইয়া পড়িয়া যাই। ইহার কারণ পিচ্ছিল রাস্তায় হাটার সময় ঘর্ষণ-জনিত বাধা খুবই কম হয়। ফলে মাটিতে পা আটকাইয়া রাখার অসুবিধা হয়। ঘর্ষণ না থাকিলে আমরা গাছে উঠিতে পারিতাম না, দড়িতে গিট দিতে পারিতাম না, গাড়ীর চাকা চলিত না এবং আরও অনেক রকম অসুবিধা ঘটিত।

তবে, ঘর্ষণের জন্য কাজ করিতে কষ্ট হয় বলিয়া উহাকে আমরা নানা উপায়ে কমাইতে চেষ্টা করি, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঘর্ষণ-বল কমাইবার জন্য ট্রাম ও ট্রেন লাইন মসৃণ রেলের তৈরী করা হয় এবং গাড়ীর চাকা গোলাকৃতি করা হয়। যন্ত্রপাতির চাকায় ভেসলিন বা ঐ জাতীয় তৈল (Lubricating oil) দেওয়ারও ঐ একই উদ্দেশ্য।

বস্তুর জাড্য বা জড়তা-জনিত বাধা :—

জড় পদার্থ যেমন অবস্থায় থাকে, ঠিক তেমন অবস্থায়ই চিরকাল থাকিতে চায়। যদি উহা স্থির থাকে তবে সর্বদাই স্থির থাকিতে চাহিবে। আবার যদি সচল অবস্থায় থাকে তবে সর্বদাই সচল থাকিতে চাহিবে। ইহাই নিয়ম। জড় বস্তুর এই প্রবণতাকে আমরা জড়তা বা জাড্য (inertia) বলিয়া থাকি। জড়বস্তুর স্থির বা সচল, যে-কোন অবস্থারই পরিবর্তন করিতে হইলে বাহ্যিক বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যেমন, চলন্ত গাড়ীকে থামাইতে বল প্রয়োগ করিতে হয়। আবার, স্থির গাড়ীকে সচল করিতে বল প্রয়োগ করিতে হয়

জাড্য দুই প্রকারের হয়,—গতিজাড্য (inertia of motion) এবং স্থিতিজাড্য ([illegible] of rest)। সচল অবস্থায় বস্তুর মধ্যে গতিজাড্যের সৃষ্টি হয় এবং গতিজাড্য বস্তুকে চলন্ত অবস্থায় রাখিতে চায়। তাই কোন চলন্ত বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনিতে গতিজাড্য-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে
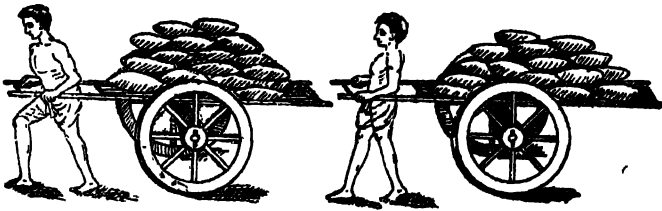
প্রথমে স্থিতিজাড্য-জনিত বাধা অতিক্রম করিয়া স্থির গাড়ীকে সচল করা হয় এবং পরে গতিজাড্যের বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করিয়া চলন্ত গাড়ী থামাইতে হয়।

৬নং চিত্র

হয়। ফলে, আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি। আবার স্থির বস্তু স্থিতিজাড্যের প্রভাবের অধীন থাকে। অর্থাৎ স্থিতিজাড্য বস্তুকে স্থির অবস্থায় রাখিতে চায়। তাই, কোন স্থির বস্তুকে সচল করিতে স্থিতিজাড্য-জনিত বা

অতিক্রম করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে কার্য করিতে গেলে স্থিতি বা গতিজাড্যের বাধাকে অতিক্রম করিতে হয়। ফলে, উহাদের জন্যও কার্য করিতে কষ্ট হয়। যেমন স্থির মাল বোঝাই কোন ঠেলাগাড়ীকে প্রথমে চালাইতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু একবার চলিতে আরম্ভ করিলে আর তেমন কষ্ট হয়না। আবার চলন্ত ঠেলাগাড়ীকে সহসা থামাইতে গেলেও বেশ কষ্ট হয়, তাহাকে বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে থামাইতে হয়।

কার্যকে সহজ করিবার সরল যন্ত্রপাতি (Simple machines to make work easier) :—

কার্য করিতে হইলে ওজন-জনিত বাধা, ঘর্ষণ-জনিত বাধা এবং জাড্য-জনিত বাধাকে অতিক্রম করিতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের কষ্ট হয়—একথা বলা হইয়াছে। তবে, মনুষ্য সেই কষ্টকে লাঘব করিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে মানুষ এক বিচিত্র যান্ত্রিক যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে। এখন যে কোন কাজ সম্পাদন করিতেই সে কোন-না-কোন যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। 'বলের কাজ কলে করে'—এই কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হাতপাখার ভার লইয়াছে বৈদ্যুতিক পাখা, কলের লাঙ্গল জমি চাষ করিতেছে, ইঞ্জিন মালগাড়ী টানিতেছে। এইরকম আরও হাজার রকমের যন্ত্র আমরা আজকাল চলার পথে নিত্য দেখিতে পাইতেছি। আমরা এখানে মাত্র কয়েক প্রকার সরল যন্ত্রের কথা লইয়া আলোচনা করিব।

যন্ত্র দ্বারা অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে কার্য সম্পাদন করা যায়। অতএব, **যে ব্যবস্থা বা বস্তু অল্প পরিশ্রমে বেশী কার্য করিতে সাহায্য করে** তাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় যন্ত্র বলা যাইতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সুবিধা পাইয়া থাকি তাহাকেই সংক্ষেপে **যান্ত্রিক সুবিধা** (**mechanical advantage**) বলা হয়। কোন ভারী জিনিষ তুলিবার বেলায় এই সুবিধাটি কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য কর। সেক্ষেত্রে, এই সুবিধাটি উত্তোলিত-ভার এবং প্রদত্ত-বলের অনুপাতের সমান হয়। অর্থাৎ ভার যদি হয় W এবং প্রদত্ত বল যদি হয় P তবে—

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{উত্তোলিত ভার}}{\text{প্রদত্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

মনে রাখিবে যে এই অনুপাত 1 (এক) অপেক্ষা বেশী হইলে যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা থাকিবে, আর যদি এক অপেক্ষা কম হয় তবে কোনরূপ যান্ত্রিক সুবিধা থাকিবে না। উদাহরণ স্বরূপ।

(1) লিভার (lever) (2) কপিকল (pulley) (3) আনততল (Inclined plane) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল সরল যন্ত্রের সাহয্যে আমরা সহজেই যান্ত্রিক সুবিধা পাইতে পারি।

লিভার বা দণ্ড (Lever) :—

একটি শক্ত সরল বা বাঁকা দণ্ডকে একটি স্থির বিন্দুতে রাখিয়া যদি উহাকে চারিপার্শ্বে ঘুরান যায় তবে দণ্ডটিকে লিভার (Lever) বলা যাইবে। যে বিন্দুতে লিভার বা দণ্ডটি স্থির থাকিবে তাহাকে আলম্ব-বিন্দু (fulcrum) বলে (৭নং চিত্রে F আলম্ব বিন্দু)। নিয়ম এই যে দণ্ডের এক বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হইবে এবং অপর বিন্দুতে ওজন রাখা হইবে। বল-প্রয়োগ-বিন্দু এবং আলম্বের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বল-বাহু (৭ নং চিত্রে P F) এবং ওজন-প্রয়োগ-বিন্দু এবং আলম্বের মধ্যবর্তী অংশকে ওজন-বাহু (৭নং চিত্রে FW) বলে। মনে রাখিবে লিভার সর্বদাই
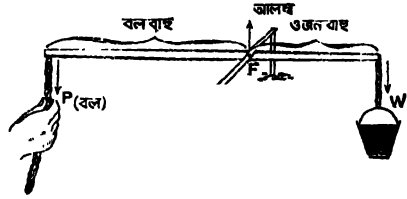
৭ নং চিত্র লিভার

বল × বলবাহু = ভার × ভারবাহু হয়। ইহাকেই লিভারের সূত্র বলা হয়। আলম্বের অবস্থান অনুযায়ী লিভার তিন প্রকারের হইতে পারে ; যথা— (ক) প্রথম শ্রেণীর লিভার (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এবং (গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

(ক) প্রথম শ্রেণীর লিভার :—

এই শ্রেণীর লিভারে ওজন-বাহু এবং বল-বাহু আলম্বের দুই দিকে থাকে।
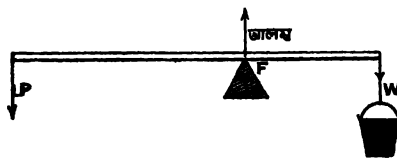
৮নং চিত্র প্রথম (

৮ নং চিত্রে PF বল-বাহু এবং FW ওজন-বাহু। উহাদের মধ্যস্থলে আলম্ব

বিন্দু F অবস্থিত। ঢেঁকি, দাঁড়িপাল্লা, নলকূপের হাতল, চাড় দিয়া তুলিবার

ঢেঁকি
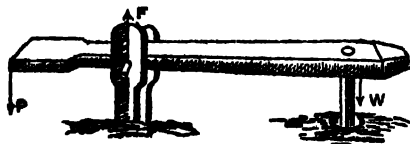
৯ (ক) নং চিত্র

শাবল, কয়লা তুলিবার বেল্চা, কাঁচি প্রভৃতি এই শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ।

শাবল
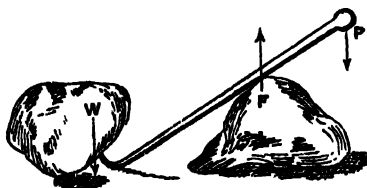
৯ (খ) নং চিত্র

F = আলম্ব, P = বল এবং W = ওজন

লিভারের সূত্রানুযায়ী, ওজন × ওজন-বাহু = বল × বল-বাহু

বা, W × ওজন-বাহু = P × বল-বাহু

বা, $\frac{W}{P} = \frac{\text{বল-বাহু}}{\text{ওজন-বাহু}}$। সুতরাং, প্রথম শ্রেণীর লিভার

বল-বাহুকে ওজন-বাহু অপেক্ষা বড় করিলেই যান্ত্রিক-সুবিধা পাওয়া যাইবে।

কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, $\frac{W}{P}$ = যান্ত্রিক সুবিধা।

অতএব, লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা = $\frac{\text{বল-বাহু}}{\text{ওজন-বাহু}}$

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার—

এই শ্রেণী লিভারে এক প্রান্তে আলম্ব (F) এবং অপর প্রান্তে বল-বিন্দু (P)

থাকে আর মাঝখানের যে কোন এক বিন্দুতে ওজন (W) রাখা হয়। ফলে, এই শ্রেণী লিভারে বল-বাহু সর্বদাই ওজন-বাহু অপেক্ষা বড় হয়। (১০ নং চিত্র লক্ষ্য
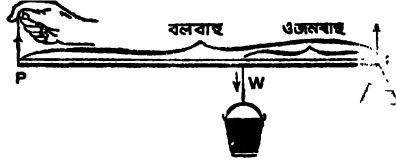
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার
১০ নং চিত্র

কর) সুতরাং এই লিভারে $\frac{\text{বল-বাহু}}{\text{ভার-বাহু}}$ এর ফল এক (1) হইতে সর্বদাই বড় হয় এবং যান্ত্রিক সুবিধা যে কোন অবস্থাতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এখানে কম
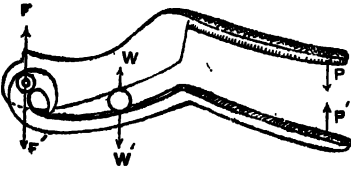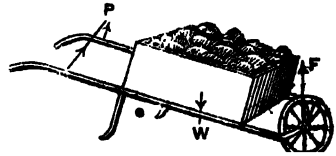
যাঁতি হাতগাড়ি
১১ নং চিত্র

বল প্রয়োগ করিয়াই বেশী ওজন তোলা যায়। এক চাকার হাত-গাড়ী (Wheel barrow), সুপারি-কাটা যাঁতি, নৌকার দাঁড়, কর্ক-চাপা (cork-squeezer) প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার—

এই শ্রেণীর লিভারে এক প্রান্তে আলম্ব, অপর প্রান্তে ওজন এবং উহাদের মধ্যবর্তী কোন এক বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয়। (১২ নং চিত্র দেখ)
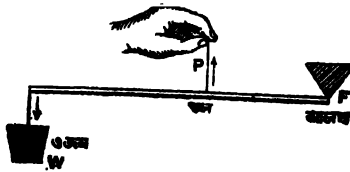
তৃতীয় শ্রেণীর লিভার
১২ নং চিত্র

এই শ্রেণীর লিভারে ওজন-বাহু সর্বদাই বল-বাহু অপেক্ষা বড় থাকে সুতরাং

ইহাতে $\frac{\text{বল-বাহু}}{\text{ওজন-বাহু}}$ এই অনুপাত এক (1) অপেক্ষা কম হয়। অর্থাৎ, এই প্রকার লিভারে কোন প্রকার যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তথাপি, যে সব ক্ষেত্রে ভার উত্তোলনের জন্য সরাসরি বল প্রয়োগের সুবিধা থাকে না, অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহারেও অসুবিধা হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয়
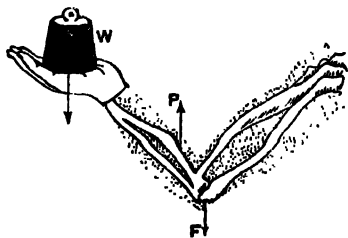
মানুষের হাত
১৩ নং চিত্র
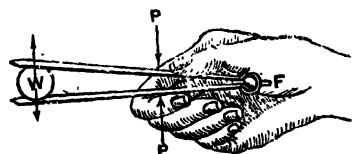
চিম্‌টা
১৪ নং চিত্র

শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করা হয়। চিম্‌টা মানুষের হাত প্রভৃতি এই শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। মানুষের বাহুর হাড় হইল দণ্ড, কনুই আলম্ব ও মাংসপেশীর সাহায্যে বাহুর মাঝখানে বল প্রযুক্ত হয়। আর হাতের তালুতে থাকে ওজন।

কপিকল (Pulley)

কাজকে সহজ করিবার আর এক প্রকার যন্ত্র হইল কপিকল (Pulley)। কপিকল বা পুলি তোমরা হয়ত সকলেই দেখিয়াছ। ইহা একটি চাকা। চাকাটি একটি অনুভূমিক (horizontal) অক্ষের সঙ্গে আটকানো থাকে এবং উহা অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে। চাকার পরিধির উপর খাঁজ কাটা থাকে। খাঁজের উপর দড়ি পরাইয়া একপ্রান্তে ওজন বাঁধা হয় আর অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করা হয়। এই অবস্থায় পুলি বা কপিকল অক্ষের উপর ঘুরিয়া কোন বস্তুকে উপরে তুলিতে সাহায্য করে।
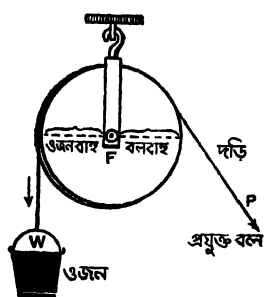
১৫ নং চিত্র একটি স্থির পুলি

কপিকলকে একটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এখানে কপিকলের অক্ষ আলম্বের কাজ করে আর আলম্বের উভয়পার্শ্বের বল-বাহু এবং ওজন-বাহু হইল চাকার ব্যাসার্ধদ্বয়।

একটি চাকা দিয়া কপিকল তৈয়ার করা যায়। আবার অনেকগুলি চাকার সমবায়েও কপিকল যন্ত্র তৈয়ার করা যায়। একটি চাকা দিয়া তৈয়ারী কপিকল স্থির থাকে এবং উহাতে কোন যান্ত্রিক সুবিধা থাকে না। উহাকে প্রথম শ্রেণীর কপিকল বলে। আমরা লিভারের সূত্র হইতে জানি—বল × বল-বাহু = ওজন × ওজন-বাহু। কিন্তু পুলির বল-বাহু = ওজন-বাহু। কারণ, উভয়ই পুলির চাকার ব্যাসার্ধ। সুতরাং, প্রথম শ্রেণীর পুলির ক্ষেত্র বল = ওজন, অর্থাৎ যত বল প্রয়োগ করিবে তত ওজনের মাল তুলিতে পারিবে। তাই এই শ্রেণীর কপিকলে কোনরূপ যান্ত্রিক সুবিধা নাই। তবে ইহার সাহায্যে আমরা কাজকে কতকটা সহজ করিতে পারি। যেমন, (ক) কূপ হইতে সোজা দড়ি টানিয়া জলপূর্ণ বালতি তুলিতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু যদি কপিকলের সাহায্যে বালতিকে তুলি তবে দড়িটাকে নিচের দিকে টানিতে হয় বলিয়া কষ্ট কম হয়। (খ) আবার নিচের দিকে টানার সময় আমরা প্রযুক্ত-বলের সঙ্গে দেহের ওজনটাও যোগ করিয়া দিতে পারি। ফলে, প্রযুক্ত-বলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (গ) কপিকলের সাহায্যে কোন জিনিষকে উপরে বা এদিক-ওদিক সরাইতে হইলেও মাটিতে দাঁড়াইয়াই করা যায়। নিজেদের উপরে বা নিচে বা এদিক ওদিক যাইবার প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার কপিকলের সাহায্যে প্রেক্ষাগৃহের পর্দা সরানো, পাখা টানা, বড় বড় আলো ঝুলানো প্রভৃতি কাজ সহজে করা যায়।

এইবার আমরা একাধিক চাকাযুক্ত কপিকলের বিষয় আলোচনা করিব। ইহারা চলনশীল থাকে। অর্থাৎ চাকাগুলির উঠানামা হয়। [১৬ নং চিত্র দেখ]

১৬ নং চিত্র চলনশীল কপিকল

চিত্রে দুইটি কপিকল দেখানো হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে A কপিকলটি চলনশীল। ইহার কাঠামোতে ওজন W ঝুলানো থাকে। দড়ির একপ্রান্ত একটি স্থির বিন্দুতে বাধা থাকে আর অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করা হয়। দড়িটাকে প্রথম চলনশীল কপিকলের নিচ দিয়া দেওয়া হয়। পরে স্থির-কপিকলের উপর দিয়া ঘুরাইয়া হাতের কাছে আনা হয়। চলনশীল কপিকল দুইটি দড়ির দ্বারা ঝুলানো থাকে বলিয়া উহাতে ঝুলান ওজন W এর টান, T ও T এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। অর্থাৎ, $W = T + T = 2T$
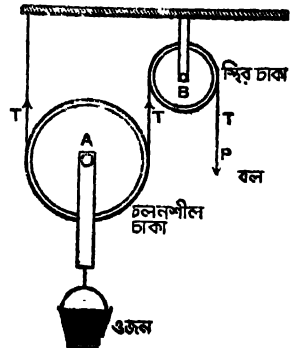
হয়। আবার স্থির পুলির উভয় পার্শ্বের বল ও ওজন সমান থাকে। তাহা তোমারা পূর্বেই জানিয়াছ। সুতরাং স্থির পুলির দড়িতে প্রযুক্ত বল P দড়ির টান T-এর সমান হয়। অর্থাৎ P = T.

সুতরাং, এখানে যান্ত্রিক সুবিধা হয় :

$$\frac{W}{P}=\frac{2T}{T}=2$$

অর্থাৎ, এই শ্রেণীর চলনশীল পুলিতে একগুণ বল প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ওজন তোলা যায়।

এছাড়া, আরও নানা ধরণের চলনশীল কপিকলের সমবায় করা হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তাহাদের আলোচনা সংক্ষেপে করা হইল। ১৭ নং এবং ১৮ নং চিত্রের প্রত্যেকটি কপিকলের নিচ দিয়া একটি করিয়া পৃথক দড়ি
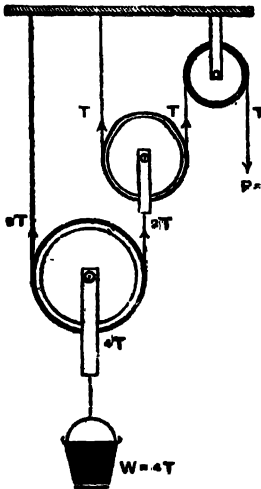
চলনশীল কপিকল
১৭ নং চিত্র
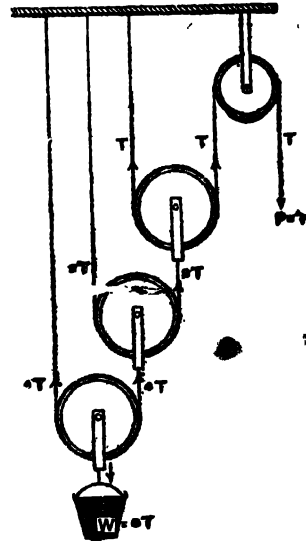
চলনশীল কপিকল
১৮ নং চিত্র

গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি কপিকলই সচল। উপরের একটি মাত্র কপিকল স্থির। এই স্থির কপিকলটির কোন যান্ত্রিক সুবিধা নাই। কিন্তু অন্যান্য সচল কপিকলগুলির প্রত্যেকটিই কিছু কিছু যান্ত্রিক সুবিধা দিয়া থাকে। দড়িগুলির এক প্রান্ত একটি স্থির দণ্ডের সহিত আটকানো থাকে এবং অন্য প্রান্ত এক একটি কপিকলের নিচ দিয়া জড়াইয়া লইয়া উপরের কপিকলের কেন্দ্রস্থল বাঁধা থাকে।

পূর্বের ন্যায় যান্ত্রিক সুবিধা গণনা করিলে ইহাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাইবে—

(1) যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{W}{P} = \frac{4T}{T} = 4$ (১৭ নং চিত্রের জন্য)

(2) যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{W}{P} = \frac{8T}{T} = 8$ (১৮ নং চিত্রের জন্য)

এই জাতীয় পুলির সমবায়ের সাহায্যে প্রযুক্ত-বলকে অনেক গুণ বৃদ্ধি [করা] যায়।

এছাড়া আরও এক ধরনের চলনশীল কপিকল সমবায় করা হয় (১৯ নং ও [২]০ নং চিত্র দেখ)। ইহাতে এক সংগে কতকগুলি করিয়া পুলি জোড়া থাকে। [নী]চের কাঠামোতে কয়েকটি পুলি থাকে এবং উহার কাঠামো সমেত সচল
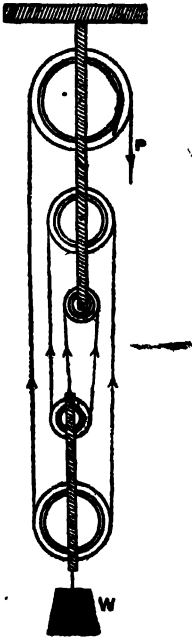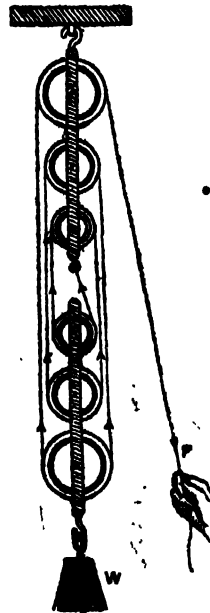
১৯ নং চিত্র ২০ নং চিত্র

হয়। আর উপরের কাঠামোটি থাকে স্থির। ইহাতেও কয়েকটি পুলি জোড়া থাকে। কাঠামো দুইটির প্রান্তদ্বয়ের পুলিগুলি বড় করা হয় এবং পরের পুলিগুলি ক্রমে ছোট করা হয়। এই প্রকার পুলিতে কি ভাবে দড়ি ঘোরানো হয় এবং ওজন কোথায় বাঁধা হয় তাহা ১৯ নং এবং ২০ নং চিত্রে দেখানো হইল। ইহাতেও অনেক যান্ত্রিক সুবিধা হয়। জাহাজে মাল উঠানামা করাইবার সময় সমবায়-কপিকলের বহুল ব্যবহার হয়।

আনত-তল (Inclined Plane)

বহু প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন দেশে আনত-তলের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। শোনা যায়, পুরীর মন্দির, কোনারকের মন্দির, মিশরের পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণে ভারী পাথরকে আনত-তলের সাহায্যে উচ্চ স্থানে তোলা হইত। পাহাড়ে বা উচ্চস্থানে উঠিবার সময় খাড়া ভাবে উঠার চাইতে একটু ঢালু পথে উঠা অনেক সহজ। তিনতলা বা চারতলা বাড়ীর সিড়িগুলি যদি খুব খাড়া হয় তবে উঠিতে বেশ কষ্ট হয়; কিন্তু সিঁড়িগুলি যদি ক্রমশঃ ঢালু করিয়া তৈয়ারী থাকে তবে উঠিতে কম কষ্ট হয়।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে তোমরা সহজেই বুঝিতেছ যে কোন বস্তুকে উপরে উঠাইতে হইলে উহাকে খাড়া ভাবে না উঠাইয়া ঢালু পথে উঠান সহজ। তাই দেখিবে লরী বা মালগাড়ীতে-মাল বোঝাই করিবার সময় একটি তক্তার সাহায্যে আনত-তলের সৃষ্টি করা হয়। এই আনত-তলের উপর দিয়া মাল বোঝাই করা খুবই সহজ। (২১ নং চিত্র দেখ)
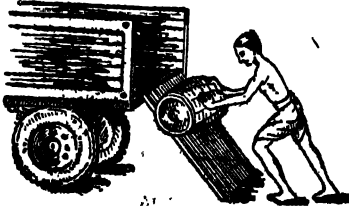
আনত-তলের সাহায্যে মাল বোঝাই করা সহজ
২১ নং চিত্র

আনত-তলের সাহায্যে কোন বস্তুকে উপরে তোলা কেন সহজ হয় তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবে। ২২ নং চিত্রে AB একটি আনত-তল এবং AC অনুভূমিক রেখার সহিত ∠BAC উৎপন্ন করিয়াছে।

AB আনত-তল বরাবর যদি W ওজনকে, P বল প্রয়োগ করিয়া A হইতে B বিন্দুতে তোলা হয়, তবে কার্যের পরিমাণ হইবে বল × দূরত্ব = P × AB.
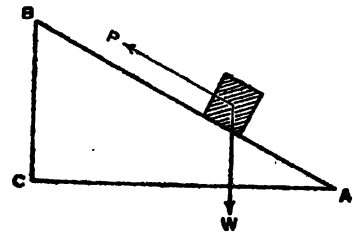
আনত-তল
২২ নং চিত্র

আবার, C বিন্দু হইতে যদি W ওজনকে, খাড়া ভাবে CB রেখা বরাবর টানিয়া B বিন্দুতে তোলা হয় তবে কার্যের পরিমাণ হইবে, ওজন × দূরত্ব = W × BC। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুটিকে আমরা একই মিভূ AC হইতে

একই উচ্চতায় B বিন্দুতে তুলিয়াছি। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কার্যের পরিমাণ সমান হইবে।

অতএব, $W.\ BC = P.AB$

বা, $\frac{W}{P} = \frac{AB}{BC}$

কিন্তু ছবি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, AB রেখা BC হইতে বড়। অতএব $\frac{AB}{BC}$ সর্বদা 1 হইতে বড় হইবে, এবং $\frac{W}{P}$ এর ফলও 1 হইতে বড় হইবে অর্থাৎ, আনত-তলের সাহায্যে কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশী ওজন তোলা সহজ হইবে।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র (Newton's Law of Gravitation)

প্রাচীনকালে টলেমী, অ্যারিষ্টটল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতেন যে সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথমে কোপারনিকাস এবং পরে গ্যালিলিও প্রচার করেন যে পৃথিবীই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে না। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রেই এবং জন কেপ্‌লারও এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন এবং গ্রহসমূহের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু সূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রগুলি পরে নিউটনের আবিষ্কারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে, নিউটনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানিরা গ্রহসমূহের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কার করিলেও উহারা সূর্যের চতুর্দিকে কেন ঘুরিতেছে, তাহা বলিতে পারেন নাই।

স্যার আইজাক্ নিউটনই (1642-1727) প্রথম সমস্ত বিষয়টির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং গাণিতিক রূপ দিতে সক্ষম হন। এখানেই তাঁহার কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয়। এ-প্রসঙ্গে এ-কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণও জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেদিন যাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাস্করাচার্য তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে লিখিয়াছেন— "পৃথিবীর আকর্ষণ-জনিত বলের জন্য কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠে পড়িতে দেখা যায়। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক আকর্ষণ থাকার দরুণ কেহই নিজের নির্দিষ্ট স্থান বা কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না"। এই বিবরণ হইতে

আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে ভাস্করাচার্যই প্রথম মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে, সেকথা আজ আর কয়জন মানিতে চাহে যাক্, আমরা এখানে নিউটনের আবিষ্কারের কথাই আলোচনা করিতেছি। তাঁহার মহাকর্ষ-সূত্র আবিষ্কার সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন নিউটন তাঁহার গৃহ-সংলগ্ন বাগানে একটি আপেল গাছের নিচে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। এমন সময় একটি আপেল বৃন্ত-চ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন আপেলটি মাটিতে পড়িল? উহাতো আকাশের দিকেও উঠিয়া যাইতে পারিত! প্রশ্নটি তাঁহার মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তবে পৃথিবী সব জিনিষকেই নিজের দিকে টানিতেছে? এ বিষয়ে, তিনি বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সুদীর্ঘ চিন্তার পর তিনি দেখিলেন যে, সত্যই পৃথিবী সব বস্তুকে তাহার নিজের দিকে নিয়ত আকর্ষণ করে। আর সেই আকর্ষণ বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। এই ব্যাপারটি হইতেই তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছান। যথা:

(1) এই বিশ্বের প্রত্যেক জিনিষ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। উহাকে তিনি 'মহাকর্ষ' (gravitation) শব্দে অভিহিত করেন।

(2) এই আকর্ষণের শক্তি বস্তু দুইটির সংযোজক যে সরল রেখা, সেই বরাবর কাজ করে।

(3) এই আকর্ষণ শক্তি বস্তু দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতী এবং তাহাদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্ত-সমানুপাতী (inversely proportional) হয়। অর্থাৎ, বস্তু দুইটির ভর বেশী হইলে তাহাদের আকর্ষণ শক্তিও বেশী হইবে এবং ভর কম হইলে আকর্ষণ শক্তিও কম হইবে। কিন্তু তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণ শক্তি কমিবে এবং দূরত্ব কমিলে আকর্ষণ শক্তি বাড়িবে।

[একটি জিনিষ কমাইলে যদি আর একটি জিনিষ বাড়িয়া যায় তবে বস্তু দুইটির সম্পর্ক ব্যস্ত-সমানুপাতিক হয়]

উপরের সিদ্ধান্তগুলিকেই বলা হয় মহাকর্ষ সূত্র। অতএব, মহাকর্ষ সূত্র হইল,—**এই বিশ্বের যে কোন দুইটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তু দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং উহাদের ভিতরকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-সমানুপাতিক হয়।**

(Every particle of matter attracts every other particle of matter in whatever states they may exist with a force that varies directly as the product of the masses of the particles of matter and inversely as the square of the distance between them)

গণিতের ভাষায় এবং চিত্রে প্রকাশ করিলে মহাকর্ষ সূত্র নিম্নরূপ দাঁড়াইবে :
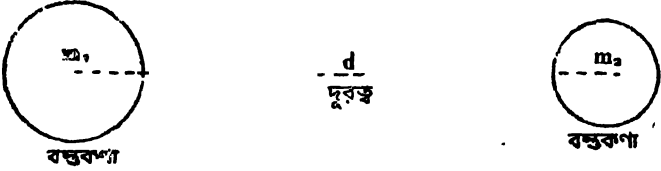
২৩নং চিত্র

যদি বস্তুকণা দুইটির m_1 ও m_2 হয় এবং তাহাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d হয় এবং উভয় বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ-বলের পরিমাণকে F ধরা হয়, তবে

(i) $F \propto m_1 m_2$

(ii) $F \propto \frac{1}{d^2}$

[দুই রাশির সমানুপাতিক বুঝাইতে ∝ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়]

দুইটি রাশির সমানুপাতিক কথার অর্থ এই যে রাশি দুইটি যখন বিভিন্ন মান গ্রহণ করে তখন প্রতিবারেই তাহাদের অনুপাতের একই ফল হয়। অর্থাৎ, একটিকে অপরটি দিয়া ভাগ করিলে প্রতিবারে একই ভাগফল পাওয়া যায়। এই স্থির ফলটিকে বলা হয় ঐ অনুপাতের নিত্যসংখ্যা বা ধ্রুবক। মহাকর্ষ সূত্রটির ক্ষেত্রে এই ধ্রুবকটিকে G দিয়া প্রকাশ করা হয়। অতএব উপরের দুইটি অনুপাত একত্রে প্রকাশ করিলে সূত্রটি হইবে :

$$F \propto m_1 m_2 . \frac{1}{d_2}$$

অথবা $F = G.\frac{m_1 m_2}{d_2}$

এখানে G = নিউটনের ধ্রুবক বা মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Newtonian Constant or Gravitational Constant)। যদি m_1 এবং m_2 বস্তু দুইটির প্রত্যেকটি ভরের মান এক গ্রাম হয় এবং উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব 'd' এক সেন্টিমিটার হয়, তবে G-এর পরিমাণ হইবে $6{\cdot}654 \times 10^{-8}$ ডাইন।

অর্থাৎ দুইটি বস্তুকণার ভর যদি এক গ্রাম হয়, এবং এক সেন্টিমিটার দূরত্ব হইতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তবে সেই আকর্ষণের পরিমাণ হইবে 6.664×10^{-8} ডাইন [বলের 'একক'কে ডাইন বলা হয়]।

অভিকর্ষ (Gravity)—

পৃথিবীর উপর বা পৃথিবীর কাছাকাছি কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ (gravity) বলে। সুতরাং ইহাকে মহাকর্ষের একটি বিশেষ নাম বলা যাইতে পারে। এই অভিকর্ষের জন্যই গাছ হইতে আপেল মাটিতে পড়ে, আকাশের দিকে উঠিয়া যায় না। পৃথিবী যেমন আপেলকে আকর্ষণ করে আপেলও কিন্তু তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আপেলের তুলনায় পৃথিবীর ভর অনেক বেশী বলিয়া আপেল পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, পৃথিবী আপেলের দিকে ছুটিয়া যায় না। অভিকর্ষ-বলের জন্যই প্রত্যেক বস্তুর ওজন হয়। নিম্নে তাহার ব্যাখ্যা করা হইল।

ওজন এবং ভর (Weight and Mass) :—

আমরা সাধারণতঃ বস্তুর ওজন ও ভরের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। ওজনকেই ভর বলিয়া থাকি। কিন্তু ওজন ও ভর এক জিনিষ নহে। পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য বস্তুর ওজন হয়। যদি পৃথিবীর আকর্ষণ না থাকিত তবে কোন বস্তুর ওজনও থাকিত না। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিত। কোন বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরে সরাইতে থাকিলে উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ফলে, বস্তুর ওজনও কমিতে থাকে। আবার ভূকেন্দ্রে কোনরূপ আকর্ষণ-বল নাই, তাই সেখানে সকল বস্তুর ওজনই শূন্য হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর আকর্ষণের তারতম্যের জন্য কম বেশী হয়। এমনকি কখনও কখনও ওজনের পরিমাণ শূন্যও হয়। ওজন শূন্য হইলে বস্তুটি কিন্তু ঠিকই থাকে অর্থাৎ, বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব, ব্যাপারটি এই দাঁড়াইল যে কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে বলে বস্তুর ভর (Mass)। আর বস্তুটি যে পরিমাণ বল দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় সেই বলকে বলে বস্তুর ওজন (Weight)।

ভর ও ওজনের পার্থক্য :—

(i) ভর বলিতে কোন্ জিনিষের ভিতর কতটা পদার্থ (matter) আছে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু ওজন বলিলে একটি বল (force) কে বুঝাইবে। আর সেই বলই হইল পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ।

(ii) পদার্থকে যেখানেই লইয়া যাওয়া যাক, তাহার ভর ঠিক থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বলিয়া পদার্থের ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের পরিক্রমণ (Movement of the Moon) :—

চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। উহা অনন্তকাল ধরিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু উহা কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? তাহার সঠিক উত্তর নিউটনের মহাকর্ষ-শক্তি আবিষ্কারের পুর্বে কাহারও জানা ছিল না। পৃথিবীর মহাকর্ষ-জনিত শক্তি কি করিয়া চন্দ্রকে তাহার চারিদিকে ঘুরাইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য অভিকেন্দ্র বল বা কেন্দ্রানুগ বল (Centripetal force) এবং কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্দ্রিক বল (Centrifugal force) সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি লম্বা সূতার একপ্রান্তে একটি ঢিল বাঁধিয়া
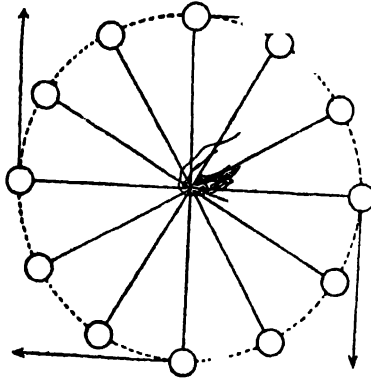
২৪নং চিত্র

অন্যপ্রান্ত ধরিয়া মাথার উপর খুব জোরে ঘুরাইলে ঢিলটির গতিপথ শূন্যে একটি বৃত্তের সৃষ্টি করিবে। [২৪ নং চিত্র দেখ] এই অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে যদি সূতা ছিঁড়িয়া যায় তবে ঢিলটি পরিধির যে বিন্দুতে ছিল সেই বিন্দুর স্পর্শক বরাবর ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু ঢিলটিকে সূতার সাহায্যে কেন্দ্রের

দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া উহা বৃত্তপথে ঘুরিতেছে। বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার যে শক্তি তাহাকে কেন্দ্রানুগ বা অভিকেন্দ্র-বল বলে। আবার ঢিলটি ঘুরাইবার সময় লক্ষ্য করিবে যে আঙুলের উপর টান পড়িতেছে। মনে হইবে যেন ঢিলটি আঙুলকে কেন্দ্র হইতে টানিয়া ব্যাসার্ধ-বরাবর বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। এই বলের নাম কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্দ্রিক (centrifugal) বল।

এইরূপ বৃত্তাকার গতির প্রধান ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ। পৃথিবীর আকর্ষণ-বল অভিকেন্দ্র-বলের (Centripetal force) ন্যায় চন্দ্রের উপর ক্রিয়া করে। তাই চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। চন্দ্র চায় উহার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে সরল রেখায় চলিতে। আবার, পৃথিবী চায় চন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়া নিজ কেন্দ্রের দিকে আনিতে। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সামঞ্জস্যের ফলেই চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বৃত্তাকার-পথে ঘুরিতেছে। মনে হয়, আমরা যেমন সূতা দিয়া বাঁধিয়া ঢিল ঘুরাই, তেমনি পৃথিবী, তাহার অভিকর্ষ-বল দ্বারা বাঁধিয়া চন্দ্রকে নিজের চতুর্দিকে ঘুরাইতেছে। মনে রাখিবে চন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য গ্রহগুলিও মহাকর্ষ-বলের জন্য সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে অনন্তকাল ধরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্যের চারিদিকে কোন বায়ু নাই। তাই গ্রহগুলির গতিপথে ঘর্ষণ-জনিত বাধা আসে না। সুতরাং উহাদের গতিবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। আবার আমরা গতি-জাড্যের ধর্ম হইতে জানি যে কোন চলন্ত বস্তু চিরকালই চলিতে থাকিবে, যদি না উহা বাহিরের কোন বল দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যও গ্রহ-উপগ্রহগণের গতির কোন বিরাম নাই, তাহাদের আবর্তনের কোন পরিবর্তন নাই।

জোয়ার ভাঁটা (Tides) :—

মহাকর্ষ বলের আর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল জোয়ার-ভাঁটা। প্রত্যেক দিন প্রায় 12 ঘণ্টা অন্তর সমুদ্রে বা তাহার নিকটবর্তী নদীতে নিয়মিতভাবে জল ওঠা-নামা করে। জলের এইরূপ নিয়মিত স্ফীতিকে **জোয়ার** এবং পতনকে **ভাঁটা** বলে। এই জোয়ার-ভাঁটা একাধিক কারণে হইতে পারে। তবে, প্রধানতঃ চন্দ্রের মহাকর্ষ বলের জন্যই ইহা ঘটিয়া থাকে। নিম্নে জোয়ার-ভাঁটার বিভিন্ন কারণ সমূহের আলোচনা করা হইল।

পৃথিবী সর্বদা আপন অক্ষের (axis) উপর আবর্তন করে বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশির উপর কেন্দ্রাতিগ-বল ক্রিয়া করে। তাহার ফলে জলরাশি সর্বদা বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে চায়। এই কেন্দ্রাতিগ-বল জোয়ার সৃষ্টির কতকটা সাহায্য করে।

তবে, পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষ-বলের জন্যই প্রধানতঃ জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের তুলনায় সূর্যের আকর্ষণ খুব বেশী হওয়ার কথা। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র অপেক্ষা পৃথিবী হইতে বহু, বহু দূরে অবস্থিত থাকায় পৃথিবীর জলরাশির উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাবেই বেশী হয়। [চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবী হইতে মাত্র 2 লক্ষ 39 হাজার মাইল আর সূর্যের দূরত্ব প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল।] পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয় সেই অংশে চন্দ্রের আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। আবার স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের উপর আকর্ষণ বেশী হয়। ফলে, চারিদিক হইতে জলরাশি ঐ স্থানে প্রবাহিত হয় এবং ঐ স্থানের জলতল ফুলিয়া উঠে। ইহাকে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে।

আবার চন্দ্রের পূর্বোক্ত আকর্ষণ-স্থলের ঠিক বিপরীত দিকেও আর একটি জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাহাকে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার বলে। ইহার কারণ
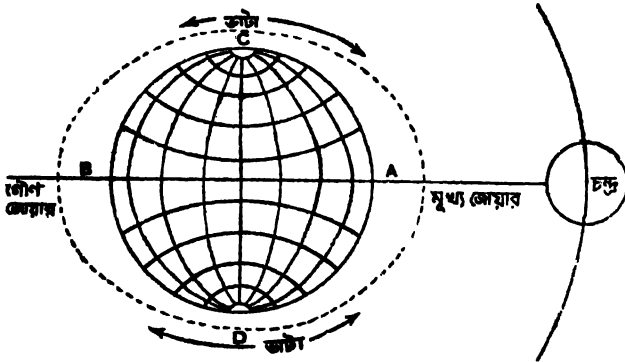
২৫ নং চিত্র

সেখানকার স্থলভাগ চন্দ্রের নিকটতর। কাজেই, স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে একটু বেশী সরিয়া যায় বলিয়া জলভাগ একস্থানে জমা হইয়া স্ফীত হয়। ২৫ নং চিত্রে A অংশে মুখ্য জোয়ার আর তাহার ঠিক বিপরীত অংশ B-তে গৌণ জোয়ার।

পৃথিবী 24 ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে। কাজেই কোনও নির্দিষ্ট স্থানে মুখ্য ও গৌণ জোয়ার 12 ঘণ্টার ব্যবধানে হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। এই জোয়ারের ব্যবধান প্রায় 12 ঘণ্টা 26 মিনিট হয়। ইহার কারণ নিম্নে চিত্রসহ দেখান হইল। [২৬ নং চিত্র দেখ।]
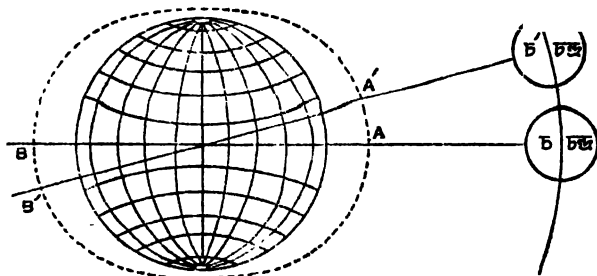
২৬ নং চিত্র

পৃথিবী আপন অক্ষের উপর 24 ঘণ্টায় এক পাক ঘুরে। সুতরাং অর্ধেক পাক ঘুরিতে তাহার 12 ঘণ্টা লাগিবে এবং উক্ত সময়ে গৌণ জোয়ারের স্থান (B বিন্দু) মুখ্য জোয়ারের স্থানে (A বিন্দুতে) পৌছিবে। কিন্তু এই 12 ঘণ্টায় চন্দ্র পূর্বের স্থানে না থাকিয়া তাহার কক্ষপথে একটু অগ্রসর হইয়া যাইবে (চিত্রে, চ হইতে চ´ স্থানে)। সেইজন্য 12 ঘণ্টা পরে গৌণ জোয়ারের স্থান মুখ্য জোয়ারের স্থানে পৌছাইলেও চন্দ্রের সম্মুখীন হইতে পারে না। উহা হইতে আরও প্রায় 25 মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ প্রায় 26 মিনিট সময় পাক খাইয়া তাহাকে চন্দ্রের (চ´ অবস্থানের) সম্মুখে (A´ বিন্দুতে) আসিতে হয়। তাই দুইটি জোয়ারের ব্যবধান 12 ঘণ্টার স্থলে 12 ঘণ্টা 26 মিনিট হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন দুইটি নির্দিষ্ট স্থানে (২৫ নং চিত্রে A ও B স্থানে) যখন জোয়ার হয় তখন তাহাদের মধ্যবর্তী স্থান (২৫ নং চিত্রে C ও D স্থান) হইতে জল ঐ দুই স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় এবং মধ্যবর্তী দুই স্থানে (C ও D অংশে) ভাঁটার সৃষ্টি হয়। ২৫ নং চিত্রে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে পৃথিবী যখন 24 ঘণ্টায় এক পাক ঘুরিবে তখন H বিন্দু প্রথমে মুখ্য-জোয়ারের সম্মুখে পড়িবে, পরে 6 ঘণ্টা অন্তর C বিন্দুতে পৌছাইলে আবার ভাঁটায় সম্মুখে পড়িবে। তারপর আবার 6 ঘণ্টা অন্তর অন্তর B ও D বিন্দুতে

পৌঁছাইলে যথাক্রমে গৌণ-জোয়ার ও ভাঁটার সম্মুখে পড়িবে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রতি 24 ঘণ্টায় কোন স্থানে (যেমন A বিন্দুতে) দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে, চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় অবস্থান করে। ফলে, চন্দ্র ও সূর্য একই সরল রেখায় আকর্ষণ করে এবং জোয়ার খুব প্রবল হয়। ইহাকে **ভরা কটাল** বা **তেজ কটাল** (Spring Tide) বলে। আবার সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান পৃথিবীর সহিত সমকোণে থাকে। তখন, চন্দ্র যে স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি করিতে চায়, সূর্য ঠিক সেইখানে ভাঁটার সৃষ্টি করিতে চায়। ফলে, জোয়ারের প্রবলতা কম থাকে। ইহাকে **মরা কটাল** (Neep Tide) বলে।

মধ্য সমুদ্রে জোয়ারের দরুণ জলতল সামান্যই স্ফীত হয়। কিন্তু জোয়ারের বেগ যখন উপকূলে বা নদীর মোহনায় আসিয়া লাগে তখন জলতলের উচ্চতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে এই উচ্চতা 30/40 ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। নদীর ভিতরের সংকীর্ণ অংশে নদী স্রোতের সহিত সমুদ্রের স্রোতের মিলন হইলে দুই বিপরীত স্রোতের ফলে জল সময় সময় অনেক উঁচু হইয়া ফুলিয়া উঠে। উহাকে **বান ডাকা** (Tidal bore) বলে। ভাগীরথীর বান প্রায় 25/30 ফুট উঁচু হইয়া থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellites):

মহাকাশের রহস্য ভেদ করিবার জন্য মানুষ প্রাচীন কাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সেই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য সে নির্মাণ করিয়াছে বিভিন্ন ধরণের মহাকাশ-যান। বেলুন, এরোপ্লেন, জেটপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে যে মহাকাশের খবর নিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত মহাকাশ যান পৃথিবীর প্রচণ্ড আকর্ষণকে কাটাইয়া মহাকাশে পাড়ি দিতে পারে নাই। জেট্-প্লেন শব্দের গতি (ঘণ্টায় প্রায় 767 মাইল) অপেক্ষা তিন চার গুণ অধিক গতিতে ছুটিতে পারে। তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পার পৃথিবীর আকর্ষণকে কাটাইয়া মহাকাশে উঠিতে হইলে কত অধিক গতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী মহাকাশ-যানের প্রয়োজন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ হাল ছাড়িলেন না। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জন্ম নিল আধুনিক রকেট। যাহার গতি ঘণ্টায় প্রায় 4400 মাইল। এই প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন রকেটের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা

আজ মহাকাশ পাড়ি দিয়াছে। ভাসিয়া বেড়াইতেছে মহাশূন্যে। ইহার সাহায্যে তাহারা মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করিয়াছে। আজ আমরা এখানে আলোচনা করিব কি করিয়া রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করা হয়।

চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় বৃত্তাকার-পথে ঘুরিতেছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে কোন বস্তুর বৃত্তাকার গতি হইলে তাহাকে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ এই দুইপ্রকার বল ক্রিয়া করে। চন্দ্রের উপর পৃথিবীর কেন্দ্রানুগ বল হইল পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি। এই অভিকর্ষ শক্তির জন্যই চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সুতরাং কোন বস্তুকে (অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহকে) যদি পৃথিবার চারিদিকে ঘুরাইতে হয় তবে প্রথমে বস্তুটিকে ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে পাঠাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, মহাশূন্যে বৃত্তাকার পথের বস্তুটিকে এমন গতিবেগ দিতে হইবে যাহার ফলে ইহার কেন্দ্রাতিগ বল এবং কেন্দ্রানুগ বল সমান হয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে কোন বস্তুকে যদি ভূপৃষ্ঠ হইতে 560 মাইল উপরে উঠান হয় এবং তাহাকে পার্শ্ব হইতে ধাক্কা দিয়া তাহার গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় 18000 মাইল করা হয়, তবে উহা সুতায় বাঁধা ঢিলের মত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। এই অবস্থায় পৃথিবীর আকর্ষণ (অর্থাৎ কেন্দ্রানুগ বল) এবং বস্তুটির কেন্দ্রাতিগ (যাহা উহাকে মহাশূন্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করে) বলের প্রভাবে বস্তুটি বৃত্তাকার পথে মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। কোন কারণে, বস্তুটির গতি যদি 18 হাজার মাইলের বেশী হয় তবে বস্তুটির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় বস্তুটি ক্রমে ঊর্ধে উঠিয়া মহাশূন্যে উধাও হইয়া যাইবে। আর যদি গতিবেগ 18 হাজার মাইলের কম হয় তবে তাহা পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে।

২৭ নং চিত্র

এখন প্রশ্ন হইল কি করিয়া মহাশূন্যে কোন বস্তুকে পাঠান হইবে এবং

তাহাতে নির্দিষ্ট গতিবেগ সঞ্চার করা হইবে। এই কাজটি করা হয় যৌগিক রকেটের সাহায্যে। দুইটি বা তিনটি রকেট একত্র করিয়া যৌগিক রকেট তৈয়ারী করা হয়। ২৭ নং চিত্রে তিনধাপ যুক্ত একটি রকেট দেখান হইল।

প্রথম রকেটের জ্বালানি ফুরাইয়া গেলে দ্বিতীয় রকেটের জ্বালানিতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় আগুন ধরিয়া যায় এবং উহার কাজ আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় প্রথম রকেটের খোলটি পৃথক হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে। যদি উহাতে প্যারাসুট যুক্ত থাকে তবে উহা অক্ষত অবস্থায় মাটিতে নামিয়া আসে এবং পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এইরূপে দ্বিতীয় রকেটের কাজ শেষ হইলে উহাও ভূপৃষ্ঠের দিকে নামিয়া আসে। একবার তৃতীয় রকেট বা শেষ রকেটটি বস্তুটিতে নির্দিষ্ট গতিবেগ সঞ্চার করিয়া উহার কক্ষপথে স্থাপন করে।

হাউই (Rocket) বাজির নীচে আগুন দিয়া উহাকে তোমরা অনেকেই আকাশে উড়াইয়াছ। হাউই-এর বারুদে আগুন দেওয়ার সংগে সংগে উহার নিম্নদিক দিয়া প্রবল বেগে উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়। এখানে মনে রাখিবে যে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন সাঁতার কাটার সময় আমরা হাত দিয়া জলকে পিছনের দিকে ধাক্কা দেই, জলও সেইরূপ বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বলে আমাদিগকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। ফলে আমরা জলের উপর দিয়া আগাইয়া যাই। হাউইয়ের গ্যাসও সেইরূপ বায়ুকে নিচের দিকে ধাক্কা দেয় আর বায়ু বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বলে হাউইকে ধাক্কা দিয়া উপরের দিকে উঠাইয়া দেয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপক-যন্ত্র রকেট নির্মিত হইয়াছে। রকেটের ভিতর জ্বালানি ও তরল অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ বিস্ফোরণ ঘটান হয়। বিস্ফোরক-গ্যাস রকেটের নিম্নদিক দিয়া বাহির হয় এবং বায়ুকে ধাক্কা দেয়। তৃতীয় রকেটের মুখটি একটি শঙ্কু আকৃতির আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। ইহার মধ্যেই স্থাপন করা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।

ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে যাওয়া যায় বায়ুর ঘনত্ব ততই কমে। সুতরাং বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধাও কম হয়। ঘন বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া রকেট প্রচণ্ডগতিতে ছুটিলে ঘর্ষণজনিত তাপে উহা গলিয়া যায়। সেইজন্য তিন পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে উপগ্রহকে বিভিন্ন প্রকার গতিতে ঊর্ধাকাশে পাঠান হয়। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর স্পুটনিক নামক যে কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়া

উৎক্ষেপন করিয়াছিল তাহা তিনটি রকেট-যুক্ত একটি যৌগিক রকেট। প্রথম রকেটটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকেটকে মাথায় লইয়া ঘণ্টায় প্রায় 1700 মাইল বেগে খাড়াভাবে 50 মাইল উপরে উঠিয়া যায়। এই স্বল্প বেগের জন্য ঘর্ষণজনিত তাপ কম ছিল, ফলে উহা তাপে গলিয়াও যায় নাই। এমন
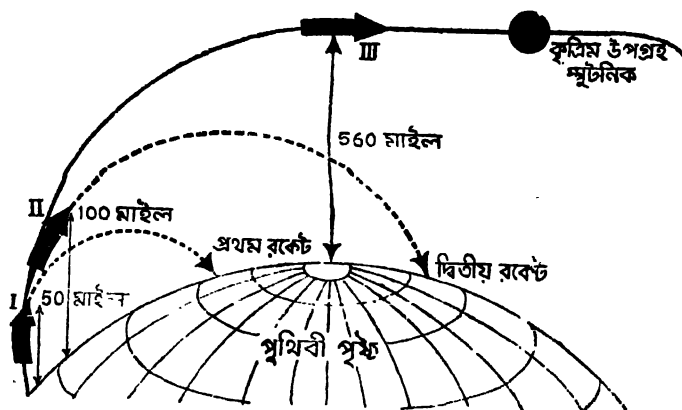
২৮ নং চিত্র

সময় প্রথম রকেটটি খসিয়া পড়ে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূ-স্তরের সহিত 45° কোণ করিয়া চলিতে থাকে। ২৮ নং চিত্র দেখ।

তখন দ্বিতীয় রকেট, উপগ্রহ ও তৃতীয় রকেটকে মাথায় লইয়া ঘণ্টায় প্রায় 10,000 মাইল বেগে 100 মাইলের কিছু বেশী উপরে উঠিয়া যায়। এই সময় দ্বিতীয় রকেটটিও খসিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। এইবার শেষ বা তৃতীয় রকেটটি স্পুটনিককে পৃথিবী হইতে প্রায় 560 মাইল উপরে লইয়া যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল করিয়া দেয়। পরে স্পুটনিকের পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া উহাতে ঘণ্টায় 18,000 মাইল বেগের সঞ্চার করে। এই অবস্থায় সম্মুখের আবরণটি, স্পুটনিক ও রকেটটি আলাদা হইয়া যায়। প্রথমে তিনটি বস্তুই পাশাপাশি চলিতে থাকে। কিন্তু পরে স্পুটনিকটি আপন কক্ষপথে চলিতে থাকে এবং অপর দুইটি ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। কারণ, উহাদের উপর বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধা স্পুটনিক হইতে বেশী পড়ে।

তোমরা হয় তো একথা শুনিয়া থাকিবে যে, কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পরিক্রমণ শেষ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। কেন এইরূপ হয়? ইহার কারণ এই যে পৃথিবী হইতে 560 মাইল উচ্চে উঠিলেও উহা তখনও বায়ু মণ্ডলের শেষ সীমা

ছাড়াইয়া যাইতে সমর্থ হয় না। তাই, বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধা ইহাকে ধীরে ধীরে নিচে নামাইয়া আনে। ক্রমে যখন নিচের ঘনতর বায়ুস্তরে প্রবেশ করে তখন ইহাতে বায়ুর প্রচণ্ড ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে কৃত্রিম উপগ্রহটি উল্কার মত নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের
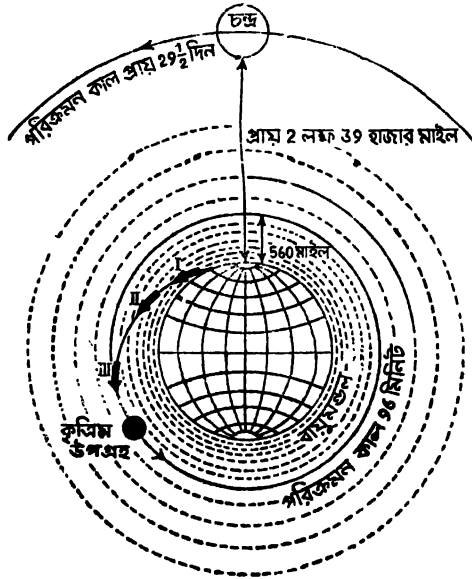
২৯ নং চিত্র

অনেক উর্ধ্বে থাকে বলিয়া উহাতে ঘর্ষণজনিত বাধার সৃষ্টি হয় না। ২৯ নং চিত্রে চন্দ্র এবং কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

মনে রাখিবে পৃথিবী হইতে যতই উর্ধে বস্তু নিক্ষেপ করা যায় ততই তাহাদের পরিক্রমণ কাল বেশী হয়। তাই 560 মাইল উপরে কৃত্রিম উপগ্রহের পরিক্রমণ কাল মাত্র 95 মিনিট কিন্তু চন্দ্রের পরিক্রমণ কাল প্রায় $29\frac{1}{2}$ দিন।

উপগ্রহের ভিতর নানা সূক্ষ্ম এবং স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসান থাকে। উহাদের সাহয্যে পৃথিবী হইতে বহু উচ্চের বায়ুস্তরের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, সূর্য— হইতে ছড়ান অতি-বেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভৃতি আরও অনেক রকমের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করিতেছেন। শুধুমাত্র মহাকাশ পরিভ্রমণের জন্য তাহারা রকেট ব্যবহার করেন না।

প্রশ্নাবলী

1. একক কাহাকে বলে এবং এককের প্রয়োজনীয়তা কি?

2. দৈর্ঘ, ভর এবং সময়ের এককগুলির নাম কর এবং উহাদের সংজ্ঞা বল।

3. বস্তুর আয়তন বলিতে কি বুঝ? লিটার কি জাতীয় পদার্থের একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়? এক লিটার সমান কত সেন্টিমিটার?

4. কার্য বলিতে কি বুঝ? কার্য কঠিন লাগে কেন?

5. ঘর্ষণ কাহাকে বলে? ঘর্ষণের উপকারিতা কি?

6. জাড্য কাহাকে বলে? স্থিতি ও গতিজাড্য কাহাকে বলে বুঝাইয়া বল।

7. ঘর্ষণ কমাইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়?

8. যন্ত্র কাহাকে বলে? লিভার, কপিকল ও আনত-তলকে যন্ত্র বলা হয় কেন? যান্ত্রিক সুবিধা বলিতে কি বুঝ?

9. লিভার বলিতে কি বুঝ? ইহারা কয় শ্রেণীর? প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক উদাহরণ দাও।

10. হাতকে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার বলা হয় কেন? ইহাতে কোন যান্ত্রিক সুবিধা হয় না কেন? কি অবস্থায় এই শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করা হয়?

11. চিত্রসহ আনত-তলের কার্যকরী নীতির বর্ণনা দাও? অনেক সময় দেখা যায় লোকে বড় বড় বোঝা গাড়ীতে তুলিতে আনত-তলের ব্যবহার করে। ইহার কারণ কি?

12. একটি স্থির-কপিকলের কোন যান্ত্রিক সুবিধা আছে কি? যদি না থাকে তবে উহার সাহায্যে আমরা আর কি সুবিধা পাই? চিত্রের সাহায্যে এই প্রকার কপিকল বর্ণনা কর।

13. চিত্রের সাহায্যে কয়েক শ্রেণীর চলনশীল পুলি দেখাও এবং সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও কি করিয়া উহাদের দ্বারা প্রযুক্ত বল বৃদ্ধি পায়।

14. এমন একটি সাধারণ যন্ত্রের নাম কর যাহার সাহায্যে বস্তুর ভার অপেক্ষা কম বল প্রয়োগ করিয়া বস্তুটি তোলা যায় এবং ইহার কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

15. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির কোন্‌টিতে কোন্ শ্রেণীর লিভার কার্যকরী এবং কেন ?

(i) ঢেঁকি (ii) কাঁচি (iii) মানুষের বাহু (iv) দাঁড়িপাল্লা (v) চিমটা) নলকূপের হাতল (vii) এক চাকার ঠেলাগাড়ী (wheel barrow)

16. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(a) বালুকাময় রাস্তা অপেক্ষা পিচঢালা রাস্তায় সাইকেল চালান সহজ।

(b) কোন জিনিষ একতালা হইতে দোতলায় তুলিতে কষ্ট হয়।

(c) শেওলাময় স্থানে হাটিতে গেলে পা পিছলায়।

(d) স্থির ভারী বস্তুকে সরাইতে কষ্ট হয়।

(e) কোন পাথর খণ্ডকে অনেক চেষ্টা করিয়াও যদি স্থানচ্যুত করা না যায় ব সেই চেষ্টাকে কার্য করা বলা হয় না।

17. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি বল ও উহার ব্যাখ্যা কর।

18. অভিকর্ষ কাহাকে বলে ? কোনও জিনিষের ওজন থাকে কেন ? র ভর ও ওজনের পার্থক্য কি ?

19. কেন্দ্রাতিক ও কেন্দ্রানুগ বল বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণ সহ ইহার খ্যা কর।

20. জোয়ার ভাঁটা কাহাকে বলে ? ইহার কারণ কি ? ভরা কটাল বং মরা কটাল কাহাকে বলে ?

21. কোনস্থানে একদিনে কতবার জোয়ার ভাঁটা হয় ? মুখ্য এবং ৌণ জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত এবং কেন এইরূপ ব্যবধান হয় ?

22. কৃত্রিম উপগ্রহ কিরূপে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কোন্ অবস্থায় উহা থিবীকে প্রদক্ষিণ করে, কেন উহারা চিরস্থায়ী হয় না, তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কর।

23. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(a) চন্দ্র অনন্তকাল ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে কেন ?

(b) হাউই কিরূপে উর্ধে উঠে ?

(c) সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে জোয়ার প্রবল হয়না কেন ?

(d) এরোপ্লেনের সাহায্যে মহাকাশে যাওয়া যায় না কেন ?

(e) পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষা মেরু অঞ্চলে কোন বস্তুর ওজন বেশী য় কেন ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

[আজকাল Objective type-এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইহার সাহায্যে সহজেই ছাত্রছাত্রীদের অধীত বিষয়গুলির পরীক্ষা করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের Objective Test-এর নমুনা দেওয়া হইল। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইজাতীয় প্রশ্ন দেওয়া থাকিবে।]

(A) Recall type test :

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) যে কোন দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের নাম——।

(খ) বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়——।

(গ) মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাহাকে ——বলে।

(ঘ) প্রথম উপগ্রহটি রাশিয়া তিন ধাপযুক্ত একটি যৌগিক——সাহায্যে পাঠাইয়াছিল।

(ঙ) প্রত্যেক বস্তুর ভর সর্বদাই থাকিবে কিন্তু—সর্বদা নাও থাকিতে পারে।

(B) 'Yes' or 'No' type test

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া করিবে।

(ক) গতিশীল অবস্থায় কোন বস্তুর জাড্য থাকে কি?

(খ) সব শ্রেণীর লিভারেই কি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

(গ) মসৃণ তল অপেক্ষা অমসৃণ তল কি অধিক বাধা দেয়?

(ঘ) নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কি বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে প্রযোজ্য?

(ঙ) কেবল মাত্র বস্তুর ওজনের জন্যই কি বস্তুকে স্থানচ্যুত করিতে কষ্ট হয়?

(C) True or False type test :

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলি তোমার সত্য বলিয়া মনে হয় তাহার ডানদিকের শূন্যস্থানে T এবং যেগুলি ভুল মনে কর তাহার ডানদিকের শূন্যস্থানে F লেখ।

(ক) বস্তু আপনা হইতে চলিতে পারে।

(খ) কোন বস্তুকে চক্রাকারে ঘুরাইলে উহার উপর মাত্র অভিকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে।

(গ) মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়েন।

(ঘ) পৃথিবীর কেন্দ্রে সকল বস্তুর ওজন শূন্য।

(চ) নদী অপেক্ষা সমুদ্রে জোয়ারের জল বেশী ওঠানামা করে।

(D) Multiple choice type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পার্শ্বে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যে উত্তরটি নির্ভুল মনে কর তাহার নীচে একটি লাইন টান।

(ক) প্রথম শ্রেণীর লিভারের আলম্ববিন্দু কোথায় অবস্থিত ?—দণ্ডের একপ্রান্তে, দণ্ডের মধ্যস্থলে।

(খ) আয়তনের এককে কি বলে ?—গ্রাম, মিটার, লিটার।

(গ) জোয়ার ভাঁটা কাহার উপর বেশী নির্ভর করে ?—পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগবল, চন্দ্রের আকর্ষণ, সূর্যের আকর্ষণ।

(ঘ) প্রথম শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ কি ? শাবল, নৌকার দাঁড়, মানুষের হাত।

(ঙ) মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন কে ? টরেসেলি, গ্যালিলিও নিউটন।

(E) Completion type test :—শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তি সম্পূর্ণ কর :—

(ক) কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ বায়ুর ঘর্ষণজনিত——জন্য একটু একটু করিয়া——থাকে। তখন পৃথিবীর——ফলে উহা ক্রমশ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ——থাকে। ইহার পর যখন——বায়ুস্তরে প্রবেশ করে তখন বায়ুর প্রচণ্ড ——ফলে উহাতে——ধরিয়া যায় এবং আকাশেই নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

(খ) ——ব্যতিরেকে কার্য সম্ভব নয়। —অতিক্রম করিবার জন্য বলের প্রয়োজন হয়। বাধা থাকার দরুন——করিতে কষ্ট হয়। এই বাধা প্রধানত——প্রকারের।

(F) **Matching type test :—**

নীচের পংক্তির II হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছাই করিয়া I পংক্তির শূন্যস্থান পূরণ কর :—

I পংক্তি	II পংক্তি
(ক) লিভার——নামক স্থির বিন্দুর চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে।	ভরা, অভিকর্ষ, আলম্ব
(খ) পৃথিবীর——জন্য বস্তুর ওজন হয়।	আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মহাকর্ষ, মরা
(গ) পূর্ণিমাতে——কটাল হয়।	

(G) Association type test

: : চিহ্নের বাম দিকের শব্দ দুইটির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, ডানদিকের শব্দ দুইটির মধ্যেও সেই সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে। ডানদিকের দুইটি শব্দের মধ্যে একটি দেওয়া আছে, সেইটির সহিত সম্পর্কযুক্ত অপর শব্দটি বাহির কর:—

(ক) আকর্ষণ : কেন্দ্রানুগবল : : বিকর্ষণ :—

(খ) অভিকর্ষ বল : ওজন : : পদার্থের পরিমাণ :—

(গ) জোয়ার : ভাঁটা : : ভরাকটাল :—

(ঘ) ক্রেন : পুলি : : ঠেলাগাড়ী :—

(ঙ) বল : বলবাহু : : ভার :—

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোক বিজ্ঞান
LIGHT

আলোকের প্রকৃতি (Nature of Light) :

আলোকের প্রধান উৎস সূর্য। তাহা ছাড়া, তাপ বিদ্যুৎ, প্রদীপ রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কয়েক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য ও জোনাকি পোকা প্রভৃতি হইতেও আলোক উৎপন্ন হয়। তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, শব্দ প্রভৃতির মত আলোকও একপ্রকার অদৃশ্য শক্তি। আলোক-শক্তি নিজে অদৃশ্য হইলেও ইহা অন্যান্য বস্তুকে উদ্ভাসিত করে এবং আমাদিগকে দেখিতে সাহায্য করে। পার্থিব জগতে ইহাই সবচেয়ে বেশী বেগে চলে। ইহা সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলে। নিজ উৎস হইতে ইহা তরঙ্গের আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে

দীপ্তিমান ও দীপ্তিহীন বস্তু

সূর্য, তারকা, প্রদীপ ইত্যাদি নিজেরাই আলোক বিকিরণ করিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে ভাস্বর বা দীপ্তিমান (luminous) বস্তু বলা হয়। আবার যে সকল বস্তু আলো নিঃসরণ করিতে পারে না তাহাদিগকে অপ্রভ বা দীপ্তিহীন (non-luminous) পদার্থ বলে। এই দীপ্তিহীন পদার্থগুলি তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা—স্বচ্ছ (transparent) বস্তু, অস্বচ্ছ (opaque) বস্তু এবং ঈষদচ্ছ (translucent) বস্তু। কাঁচ, জল, বায়ু প্রভৃতির মধ্য দিয়া আলোক সহজেই গমন করিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে স্বচ্ছবস্তু বলে। কাঠ, পাথর প্রভৃতির মধ্য দিয়া আলো গমন করিতে পারে না, সেই জন্য এইগুলিকে অস্বচ্ছ বস্তু বলে। আবার যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক আংশিক ভাবে গমন করিতে পারে তাহাদিগকে ঈষদচ্ছ বস্তু বলে। যেমন—তেল- মাখানো কাগজ, ঘষা-কাঁচ প্রভৃতি। আলোক যে স্থান ও পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করে তাহাকে তাহার মাধ্যম (medium) বলে।

আলোকের সরল রেখায় গমন (Rectilinear propagation of Light) :

আলোকের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা সমসত্ব বা সমমাত্র মাধ্যমে (homogeneous medium) গমন করে এবং সরল রেখায় গমন করে। অবশ্য আলোক এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে (যেমন, বায়ু হইতে জলে বা কাঁচে) প্রবেশ করিবার সময়টিতে সামান্ত বাঁকিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যমেও ইহা পুনরায় সরল রোখায়ই গমন করে। আলোকের এই যে ঋজুরেখায় চলিবার ধর্ম,—ইহা আমরা অনেক সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারি। নিম্নে কয়েকটি সাধারণ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করা হইল।

(ক) সাধারণ অভিজ্ঞতা,—অন্ধকার ঘরে ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়া যখন সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে তখন ঘরের মধ্যে ধূলিকণা বা ধোঁয়া থাকিলে উহারা রৌদ্রে আলোকিত হয় এবং আলোকের সরল পথটি স্পষ্ট দেখা যায়। ঠিক সেইভাবে মোটর গাড়ী বা রেলের ইঞ্জিনের তীব্র আলোকের পথটিও আমরা ঠিক সরল রেখায় দেখিতে পাই। গ্রহণ এবং ছায়ার উৎপত্তিও আলোকের এই ধর্মকেই প্রমাণিত করে। ইহাদের বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

(খ) পরীক্ষা—

(1) **কার্ডবোর্ডের পরীক্ষা :** একটি মোমবাতির শিখার সম্মুখে ছোট ছিদ্রযুক্ত তিনটি শক্ত কাগজের বোর্ড এমন তাবে রাখ যেন ছিদ্র তিনটি এবং
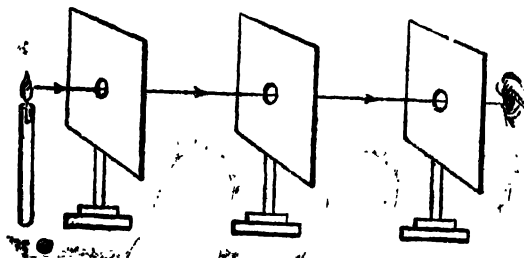
আলোকের সরল রেখায় গমন

৩০ নং চিত্র

মোমবাতির শিখাটি একই সরল রেখায় অবস্থিত থাকে। তারপর বোর্ডগুলির যে পার্শ্বে (চিত্র নং ৩০) মোমবাতি রাখা হইয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত পার্শ্বে

চোখ রাখিয়া ছিদ্র তিনটির ভিতর দিয়া শিখা লক্ষ্য কর। দেখিবে যে শিখাটি দেখিতে হইলে চক্ষুকে ছিদ্র তিনটির সহিত একই সরল রেখায় রাখিতে হইবে। যে কোন একটি কাগজের বোর্ডকে উপর-নিচ বা এপাশ-ওপাশ করিলেই শিখাটি আর দেখা যাইবে না। ইহা হইতে প্রমাণ হইবে যে আলোক সরল রেখায় গমন করে। যদি আলোক বক্র রেখায় যাইতে পারিত তবে বোর্ডের ছিদ্রগুলি এক সরল রেখায় না থাকিলেও সে চোখে আসিয়া পড়িতে পারিত।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার পরীক্ষা (Pin-hole Camera):

স্চ-ছিদ্র ক্যামেরা, ছবি তোলার সাধারণ ক্যামেরারই মত চারিদিক-ঘেরা আয়তাকারের একটি বাক্স। (চিত্র নং ৩১) ইহার সম্মুখের দেওয়ালে
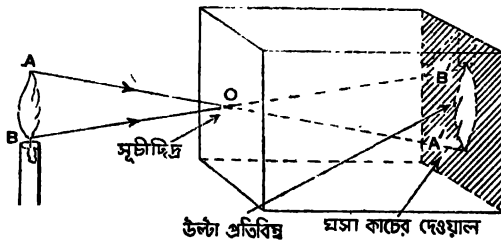
সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা

৩১ নং চিত্র

একটি খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ইহাকে সূচীছিদ্র বলে। আর পশ্চাতের দেওয়ালটি ঘসা কাঁচের তৈয়ারী থাকে। আলোক প্রতিফলন বন্ধ করিবার জন্য বাক্সের ভিতরের দিকটি কালো রং করা থাকে। একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি সূচী-ছিদ্রের সম্মুখে রাখিলে আলোর শিখাটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব (inverted image) ঘসা কাঁচের দেওয়ালে পড়িবে। অর্থাৎ শিখার সর্বোচ্চ বিন্দু A হইতে আলোক রশ্মি প্রতিবিম্বের সর্বনিম্ন বিন্দু A′ এ গিয়া পড়িবে। আবার, শিখার সর্বনিম্ন বিন্দু B প্রতিবিম্বের সর্বোচ্চ বিন্দু B′-তে পড়িবে। যদি আলোক সরল রেখায় গমন না করিত তবে আলোক শিখার উল্টা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হইত না। সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে আলোক সরল রেখায় চলে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সূচী ছিদ্রকে বড় করিলে প্রতিচ্ছবি অস্পষ্ট হইবে। কারণ একটি বড় ছিদ্র অনেকগুলি

ছোট ছিদ্রের সমষ্টি। ফলে ছিদ্র বড় হইলে ঘসা কাঁচে অনেকগুলি প্রতিবিম্ব পরস্পরের উপর পড়িবে এবং প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হইবে না। আলোক শিখাটিকে দূরে সরাইয়া প্রতিবিম্ব ছোট এবং স্পষ্টতর করা যায়।

ছায়া (Shadow) :

তোমাদের দেহের ছায়া, গাছপালার ছায়া এবং অন্যান্য বহু জিনিষের ছায়াই তোমরা দেখিয়াছ। বস্তুতঃ, সমস্ত অস্বচ্ছ বস্তুরই ছায়া উৎপন্ন হয়। আলোক উৎসের সম্মুখে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে কিছু আলোকরশ্মি ঐ অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, আলোকরশ্মি বস্তুটির পশ্চাতে যে স্থানে পৌঁছিতে পারে না সেই স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এই অন্ধকারময় স্থানকেই ঐ বস্তুর ছায়া বলে। আলোকরশ্মি বক্রপথে যাইতে পারে না বলিয়াই অস্বচ্ছ বস্তুর ঠিক পশ্চাতের স্থানটি অন্ধকারময় হয়। অতএব ছায়ার উৎপত্তিও আলোকের সরলরেখায় গমনের আর একটি প্রমাণ।

ছায়া উৎপন্ন হওয়ার জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন, যথা—আলোক উৎস, অস্বচ্ছ বস্তু এবং পর্দা। অস্বচ্ছ বস্তুর আয়তন এবং আলোর উৎসের আয়তনের উপরই ছায়ার আয়তন নির্ভর করে। নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

(i) বিন্দুর আলোক-উৎস এবং বিস্তৃত অস্বচ্ছ বস্তু (Point sources and Extended obstacle)

আলোকের উৎস যদি আকারে খুব ছোট বা বিন্দুবৎ হয় এবং অস্বচ্ছ বস্তু যদি আকারে বড় হয় তবে পর্দায় যে ছায়া পড়ে তাহা অস্বচ্ছ বস্তু হইতে সর্বদাই আকারে বড় হয় এবং একটি মাত্র কালো ছায়ার সৃষ্টি হয়।
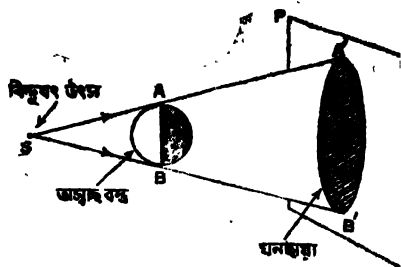
৩২ নং চিত্র

পর্দা দূরে সরাইলে ছায়ার আকার বৃদ্ধি পায়। ৩২ নং চিত্রে S এক বিন্দুবৎ আলোকের উৎস। A B অস্বচ্ছ বস্তু এবং PQ পর্দা। S হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু ASB এই শঙ্কুর (cone)

ভিতরের রশ্মিসমূহ AB বস্তু দ্বারা বাধা পাইবে এবং কোন রশ্মি পর্দায় পৌঁছিতে পারিবে না। ফলে পর্দার উপর A′B′ ছায়ার উৎপত্তি হইবে। এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখ ছায়ার আকার অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আয়তনে বড়।

(ii) বিস্তৃত আলোক উৎস ও বৃহত্তর বস্তু (Extended source but smaller than the obstacle) :

যদি আলোকের উৎস বিস্তৃত হয় কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ছোট থাকে তবে পর্দায় দুই প্রকারের ছায়ার উৎপত্তি হয়। মাঝের অংশে একটা ঘন কালো ছায়া এবং উহার চতুর্দিকে আর একটি পাতলা ছায়া পড়ে। ঘন ছায়াটিকে বলে **প্রচ্ছায়া** (Umbra) আর পাতলা ছায়াটিকে বলে **উপচ্ছায়া** (Penumbra)। উপচ্ছায়ায় কিছু আলোক পড়ে বলিয়াই সে পাতলা হয়।
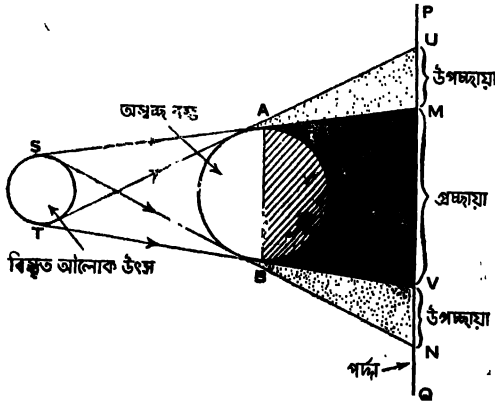
৩৩ নং চিত্র

৩৩ নং চিত্রে আলোকের উৎস ST, অস্বচ্ছ বস্তু AB এবং পর্দা PQ। এখানে ST একটি বিস্তৃত আলোক-উৎস। উহাকে কতকগুলি বিন্দু-আলোক-উৎসের সমষ্টি ধরা যাইতে পারে। এই উৎসের S প্রান্ত হইতে আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ASB শঙ্কুর (cone) অভ্যন্তরস্থ রশ্মি AB বস্তুতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পর্দায় MN ছায়ার সৃষ্টি করিবে। সেইরূপে T বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি পর্দায় UV ছায়ার উৎপত্তি করিবে। আবার ST বিন্দু মধ্যবর্তী অন্যান্য আলোক বিন্দু হইতে আগত রশ্মিগুলি যে ছায়ার সৃষ্টি করিবে তাহা UN এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকিবে। অতএব AB বস্তুর জন্য পর্দায় UN পর্যন্ত একটি ছায়ার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই ছায়ার অন্ধকার সর্বত্র সমান হইবে না। MV চিহ্নিত অংশে আদৌ আলো পড়িবে না বলিয়া ইহা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। ইহাকেই **প্রচ্ছায়া** (Umbra) বলে। আর UM এবং VN অংশে সামান্য আলো পড়িবে বলিয়া সেখানে আংশিকভাবে ছায়ার উৎপত্তি হইবে। ইহাকে **উপচ্ছায়া** (Penumbra) বলে। পরীক্ষায় লক্ষ্য করিবে যে PQ পর্দাটিকে অস্বচ্ছ পদার্থ হইতে দূরে সরাইলে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া উভয়ই আকারে বড় হইবে।

(iii) সম-আকারের আলোক উৎস এবং অস্বচ্ছ বস্তু। (Source and obstacles equal in size) :
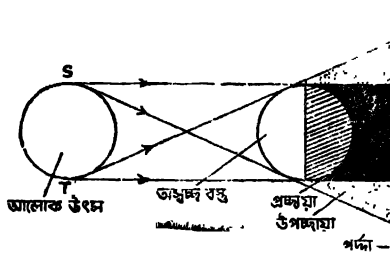
৩৪ নং চিত্র

আলোক উৎস এবং অস্বচ্ছ বস্তু আকারে সমান হইলে প্রচ্ছায়া সর্বদাই বস্তুর সমান হইবে। কিন্তু পর্দার দূরত্ব অনুযায়ী উপচ্ছায়া ছোট বা বড় হইবে। ৩৪ নং চিত্র লক্ষ্য করিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে

(iv) বৃহৎ আলোক উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তু ক্ষুদ্রতর। (Extended Source but greater than obstacle) :

আলোকের উৎস অস্বচ্ছ বস্তু হইতে বড় হইলেও উপরের (ii) পরীক্ষার ন্যায় প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পর্দা দূরে সরাইলে প্রচ্ছায় আকারে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমশঃ সরু হইতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। ৩৫ নং চিত্রে লক্ষ্য কর প্রচ্ছায়া ক্রমশঃ সরু হইয়া পর্দার P_2 অবস্থানে O বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ছায়াকে প্রচ্ছায়া শঙ্কু (Umbral Cone) বলে।

চিত্রে AOB চিহ্নিত অংশে যে প্রচ্ছায়া উহাই প্রচ্ছায়া-শঙ্কু। এইবার পর্দাকে আরও একটু দূরে সরাইয়া P_3তে লইয়া গেলে দেখা যাইবে প্রচ্ছায়া একেবারেই থাকিবে না, কিন্তু তাহার বদলে O বিন্দু হইতে একটি বিপরীত শঙ্কু MOM উৎপন্ন হইবে। পর্দার MN অংশে আলোক-উৎসের প্রান্তদেশ

হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া পড়িবে। ফলে, এই MN অংশ হইতে উৎসের দিকে তাকাইলে উহার চারিদিক দেখা যাইবে কিন্তু মধ্যাংশ দেখা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় উৎসকে PQR বলয়ের মত দেখাইবে। যদি পর্দা অনেক দূরে সরাইয়া লওয়া হয় তবে উপচ্ছায়া অস্পষ্টতর হইবে এবং অবশেষে আলো ও ছায়ার মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝা যাইবে না। সেই জন্য পাখী বা এরোপ্লেন যখন অনেক উঁচু দিয়া উড়িয়া যায় তখন তাহার ছায়া অদৃশ্য হইয়া আকাশেই মিলাইয়া যায় এক্ষেত্রে সূর্য আলোক উৎস, পাখী বা এরোপ্লেন অস্বচ্ছ বস্তু এবং মাটি পর্দা।
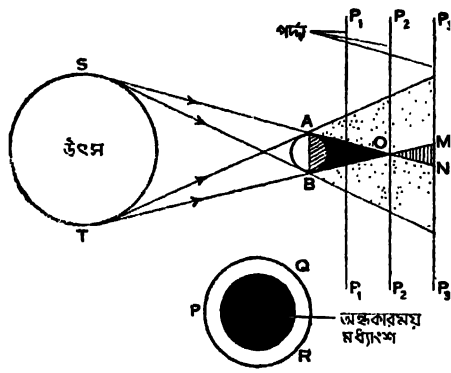
৩৫ নং চিত্র

গ্রহণ (Eclipses):

তোমরা সকলেই সম্ভবত গ্রহণ দেখিয়াছ। কখনও কখনও দিনের বেলায় ধীরে ধীরে সূর্যের উপর ছায়া পড়ে কিংবা রাত্রিতে চন্দ্রের উপর ছায়া পড়ে, তোমরা দেখিয়া থাকিবে। উহাদিগকেই আমরা সূর্য গ্রহণ অথবা চন্দ্র গ্রহণ বলি। কিভাবে গ্রহণ হয় তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

গ্রহণ কিন্তু নানা প্রকারের হইতে পারে। নিম্নে একটি ছকে বিভিন্ন ধরণের গ্রহণ দেখান হইল।
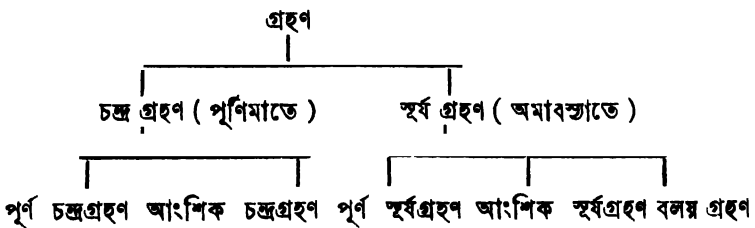
(ক) চন্দ্র গ্রহণ (Lunar Eclipse):

সূর্য একটি বিরাট আলোক-উৎস। উহা পৃথিবী হইতে অনেক বড়। পৃথিবী একটি অস্বচ্ছ বস্তু এবং সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমরা

জানি যে যদি অস্বচ্ছ বস্তু হইতে আলোকের উৎস বড় হয় তবে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই, সূর্যের আলো পৃথিবীতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উপচ্ছায়া এবং শঙ্কু-আকৃতির প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি করে। আবার চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং উহা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। পৃথিবীও চন্দ্রসহ সূর্যের চতুর্দিকে, আপন কক্ষপথে ঘুরিতেছে। এইরূপ পরিক্রমাকালে কোন কোন পূর্ণিমাতে সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী আসিয়া পড়ে এবং তাহারা একই সরল রেখাস্থিত হয়। তখন পৃথিবীর প্রচ্ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় এবং তাহারই ফলে চন্দ্র গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। ৩৬ নং চিত্র লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।
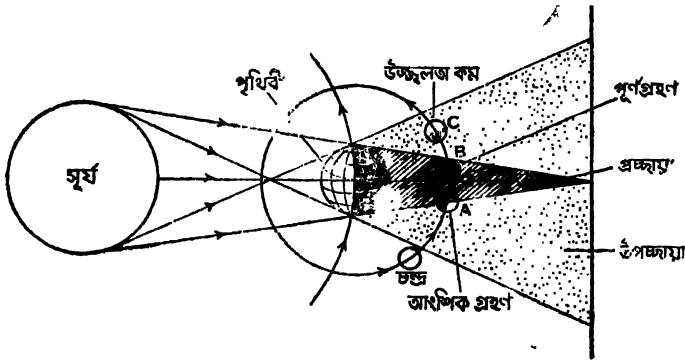
চন্দ্রগ্রহণ

৩৬ নং চিত্র

যখন চন্দ্রের কিছু অংশ প্রচ্ছায়া কর্তৃক এবং কিছু অংশ উপচ্ছায়া কর্তৃক আবৃত হয় তখন চন্দ্রের আংশিক বা খণ্ড গ্রহণ হয়। (চিত্রে A অবস্থানে চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ হইয়াছে।) আর যদি চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছয়া দ্বারা আবৃত হয় তখন চন্দ্রের পূর্ণ গ্রহণ হয়। (চিত্রে B অবস্থানে চন্দ্রের পূর্ণ গ্রহণ হইয়াছে।) উপচ্ছায়ার মধ্যে চন্দ্র থাকিলে গ্রহণ হয় না—কেবল চন্দ্রের উজ্জ্বলতা একটু কম দেখায়।

(খ) **সূর্য গ্রহণ** (Solar Eclipse) :

সূর্য গ্রহণও তিন রকমের হইতে পারে। যথা :—পূর্ণ গ্রহণ, খণ্ড গ্রহণ ও বলয় গ্রহণ।

সূর্য গ্রহণ অমাবস্যায় হয়। একই সময় সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র

আসে এবং প্রায় একই সরল রেখায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় চন্দ্রের উপচ্ছায়া এবং শঙ্কু-আকৃতি প্রচ্ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে। পৃথিবী চন্দ্র হইতে অনেক বড় বলিয়া চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর খুব সামান্য অংশের উপরই পড়িতে পারে। পৃথিবীর যে সমস্ত লোক চাঁদের প্রচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে তাহারা সূর্যকে একেবারেই দেখিতে পায় না। তাহাদের জন্য সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হয়। ৩৭ নং চিত্রে পৃথিবীর AB অংশে পূর্ণ গ্রহণ দেখা যাইবে।
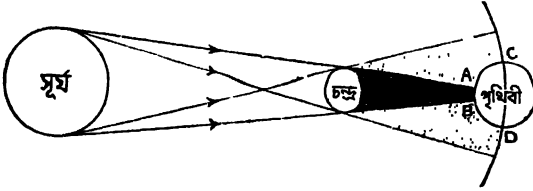
৩৭ নং চিত্র সূর্যগ্রহণ

কিন্তু যে সমস্ত লোক চাঁদের উপচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে, যেমন—চিত্রের AC এবং BD অংশ, সেই সব লোক সূর্যের কিছু অংশ দেখিতে পাইবে। সুতরাং, যেখানে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেখানে হইতে সূর্যের আংশিক বা খণ্ডগ্রাস দেখা যায়। চিত্রে AC এবং BD অংশ হইতে খণ্ডগ্রাস দেখা যাইবে।

সব সময় চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব এক রকম থাকে না। ফলে অনেক সময় এমন হয় যে, চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায় এবং একটি বিপরীত শঙ্কুর সৃষ্টি হয়। ৩৮ নং চিত্রে চন্দ্রের শঙ্কু
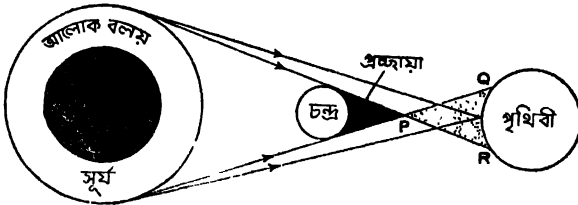
৩৮নং চিত্র সূর্যের বলয় গ্রহণ

আকৃতি প্রচ্ছায়া P বিন্দুতে শেষ হইয়া আবার বিপরীত শঙ্কু PQR এর সৃষ্টি করিয়াছে। এখন QR এর মধ্যে অবস্থিত লোকেরা সূর্যের দিকে তাকাইলে সূর্যের মাঝখানে একটি অন্ধকারময় গোলাকৃতি অংশ এবং উহার চতুর্দিকে আলোকিত বলয় দেখিতে পাইবে। এই ধরণের গ্রহণকে বলয়-গ্রহণ (annular eclipes) বলে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে প্রতি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় গ্রহণ হয় না কেন ?

কারণ চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় না থাকিলে গ্রহণ হইতে পারে না। প্রতি অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমাতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী পর পর থাকে বটে কিন্তু একই সরল রেখায় থাকে না। কারণ, পৃথিবীর কক্ষতল (Plane of orbit) এবং চন্দ্রের কক্ষতল একসমতলে অবস্থিত নহে। দুই কক্ষতলের মধ্যে প্রায় 5° কোণ আছে। কাজেই পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় উহারা পর পর অবস্থান করিলেও সর্বদা এক সরল রেখায় মিলিত হয় না। তাহা ছাড়া, ঋতু-ভেদে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বেরও তারতম্য হয়। এইসব কারণে প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ বা প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না।
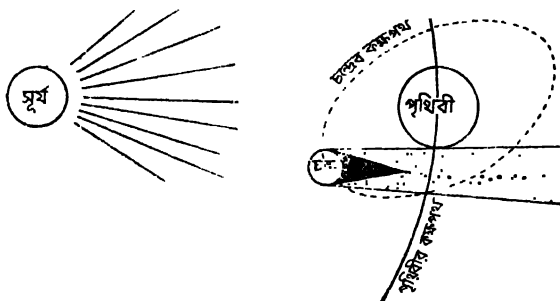
৩৯ নং চিত্র

[৩৯ নং চিত্রে অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী পর পর অবস্থিত বটে কিন্তু এক সরল রেখায় নহে। সেইজন্য সূর্য গ্রহণ হইল না।]

পার্থক্য :

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি এই : সূর্যের বলয় গ্রহণ হয় কিন্তু চন্দ্রের বলয় গ্রহণ হয় না। চন্দ্রের ছায়া আকারে ছোট বলিয়া উহা পৃথিবীর সামান্য অংশের উপর পড়ে। ফলে, সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর সামান্য অংশ হইতে দৃশ্য হয়। কিন্তু পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের আকারের তুলনায় অনেক বড় বলিয়া চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিতে পারে। আর সেই জন্য চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে অংশে রাত্রি সেই অংশের সমস্ত স্থান হইতেই চন্দ্র গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সূর্যগ্রহণ অমাবস্যাতে হয় আর চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমাতে।

আলোকের প্রতিফলন (Reflection of Light) :

আমরা জানি আলোক রশ্মি একই রকম মাধ্যমে সর্বদা সরল রেখায় গমন করে। একই মাধ্যমে সরল রেখায় চলিতে চলিতে আলোক রশ্মি যদি কোন দ্বিতীয় মাধ্যমে আসিয়া পড়ে তখন উহা দিক পরিবর্তন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের মিলন-স্থলে আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া উহার কিছু অংশ পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। আলেকরশ্মির এইরূপ দিক পরিবর্তনকেই আলোকের **প্রতিফলন** (Reflection of light) বলে। ৪০ নং চিত্রে AB আলোক রশ্মিটি প্রথমে বায়ুর মাধ্যমে সরল রেখায় চলিতে চলিতে দ্বিতীয় মাধ্যম আয়নার কাচে প্রতিহত হইয়া BC পথে পুনরায় বায়ুর মাধ্যমেই ফিরিয়া আসিয়াছে। লক্ষ্য কর আলোক-রশ্মির আর কিছু অংশ BD পথে আয়নার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে আলোকের প্রতিসরণ (refraction of light) বলে। প্রতিসরণের কথা আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে কেবল আলোকের প্রতিফলনের কথাই বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।
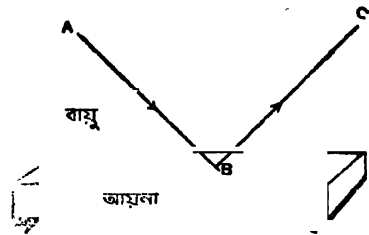
৪০ নং চিত্র—আলোকের প্রতিফলন

যে তল হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয় তাহাকে **প্রতিফলক** (Reflector) বলে। যেমন—আয়না, চকচকে ধাতুর পাত প্রভৃতি।
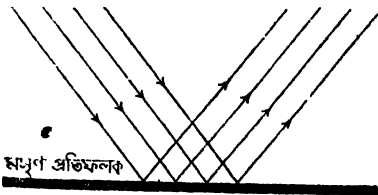
৪১ নং চিত্র (ক) নিয়মিত প্রতিফলন (খ) বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন
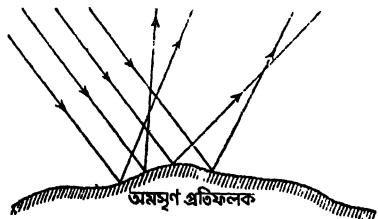
প্রতিফলকের তলের মসৃণতা অনুযায়ী আলোর প্রতিফলন দুই প্রকার হইতে পারে। যথা—(1) নিয়মিত (regular) প্রতিফলন, (2) বিক্ষিপ্ত (irregular or diffused) প্রতিফলন। ৪১ (ক, খ) নং চিত্রে নিয়মিত

এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন দেখান হইল। যদি প্রতিফলকের তল মসৃণ হয় তবে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলনের পূর্বের রশ্মিগুলির সহিত প্রতিফলনের পরের রশ্মিগুলির একটি মিল থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই রশ্মিগুলি একই রকম ভাবে সমান্তরাল থাকে। কিন্তু অমসৃণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে না। সেখানে প্রতিফলিত রশ্মি এলোমেলো ভাবে চতুর্দিকে চড়াইয়া পড়ে। অমসৃণ কাগজ, ছাদ, দেওয়াল, কাপড় প্রভৃতি অমসৃণ তল হইতে অনিয়মিত প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে।

সমতল দর্পণে বা সমতল পৃষ্ঠে আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light at plane mirror or plane surface) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমতল দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলন হয়। নিয়মিত প্রতিফলন কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে। ৪২ নং চিত্রে নিয়মিত প্রতিফলনের নিয়মগুলি এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার বিবরণ বিশদভাবে দেখানো হইল।
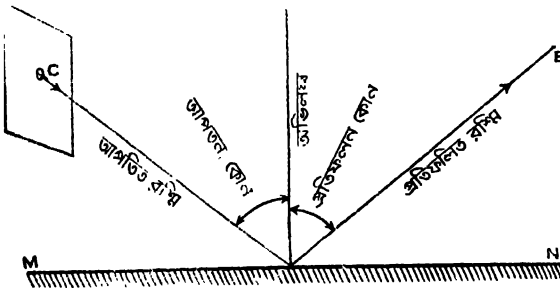
সমতল দর্পণে আলোকের প্রতিফলন

৪২নং চিত্র

MN একটি সমতল দর্পণ। C ছিদ্রপথে একটি আলোকরশ্মি দর্পণের D বিন্দুতে পতিত হইয়াছে। D বিন্দুকে আপতন বিন্দু এবং CD রশ্মিকে অপতিত-রশ্মি বলে। DE রশ্মিকে বলা হয় প্রতিফলিত রশ্মি। সমতল দর্পণের D বিন্দুতে DN লম্ব টানা হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় অভিলম্ব। অতএব দেখা যাইতেছে যে,

(i) উৎস হইতে যে রশ্মিটি দর্পণের উপর পতিত হয় তাহাকে আপতিত রশ্মি (incident ray) বলে।

(ii) দর্পণের যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি পতিত হয় তাহাকে আপতন বিন্দু (Point of incidence) বলে।

(iii) আপতন-বিন্দু হইতে যে রশ্মিটি প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে তাহাকে প্রতিফলিত রশ্মি (Reflected ray) বলে।

(iv) আপতন-বিন্দু হইতে দর্পণের সমতল পৃষ্ঠের উপর যে-লম্ব টানা হয় তাহাকে অভিলম্ব (Normal) বলে।

(v) আপতিত-রশ্মি এবং অভিলম্বের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাহাকে আপতন কোণ (Angle of incidence) বলে। চিত্রে আপতন কোণ $= \angle CDN$।

(vi) প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্বের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে প্রতিফলন কোণ (Angle of reflection)। চিত্রে প্রতিফলন কোণ $= \angle EDN$।

নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র বা নিয়ম (Laws of Reflection) :

(1) আপতন কোণ প্রতিফলন কোণ ও সর্বদা সমান হয়। অর্থাৎ $\angle CDN = \angle EDN$।

(2) আপতিত-রশ্মি, প্রতিফলিত-রশ্মি এবং আপতন-বিন্দু দিয়া দর্পণের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে। অর্থাৎ CD, DN এবং DE রেখাগুলি একই সমতলে সর্বদা অবস্থান করিবে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি হইতে আলোকের প্রতিফলন এবং তাহার নিয়মগুলি বুঝিতে পারিবে।

(A) ধূমময় বাক্সে প্রতিফলনের পরীক্ষা (Experiment with a smoke box) :—

প্রায় দেড় হাত লম্বা এবং আধহাত চওড়া একটি আয়তাকার কাঠের বাক্স লও। ইহার সম্মুখের এবং উপরের দেওয়াল দুইটি কাচের তৈয়ারী কর। আর পিছনের দেওয়ালটি কর দুই টুক্‌রা কালো কাপড়ের, যাহাতে পর্দার ফাঁক দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস বাক্সে ঢুকানো যায়। [৪৩ (ক) চিত্র দেখ]। বাক্সের একপাশের দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটি জানালা কাট এবং ইহাকে

তিনটি ছিদ্রযুক্ত কালো কার্ডবোর্ড দিয়া বন্ধ করিয়া দাও। ধূপকাঠি বা অন্য কিছু জ্বালাইয়া বাক্সের ভিতর ধোঁয়ার সৃষ্টি কর। এখন (৪৩ খ) চিত্রের ন্যায় বাক্সের অপর পার্শ্বের দেওয়ালের নিকট একটি দর্পণ তির্যক ভাবে রাখ। এইবার কোন আলোক উৎসকে প্রায় হাত দুই দূরে রাখিয়া কার্ডবোর্ডের ছিদ্র

৪৩ (ক) নং চিত্র
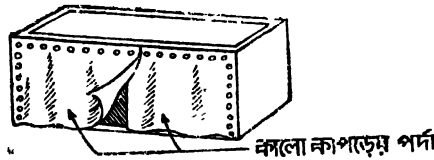
৪৩ (খ) নং চিত্র
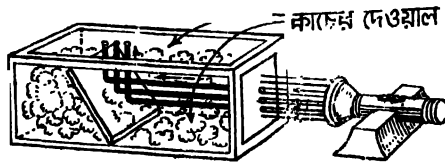
তিনটি দিয়া বাক্সের ভিতর আলো ফেল। দেখিবে ধোঁয়ার জন্য আলোর আপতিত এবং প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ স্পষ্ট দেখা যাইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখ দর্পণের উপর হইতে রশ্মির গতিপথের পরিবর্তন হইয়াছে।

(B) পিন পদ্ধতিতে পরীক্ষা (Pin method) :—

ইহা ছাড়া, পিন দ্বারাও আলোকের প্রতিফলনের নিয়মগুলি সঠিক ভাবে পরীক্ষা করিতে পারি। একটি সমতল বোর্ডে এক-খানি সাদা কাগজ পিন দ্বারা আটকাও এবং পেন্সিল দ্বারা AB একটি রেখা টান (৪৪ নং চিত্র দেখ) এইবার একটি পাতলা সমতল দর্পণ
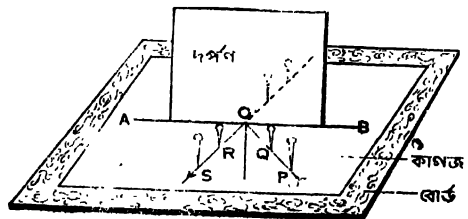
পিন প্রণালীতে প্রতিফলনের নিয়মের পরীক্ষা
৪৪ নং চিত্র

চিত্রের ন্যায় খাড়াভাবে AB রেখার সহিত মিলাইয়া আটকাও। এখন P ও Q দুইটি পিন এমন ভাবে আঁট যেন উহাদের পদদ্বয় যোগ করিলে PQ সরলরেখা দর্পণের AB রেখার আনতভাবে (obliquely) O বিন্দুতে মিলিত হয়।

এখন অপর দিক হইতে তাকাইয়া দর্পণের ভিতরে P ও Q পিন দুইটির প্রতিবিম্বের পদদ্বয় এক সরল রেখায় দেখিতে চেষ্টা কর। যখন উহাদিগকে এক সরল রেখায় দেখিবে তখন আরও দুইটি পিন, S ও R, বোর্ডে আঁটিবে যাহাতে উহারাও প্রতিবিম্বের পদদ্বয়ের সহিত এক সরল রেখায় থাকে। পিনগুলির অবস্থান পেন্সিলের দ্বারা চিহ্নিত কর। এইবার দর্পণ ও পিনগুলি সরাইয়া PQ ও SR রেখাদ্বয় টান। দেখিবে, উহারা AB রেখায় O বিন্দুতে মিলিত হইবে।

এস্থলে PQ আপতিত এবং RS প্রতিফলিত রশ্মি। O বিন্দু হইতে AB রেখার উপর লম্ব টানিলে উহা দর্পণের উপর আয়তন-বিন্দুতে অভিলম্ব হইবে। উহারা সকলেই কাগজের সমতলের উপর অবস্থিত বলিয়া প্রমাণিত হয় যে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলের উপর অবস্থিত। ইহা প্রতিফলনের দ্বিতীয় নিয়ম।

এখন আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ মাপ। দেখিবে, উহারা পরস্পর সমান অর্থাৎ, আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ। ইহা প্রতিফলনের প্রথম নিয়ম প্রমাণ করে।

গোলীয় দর্পণে আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light at Spherical Mirror) :

আমরা বাড়ীতে যে আয়না ব্যবহার করি তাহা সমতল দর্পণ। যদি এই আয়না রান্নার কড়াই এর মত গোল হইত তবে আমরা উহাকে গোলীয় দর্পণ বলিতাম। মনে কর তোমাদের রান্নার কড়াইটি চক্‌চকে মসৃণ ধাতুর (ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল) তৈরী। এইবার যদি তোমার মুখ প্রতিফলিত কড়াই-এর ভিতর দিক হইতে দেখ তবে ইহা গোলীয় অবতল দর্পণের কাজ করিবে। আর যদি কড়াইটিকে উপুড় করিয়া বাহিরের দিক হইতে তোমার মুখের প্রতিফলন দেখ তবে উহা গোলীয় উত্তল দর্পনের কাজ করিবে।

যদি কোন ফাঁপা গোলকের বাহিরের কিংবা ভিতরের দিকে কিছু অংশ চক্‌চকে মসৃণ হয় যাহার ফলে উহার ভিতরের কিংবা বাহিরের দিক আলোক রশ্মির প্রতিফলকের কাজ করে, তবে ঐ গোলকের অংশকে **গোলীয় দর্পণ** বলা হয়।

গোলীয় দর্পণ দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—উত্তল (Convex) ও অবতল (Concave)।

গোলীয় দর্পণের বাহিরের দিক প্রতিফলকের কাজ করিলে উহাকে **উত্তল দর্পণ** বলে। [চিত্র ৪৫ (A) দেখ] আর গোলীয় দর্পণের ভিতরের দিক অর্থাৎ যে পার্শ্ব গহ্বরের মত সেই তল যদি প্রতিফলকের কাজ করে তবে তাহাকে **অবতল দর্পণ** বলে। [চিত্র ৪৫ (B)]।
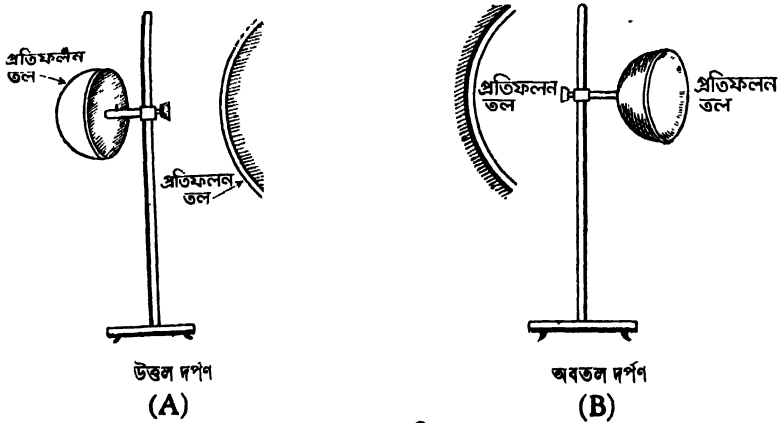
৪৫নং চিত্র

আলোকের প্রতিফলক হিসাবে গোলীয় দর্পণের অনেক ব্যবহার দেখা যায়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে মোটর গাড়ীর চালকের সামনে একটা গোলীয় দর্পণ থাকে। ইহার সাহায্যে তাহারা পিছনের গাড়ী দেখিতে পায়। নাক, কান, গলা ইত্যাদির বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ তাঁহাদের কপালে অবতল গোলীয় দর্পণ আটকাইয়া রোগীর নাক, কান, গলা ইত্যাদির ভিতরে আলো ফেলেন। টর্চলাইট, মোটর গাড়ীর হেড্‌লাইট, রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সন্ধানী আলোর (Search light) মুখের পিছনে একটি অবতল দর্পণ প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে সম্মুখের পথ দেখার কাজে অনেক সুবিধা হয়।

গোলীয় দর্পণের প্রতিফলন সমতল দর্পণের প্রতিফলনের নিয়মগুলিই মানিয়া চলে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রেও আপতন কোন ও প্রতিফলিত কোণ সমান হয়। ABC বৃত্তের AB অংশ একটি গোলীয় দর্পণ। আমরা জানি বৃত্তের

পরিধি হইতে কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত কোন সরলরেখা পরিধির উপর লম্ব হয়। অতএব PO রেখা AB দর্পণের উপর অভিলম্ব। QP আপতিত রশ্মি এবং PR প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন কোণ QPO = প্রতিফলিত কোণ OPR। গোলীয় দর্পণের মধ্য বিন্দুটিকে বলে **মধ্যবিন্দু বা মেরু**। ৪৬ নং চিত্রে P বিন্দু AB দর্পণের মধ্যবিন্দু। দর্পণটি যে গোলকের অংশ তাহার কেন্দ্রকে দর্পণটির বক্রতা-কেন্দ্র বলে। ৪৬ নং চিত্রে O বিন্দু **বক্রতা-কেন্দ্র** (Centre of Curvature)। মধ্যবিন্দু বা মেরু এবং বক্রতা-কেন্দ্রের সংযোগ রেখাকে **প্রধান অক্ষ** (Principal Axis) বলে।
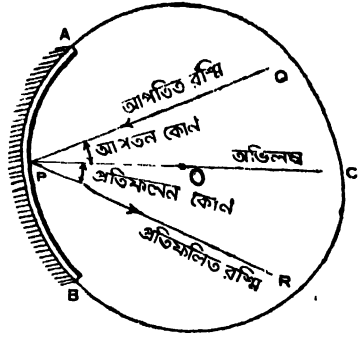
গোলীয় দর্পণে প্রতিফলন
৪৬ নং চিত্র

অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যদি কতকগুলি রশ্মি পতিত হয় তবে প্রতিফলনের পর সত্য সত্যই উহারা প্রধান অক্ষের উপর একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই বিন্দুকেই প্রধান ফোকাস বিন্দু বলা হয়। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই বিন্দুটি বাস্তব (real) কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ইহা অলীক (virtual)। অর্থাৎ সমান্তরালে আলোক রশ্মি সত্য সত্যই কোন এক
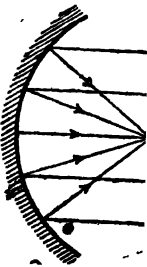
(ক) অবতল দর্পণে ফোকাস
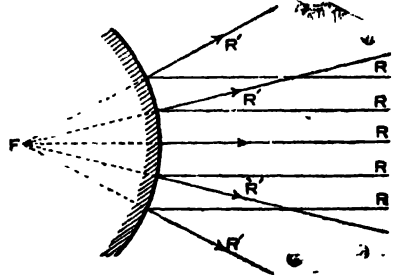
(খ) উত্তল দর্পণে ফোকাস

৪৭নং চিত্র

বিন্দুতে মিলিতে হয় না, শুধু মনে হয় যেন কোন এক বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে। (৪৭ নং ক ও খ চিত্র দেখ) অবতল দর্পণে R রশ্মিগুলি প্রতিফলনের পর সত্য সত্যই F বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। আর উত্তল দর্পণের

ক্ষেত্রে R রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হওয়ার পর R′ পথে গমন করিয়াছে। কিন্তু R′ রশ্মিগুলিকে দেখিলে মনে হয় যেন উহারা F′ বিন্দু হইতে বাহির হইতেছে।

সমতল ও অবতল দর্পণে প্রতিবিম্বের বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of Light) :

আলোক রশ্মি যখন মাধ্যম পরিবর্তন করে তখন তাহার গতিপথেরও কিছু পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, আলোক রশ্মি যখন বায়ু হইতে জলে অথবা বায়ু হইতে কাচে প্রবেশ করে তখন দুই মাধ্যমের সংযোগস্থলে ইহার গতিপথ সামান্য বাঁকিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করিবার পর উহা পুনরায় সরল-রেখায় গমন করে। মাধ্যম পরিবর্তনের সময় আলোর এইরূপ গতি-পরিবর্তনকেই আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light) বলে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে আলোক রশ্মি যখন দ্বিতীয় মাধ্যমের উপরিতলে তির্যকভাবে পড়ে, লম্বভাবে নহে, তখনই মাত্র উহা দুই মাধ্যমের মিলনস্থলে বাঁকিয়া যায়। লম্বভাবে পতিত হইলে আলোক রশ্মির কোনরূপ প্রতিসরণ ঘটে না। অর্থাৎ গতিপথের পরিবর্তন হয় না।
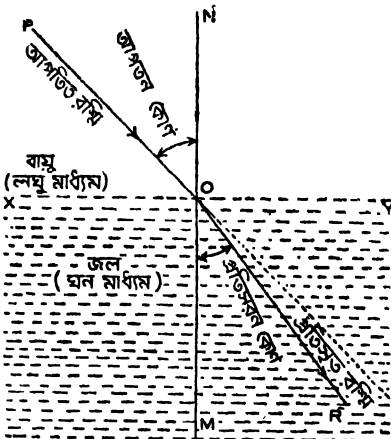
লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণ
চিত্র নং ৪৮ (ক)

আবার, লঘু-মাধ্যম হইতে ঘন-মাধ্যম (যেমন বায়ু হইতে জলে) যে প্রতিসরণ, আর ঘন-মাধ্যম হইতে লঘু-মাধ্যমে (যেমন জল হইতে বায়ুতে) যে প্রতিসরণ তাহাদের নিয়মের মধ্যে কিছু পার্থক্য ঘটে। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রতিসরণের, বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করা হইল। মনে কর, ৪৮ (ক) চিত্রে PO একটি আলোক রশ্মি বায়ু হইতে জলে পতিত হইয়াছে। এখানে PO রশ্মিকে আপতিত রশ্মি বলে। O বিন্দুকে বলা হয় আপতন বিন্দু। XY দুই মাধ্যমের সংযোগ-তল। O বিন্দু হইতে এই XY এর উপর যে লম্ব টানা

হয় তাহাকে বলে **অভিলম্ব**। চিত্রে NOM একটি অভিলম্ব। এখন আপতিত-রশ্মি PO, উভয় মাধ্যমের সংযোগস্থল O বিন্দুতে সামান্য বাঁকিয়া দ্বিতীয় মাধ্যম, জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উহাকে OR দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এই OR রশ্মিকে **প্রতিসৃত রশ্মি** বলে। লক্ষ্য কর, প্রতিসৃত-রশ্মি OR অভিলম্ব NOM এর দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। আলোকরশ্মি যখন লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায়, এই নিয়ম। অর্থাৎ আপতন ∠PON প্রতিসরণ ∠MOR হইতে বড় হয়। অভিলম্ব এবং প্রতিসৃত রশ্মির মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় (∠MOR) তাহাকে **প্রতিসরণ কোণ** (angel of refraction) বলে। এইবার ৪৮ (খ) চিত্র লক্ষ্য কর। দেখ, আপতিত রশ্মি ঘন-মাধ্যম জল হইতে, লঘু মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে

ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যম আলোকের প্রতিসরণ
চিত্র নং ৪৮ (খ)

আপতিত-রশ্মি AB, B বিন্দুতে বাঁকিয়া গিয়াছে, এবং প্রতিসৃত রশ্মিরূপে BC-পথে বায়ুতে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিসৃত রশ্মি BC, অভিলম্ব EBM হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আপতন ∠ABM প্রতিসরণ ∠EBC হইতে ছোট হইয়াছে।

প্রতিসরণের সূত্র বা নিয়ম (Laws of Refraction)

A. প্রথম সূত্র :—(i) আলোক রশ্মি লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসৃত হইলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরিয়া আসিবে অর্থাৎ আপতন কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ ছোট হইবে। (ii) আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রতিসৃত হইলে প্রতিসৃত-রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে অর্থাৎ, আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোট হইবে। এখন, এই দুইটি নিয়মকে একত্র করিয়া বলা যায় যে দুইটি

স্বচ্ছ মাধ্যমের ক্ষেত্রে আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণের ছোট বা বড় হওয়া একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ঘটিয়া থাকে।

B. দ্বিতীয় সূত্র:—আপতিত-রশ্মি, প্রতিসৃত-রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।
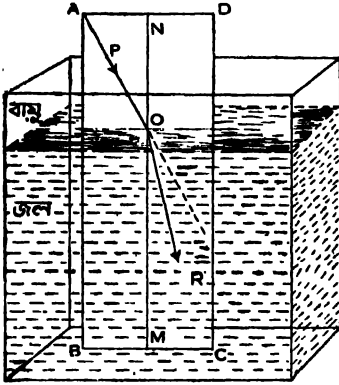
৪৯ নং চিত্র

৪৯ নং চিত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় সূত্রটি ভাল করিয়া বোঝান হইল।

একটি চৌবাচ্চার জলে একটি সমতল টিনের পাত ABCD, লম্বভাবে ডুবান হইল। টিনের পাতের সমতলে আপতিত-রশ্মি PO অবস্থিত। প্রতিসরণের পরে প্রতিসৃত রশ্মির OR ঐ পাতের সমতলের উপর দিয়াই যাইবে এবং অভিলম্ব NOM টিনের পাতের উপর অবস্থিত থাকিবে। অতএব আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতল ABCD এর উপর অবস্থিত রহিয়াছে।

কাচের মধ্যে প্রতিসরণ (Refraction in glass): ৫০ নং চিত্রে PQRS একটি আয়তাকার কাচখণ্ড। PS, বায়ু এবং কাচের বিভাগতল। AB একটি আলোকরশ্মি বায়ু হইতে কাচের উপর B বিন্দুতে পতিত হইয়াছে।
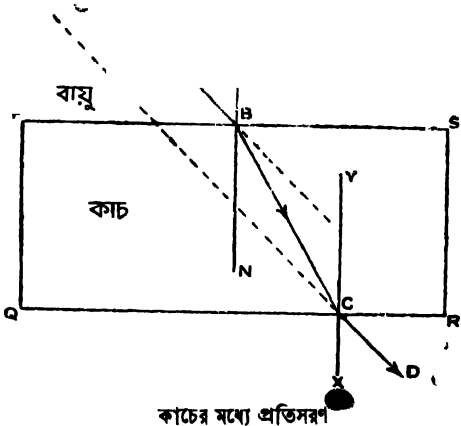
কাচের মধ্যে প্রতিসরণ
৫০ নং চিত্র

আপতিত রশ্মিটি উভয় মাধ্যমের বিভাগতলে প্রতিসৃত হইয়া MBN অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে এবং প্রতিসৃত রশ্মিরূপে BC পথে কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। BC আলোকরশ্মি আবার দুই মাধ্যমের সংযোগস্থল C বিন্দুতে আসিয়া পড়িয়াছে। এইবার কিন্তু আলোকরশ্মি ঘন-মাধ্যম কাচ হইতে,

লঘু-মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করিতেছে। লক্ষ্য কর যে প্রতিসৃত রশ্মি CD, অভিলম্ব XCY হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

জলে আলোকের প্রতিসরণ :

একটি আয়তাকার শিশিকে ঘোলা জলে (কয়েক ফোঁটা দুধ দিলেই জল ঘোলা হইবে) পূর্ণ কর। এইবার ইহাকে তির্যক অবস্থায় (৫০ ক নং চিত্রে দেখ) একটি ধূপপূর্ণ বাক্সে (smoke box) রাখ। এখন ইহার উপর যদি একগুচ্ছ আলোকরশ্মি ফেলা যায় তবে উপরের পরীক্ষার ন্যায় আলোক
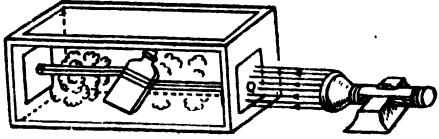
৫০ ক নং চিত্র

রশ্মির প্রতিসরণ প্রথমে বায়ু হইতে জলে এবং পরে জল হইতে-বায়ুতে হইবে। ধোঁয়া ও ঘোলা জলের জন্য রশ্মির সমগ্র গতি-পথটিই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। আবার তোমরা জান যে লম্বভাবে পতিত রশ্মির কোনরূপ প্রতিসরণ হয় না। যদি শিশিটিকে বাক্সের মধ্যে সোজা করিয়া দাঁড় করাও তবে দেখিবে আলোকরশ্মির কোনরূপ প্রতিসরণ হইবে না কারণ রশ্মি জল-তলের উপর লম্বভাবে পড়িবে।

***আলোকের প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও সরল পরীক্ষা :—**

1. **জলে নিমজ্জিত দণ্ডের বক্রতা :**

একটি সোজা লাঠি তির্যকভাবে আংশিক জলে নিমজ্জিত রাখিলে মনে হয় যেন লাঠিটি যেখানে জল স্পর্শ করিয়াছে ঠিক সেই স্থান হইতে বাঁকিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ জলের মধ্যের অংশ এবং বাহিরের অংশ এক সরলরেখায় নাই।
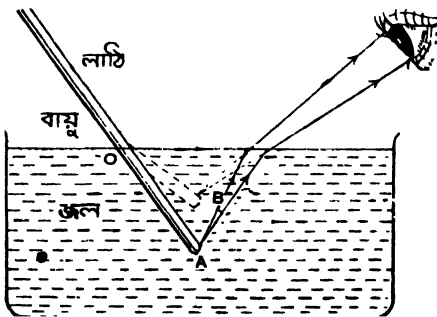
৫১ নং চিত্র

বলা বাহুল্য, আলোকের প্রতিসরণের জন্যই এইরূপ ঘটে। জলের বাহিরের অংশ হইতে আলোক সোজাসুজি আমাদের চোখে আসে। তাই লাঠির উপরের অংশকে আমরা যথাস্থানেই দেখি। কিন্তু লাঠির নিচের অংশ হইতে যে আলোক রশ্মি বাহির হইয়া আসে, তাহা দুই মাধ্যম হইয়া আমাদের

চোখে পড়ে। সেইজন্য লাঠির নিমজ্জিত অংশ সামান্য ওপরের দিকে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ৫১নং চিত্রে OA অংশের প্রতিবিম্ব OBতে দেখা যাইবে, এবং A বিন্দুটি B বিন্দুতে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

2. জলে নিমজ্জিত মুদ্রার প্রতিবিম্ব :

একটি পাত্রে একটি টাকা রাখিয়া চক্ষুকে এমনভাবে স্থির কর যেন, টাকাটি দৃষ্টির সামান্য একটু বাহিরে থাকে। ৫২ (ক) নং চিত্র লক্ষ্য কর। টাকা হইতে আগত আলোকরশ্মি পাত্রের গায়ে বাধা পাইয়া চোখে প্রবেশ করে নাই অর্থাৎ, PAB রশ্মি দৃষ্টির সামান্য বাহিরে রহিয়াছে। এই অবস্থায়
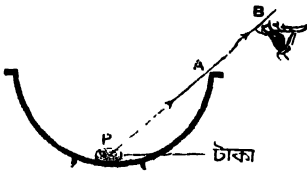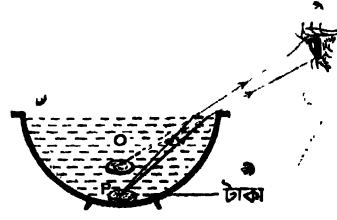
(ক) জলশূন্য পাত্র জলপূর্ণ পাত্র

৫২নং চিত্র

তোমার চোখ স্থির রাখিয়া পাত্রে জল ঢাল, দেখিবে টাকাটি এইবার দেখা যাইবে। কিন্তু কেন? কারণ, পাত্রে জল ঢালায় টাকা হইতে আগত রশ্মি বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং সহজেই তোমার চোখে আসিয়াছে। ৫১(খ) নং চিত্র লক্ষ্য কর, দেখিবে টাকাটি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, বলিয়া মনে হইবে। ঠিক একই কারণে জলপূর্ণ চৌবাচ্চার তলদেশটিকে সামান্য উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। অর্থাৎ, উহার গভীরতা কমিয়া যায় বলিয়া ধারণা হয়।
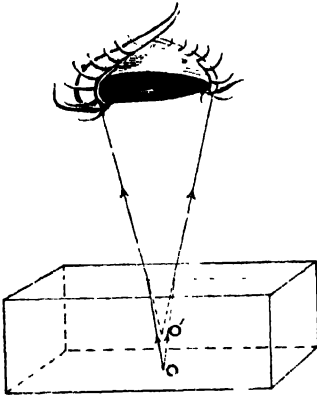
৫৩ নং চিত্র

3. একটি কাগজের উপর কালির একটি ফোঁটা ফেলিয়া উহার উপর একটি আয়তাকার কাঁচের খণ্ড রাখ। এইবার কাঁচের ভিতর দিয়া সোজাসুজি ফোঁটাটি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যেন উহা খানিকটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আলোকের প্রতিসরণই উহার কারণ।

৫৩ নং চিত্র লক্ষ্য করিলে কাঁচের তলায় O বিন্দুকে, উপরে O′ বিন্দুতে দেখা যাইবে। কারণ O হইতে আলোকরশ্মি বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং চোখে দেখা যাইবে যেন রশ্মিগুলি O′ বিন্দু হইতে আসিতেছে।

লেন্স (Lens)

তোমরা সকলেই হয়তো চশমার কাচ, বিবর্ধক কাচ (magnifying glass) সাধারণ দহনকরী কাচ, (burning glass) ক্যামেরার মুখের গোল কাচ, অনুবিক্ষণ যন্ত্রের মুখের গোল কাচ প্রভৃতি দেখিয়াছ। এই কাচগুলি কিন্তু সর্বত্র সমান পুরু নয়। এইরূপ জাতীয় কাচের কোন কোনটির মধ্যভাগ বেশ পুরু আর প্রান্তভাগে সরু থাকে। আবার কোন কোনটির মধ্যভাগ সরু আর প্রান্তভাগ পুরু হয়। এইরূপ কাচকে লেন্স (Lens) বলে। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে দুইটি গোলীয় তল অথবা একটি গোলীয় তল এবং অন্যটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় তবে তাহাকে লেন্স বলে।

গোলীয় দর্পণের ন্যায় লেন্সও প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়। যথা—**উত্তল** (Convex) ও **অবতল** (Concave)। চিত্র নং ৫৪ (A ও B) লক্ষ্য কর।
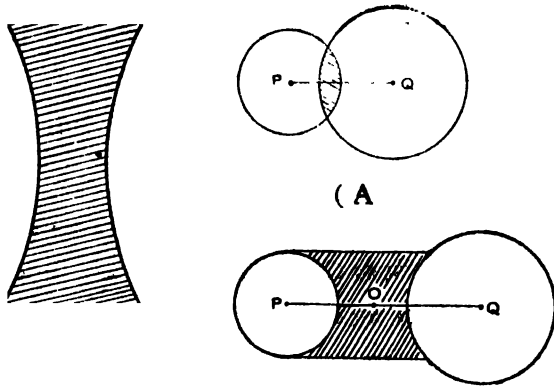
(A) উত্তল লেন্স (B) অবতল লেন্স
৫৪নং চিত্র ৫৫ নং চিত্র (B)

উত্তল লেন্সের মধ্যস্থল মোটা আর প্রান্তের দিক সরু। **অবতল** লেন্সের মধ্যস্থল সরু আর প্রান্তের দিক মোটা থাকে।

যে দুইটি তল দ্বারা লেন্সটি সীমাবদ্ধ সেই দুই তলের বক্রতার কেন্দ্র-সংযোজক সরলরেখাকে ঐ লেন্সের প্রধান অক্ষ বলে। ৫৫ নং (A ও B) চিত্রে PQ সরলরেখাটি **প্রধান অক্ষ** (Principal Axis)

যদি একগুচ্ছ সরু সমান্তরাল রশ্মি উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় তাহা হইলে প্রতিসরণের পর প্রতিসৃত রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের উপর কোন এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। ঐ বিন্দুকে লেন্সের ফোকাস বলে। কিন্তু অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হয়। সেখানে প্রতিসৃত রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের কোন একটি বিন্দু হইতে বহির্গত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখানে এই বিন্দুটিকেই লেন্সের ফোকাস বলে (Principal focus)। ৫৬ নং A ও B চিত্রে উত্তল লেন্সের ফোকাস F এবং অবতল লেন্সের ফোকাস F′

আমরা যে সমস্ত লেন্স সচরাচর ব্যবহার করি তাহাদের দুইটি তলই সমান ভাবে বাঁকানো থাকে। ঐ ধরণের লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর
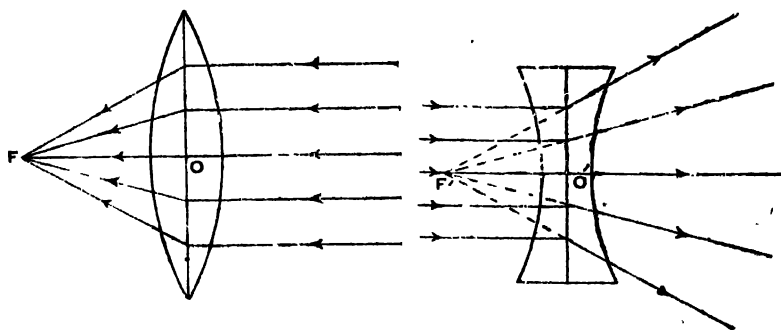
(*A*) উত্তল লেন্স (*B*) অবতল লেন্স

৫৬ নং চিত্র

অবস্থিত এবং লেন্সের উভয় তল হইতে সমান দূরে অবস্থিত যে বিন্দু তাহাকে [৫৬ নং A ও B চিত্রের O এবং O′] লেন্সের আলোককেন্দ্র বলে (Optical centre)। লেন্সের আলোককেন্দ্র হইতে ফোকাসের দূরত্বকে ফোকাল দূরত্ব (Focas length) বলে। ৫৬ নং (A ও B) চিত্রে OF এবং O′F′ ফোকাস দূরত্ব।

প্রতিবিম্ব (Image):

প্রতিবিম্ব তোমাদের অজানা নয়। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমরা হয়ত প্রতিদিনই নিজের আকৃতির প্রতিবিম্ব দেখ। কিন্তু উহা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা এখন বলিব। একটি পয়সাকে বই দিয়া চাপা দিলে

উহাকে আর দেখা যাইবে না, কারণ পয়সা হইতে কোন আলোক রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে না। বস্তুত, কোন পদার্থ হইতে তখন আলোক রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে তখনই আমরা সেইটিকে দেখিতে পাই। এই আলোক রশ্মি পদার্থ হইতে সোজাসুজি আমাদের চোখে আসিয়া পড়িতে পারে। আবার, প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়াও পড়িতে পারে। যখন আলোকরশ্মি কোন পদার্থ হইতে সোজাসুজি আমাদের চোখে পড়ে তখন আমরা পদার্থটিকে উহার নিজ জায়গায়ই দেখিতে পাই। কিন্তু যদি আলোক রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া বাঁকিয়া আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমাদের চক্ষু আসল পদার্থটিকে যথাস্থানে দেখে না। যেদিক হইতে আলোকরশ্মি চোখে আসে সেই দিকে বস্তুটির একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। এই প্রতিচ্ছবিকেই সাধারণ ভাষায় প্রতিবিম্ব বলে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পদার্থটির কোন স্থান বদল হয় না। যখন সূর্যরশ্মি পুকুরের জলে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পড়ে তখন মনে হয় যেন সূর্য পুকুরের তলায় আছে এবং আলোক রশ্মি সেখান হইতে আসিতেছে।

অতএব, **যখন কোন বিন্দু প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসৃত হইয়া অন্য একটি বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়, তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দু-প্রভবের প্রতিবিম্ব বলে।**

প্রতিবিম্ব দুই প্রকারের হয়। উহাদিগকে সদ্-বিম্ব ও অসদ্-বিম্ব বলে।

(i) **সদ্-বিম্ব :**

যখন কোন বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অপর একটি বিন্দুতে ঠিক ঠিক মিলিত হয় তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর সদ্-বিম্ব (real image) বলে। অবতল দর্পণে [৫৮ ও ৫৯ নং চিত্র দেখ] ও উত্তল লেন্সে [৬৩ নং চিত্র দেখ] সদ্ প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

(ii) **অসদ্-বিম্ব :**

যখন আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর অপর কোন দ্বিতীয় বিন্দু হইতে বহির্গত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদ্-বিম্ব (Virtual image) বলে। সমতল দর্পণে [চিত্র ৫৭ নং দেখ]। উত্তল দর্পণে [৬২ নং চিত্র দেখ] ও অবতল লেন্সে [৬৭ নং চিত্র দেখ] সর্বদাই অসদ্-বিম্ব উৎপন্ন হয়।

সদ্ ও অসদ্-বিম্বের পার্থক্য :—সদ্-বিম্ব আলোক রশ্মিগুচ্ছের প্রকৃত মিলনে উৎপন্ন হয়। পর্দায় এই প্রতিবিম্ব ফেলা যায়। ইহা আসল বস্তুর ঠিক উল্টা আকৃতির (inverted image) হয়। সিনেমার পর্দায় যে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও তাহাই সদ্-বিম্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অসদ্-বিম্বের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। উহা একটি কাল্পনিক বিন্দু, যাহা হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। কাজেই অসদ্-বিম্ব চোখে দেখা যায় বটে কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না। আয়নায় আমাদের মুখের যে বিম্ব হয় তাহা অসদ্-বিম্ব।

এইবার আমরা পর পর (ক) সমতল দর্পণ (Plane mirror) (খ) গোলীয় দর্পণ (Spherical mirror) ও (গ) লেন্স (lens) কর্তৃক প্রতিবিম্বের গঠন লইয়া আলোচনা করিব।

(ক) **সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন** :—৫৭ নং চিত্রে M_1M_2 একটি দর্পণ। উহার সম্মুখে A একটি বিন্দু-প্রভব। A হইতে রশ্মিগুচ্ছ বহির্গত
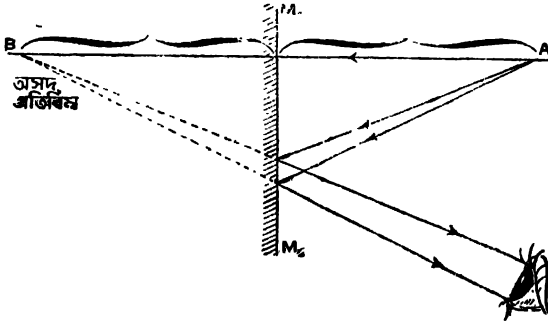
সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন
৫৭ নং চিত্র

হইয়া M_1M_2 দর্পণটিতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়িয়াছে। এখন, আমরা জানি আলোকরশ্মি যেদিক হইতে চোখে পড়ে, চোখ ঠিক সেই দিকেই বস্তুটিকে দেখিতে পায়। অতএব প্রতিফলিত রশ্মিগুলিকে পিছনের দিকে বর্ধিত করিলে B বিন্দুতে মিলিত হইবে। অর্থাৎ, চোখ দেখিবে যেন আলোকরশ্মি B বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে। সুতরাং ; B বিন্দুই A বিন্দুর প্রতিবিম্ব হইবে।

সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের তিন প্রকারের ধর্ম থাকে।

(i) দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব (Object distance) এবং দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বের দূরত্ব (Image distance) সমান হয়। অর্থাৎ $BM_1 = M_1A$.

(ii) প্রতিবিম্ব সর্বদা বস্তু হইতে দর্পণের উপর অঙ্কিত অভিলম্বের উপরে অবস্থান করিবে। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব B, সর্বদা অভিলম্ব AM_1 রেখার বর্ধিতাংশের উপর অবস্থিত হইবে।

(iii) এইরূপ প্রতিবিম্ব সর্বদাই অসদ্ হইবে। (অর্থাৎ B বিম্ব হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে।)

পরীক্ষা :—একটি কাগজের উপর AB সরলরেখা টান এবং উহার উপর একটি দর্পণ লম্বভাবে দাঁড় করাও। (৫৭ ক নং চিত্র দেখ) একটি টিনের পাতকে বাঁকাইয়া বেঞ্চ তৈয়ারী কর এবং টিনকাটা করাতের দ্বারা কাটিয়া ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ফাঁক কর। দর্পণের সম্মুখে একটি পিন P স্থাপন কর। এইবার P পিনের একপার্শ্বে বেঞ্চটিকে রাখিয়া ফাঁক দুইটির মধ্য দিয়া P পিনের প্রতিবিম্ব Q-কে লক্ষ্য কর। এই অবস্থায় ফাঁক দুইটির অবস্থান
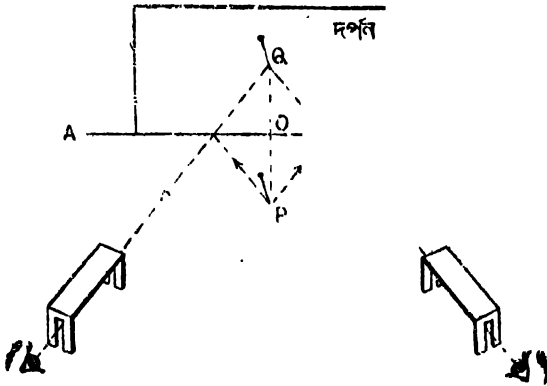
৫৭ (ক) নং চিত্র

একটি রেখাদ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখ। ঠিক অনুরূপভাবে P পিনের অপর পার্শ্বেও আর একটি রেখা টান। এই দুই রেখাকে বর্ধিত করিলে দেখিবে উহারা Q বিন্দুতে মিলিত হইবে। এবং Q বিন্দুর অবস্থানই P-এর প্রতিবিম্ব নির্দেশ করিবে। মাপিয়া দেখ P ও Q বিন্দু AB রেখা হইতে সমান দূরে অবস্থিত বা PO = OQ। অর্থাৎ বস্তু এবং প্রতিবিম্ব দর্পণ হইতে সমান দূরে অবস্থিত। আবার মাপিয়া দেখ P ও Q বিন্দুর সংযোজক রেখা AB-এর উপর লম্ব।

(খ) **অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন :—**

অবতল দর্পণে প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকার ও প্রকৃতি (সদ্ বা অসদ্)

নির্ভর করে দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্বের উপর। নিম্নে চিত্র সহকারে বস্তুর বিভিন্ন দূরত্বে প্রতিবিম্বের গঠন দেখান হইল।

(i) বস্তু যখন অসীম দূরত্বে থাকে :—

এই অবস্থায় আলোকরশ্মি বস্তু হইতে নির্গত হইয়া দর্পণে সমান্তরাল ভাবে পড়ে এবং প্রতিফলিত হইয়া প্রধান ফোকাসে কেন্দ্রীভূত হয়। সেখানে ইহা খুব ছোট, সদ্ ও উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করে। [চিত্র ৪৭ (ক) দ্রষ্টব্য]

(ii) বস্তু যখন লেন্সের বক্রতা-কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে থাকে :—

৫৮ নং চিত্রে PQ একটি বস্তু। উহা দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র C হইতে
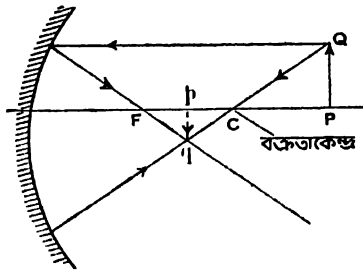
৫৮নং চিত্র

কিছু দূরে অবস্থিত। এই অবস্থায় PQ এর প্রতিবিম্ব হইবে p q। এই প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা ও বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে।

(iii) বস্তু যখন বক্রতা কেন্দ্রের উপর থাকে :—

এই অবস্থায় প্রতিবিম্ব বক্রতাকেন্দ্রের উপরই থাকিবে। প্রতিবিম্ব ও বস্তু
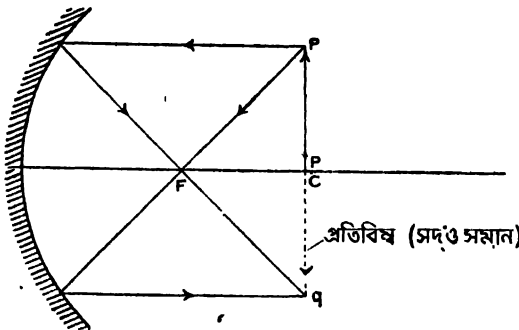
৫৯ নং চিত্র

আকারে সমান হইবে। কিন্তু উহা উল্টা এবং সদ্ হইবে। [চিত্র ৫৯নং দেখ।]

(iv) ব যখন বক্রতাকেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে থাকে :—
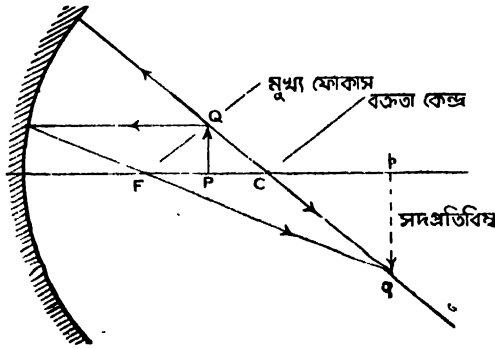
৬০ নং চিত্র

এই অবস্থায় প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা ও বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হয়। [৬০ নং চিত্র দেখ]

(v) বস্তু যখন প্রধান ফোকাসের উপর থাকে :—

এই অবস্থায় প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বস্তু হইতে অনেক বড় হয়। কিন্তু প্রতিবিম্ব গঠন হয় অসীমে। (৬১ নং চিত্র দেখ)
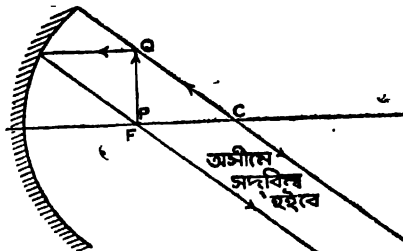
৬১ নং চিত্র

(vi) বস্তু যদি মেরু ও ফোকাসের মধ্যে থাকে :—

এই অবস্থায় প্রতিবিম্ব অসদ্, সোজা ও বস্তু হইতে বৃহত্তর হয়। ইহার অবস্থান হয় দর্পণের পশ্চাতে। (৬২ নং চিত্র দেখ)
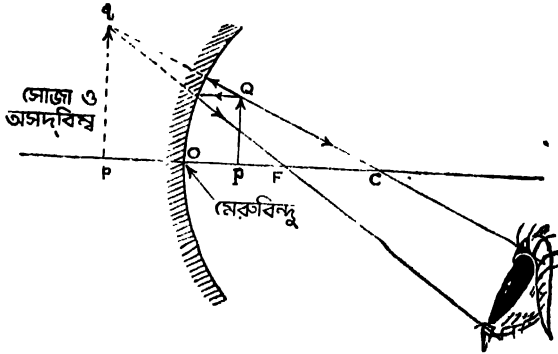
৬২ নং চিত্র

(গ) উত্তল ও অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন :—উত্তল লেন্সে (Convex lens) সদ্ এবং অসদ্ উভয় প্রকার প্রতিবিম্বই গঠন করে। বস্তুটি যদি লেন্সের ফোকাস্ দূরত্বের বাহিরে থাকে তবে সর্বদাই সদ্‌বিম্ব গঠিত হয়। আর যদি বস্তুটি আলোক কেন্দ্র ও ফোকাসের মধ্যে থাকে তবে অসদ্‌বিম্ব গঠিত হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে, বিভিন্ন অবস্থানে, উত্তল লেন্সে বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখান হইল।

(i) বস্তু অসীম দূরত্বে থাকিলে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা ও ছোট আকারে হয় এবং উহা ফোকাসে অবস্থান করে। (৫৬A নং চিত্র দেখ)
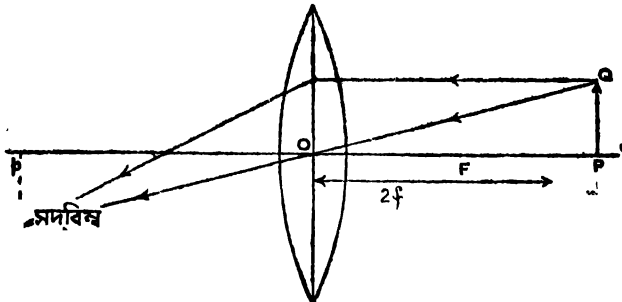
৬৩ নং চিত্র

(ii) PQ বস্তু যদি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণের চাইতেও (2f) বেশী দূরে থাকে তবে প্রতিবিম্ব সদ্ ও আকারে ছোট হইবে। (৬৩ নং চিত্র দেখ)

(iii) PQ বস্তু যদি 2f এবং ফোকাস দূরত্বের (f) এর মধ্যে থাকে তবে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা ও বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। [৬৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য]
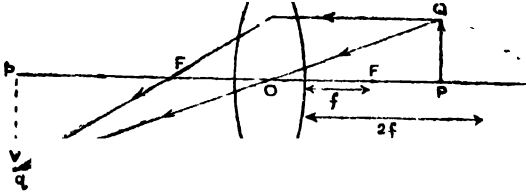
৬৪ নং চিত্র

(iv) বস্তু যদি ফোকাসে (f) অবস্থান করে তবে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা ও
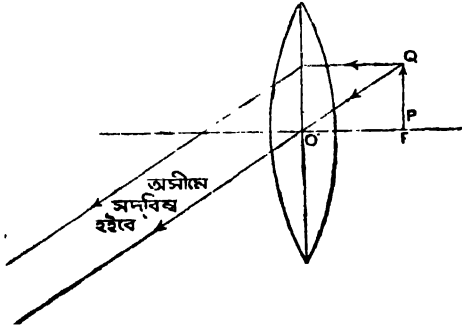
৬৫ নং চিত্র

খুব বড় হইবে এবং উহা অসীম দূরত্বে অবস্থান করিবে। (৬৫ নং চিত্র দেখ)

(v) PQ বস্তু যদি ফোকাস্ অপেক্ষাও নিকটবর্তী কোন বিন্দুতে থাকে তবে PQ প্রতিবিম্ব অসদ্, সোজা ও বড় হইবে। চশমা, বিবর্ধক কাচ (Magnifying glass), অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্র (Eye-piece) এই

অবস্থানে রাখা হয়। (৬৬ নং চিত্রে দেখ) বস্তু PQ, লেন্স AO এবং তাহার ফোকাস f-এর মধ্যে অবস্থিত।
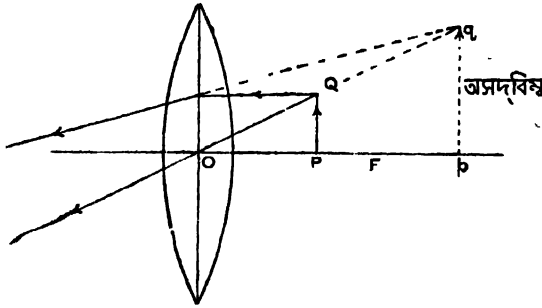
৬৬ নং চিত্র

অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন :—অবতল লেন্স কর্তৃক প্রতিবিম্ব সর্বদাই অসদ্ ও বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়। ৬৭নং চিত্রে অবতল লেন্সে প্রতিবিম্বের গঠন দেখান হইল।

PQ বস্তুর অবস্থান যে কোন স্থানেই হইক না কেন PQ প্রতিবিম্বের
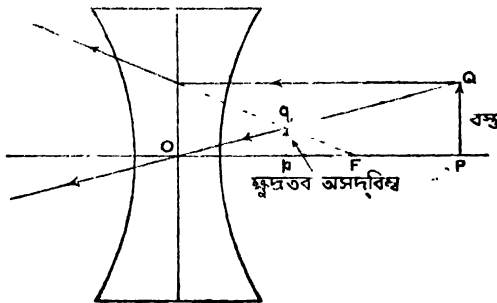
৬৭ নং চিত্র

আকৃতি ও প্রকৃতি সর্বদা একই রকম থাকিবে অর্থাৎ (৬৭ নং চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে) সেইরূপ হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. আলোকের সরল রেখায় গমনের কয়েকটি প্রমাণ দাও।

2. চিত্রের সাহায্যে একটি সূচীছিদ্র ক্যামেরার গঠন ও কার্য প্রণালী বর্ণনা কর।

3. কিরূপে ছায়ার উৎপত্তি হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

4. চিত্রসহ ছায়ার নিম্নের অবস্থাগুলির ব্যাখ্যা কর :—

(a) আলোকের উৎস অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর।

(b) আলোকের উৎস অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

5. প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কাহাকে বলে? উহাদের উৎপত্তি কিরূপে হয়? পাখি যখন নিচু দিয়া উড়ে তখন তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে কিন্তু উপরে উঠিলে আর ছায়া দেখা যায় না কেন?

6. গ্রহণের কারণ কি? চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

7. সূর্যের কয়প্রকার গ্রহণ হয়? চিত্রসহ সূর্যগ্রহণ ব্যাখ্যা কর। কখন সূর্যের বলয় গ্রহণ হয়? চন্দ্রের বলয় গ্রহণ হয় না কেন?

8. আলোকের প্রতিফলন কাহাকে বলে? প্রতিফলনের নিয়ম কি? কয়প্রকার প্রতিবিম্ব আছে? উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

9. ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও কি ভাবে সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কিরূপ?

10. উত্তল দর্পণ কাহাকে বলে? উহাদের ফোকাস-দূরত্বের সংজ্ঞা লিখ। উত্তল দর্পণ কিরূপে প্রতিবিম্ব গঠন করে?

11. অবতল দর্পণে কিরূপে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় তাহা ছবির সাহায্যে দেখাও।

12. নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা বল—

(i) অবতল দর্পণ, (ii) উত্তল দর্পণ (iii) প্রধান অক্ষ (iv) ফোকাস্ (v) ফোকাস্ দূরত্ব (vi) প্রতিফলিত রশ্মি (vii) অভিলম্ব (viii) আপতন কোণ (ix) প্রতিফলন কোণ।

13. আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিরূপে আলোকের প্রতিসরণ হয় তাহা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও :—

(ক) বায়ু হইতে কাচে (খ) জল হইতে বায়ুতে।

14. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(ক) একটি দণ্ডকে কাত করিয়া আংশিক জলে ডুবাইলে বাঁকা দেখায়।

(খ) একটি জলপূর্ণ পাত্রের তলায় রাখা টাকাকে একটু উঁচুতে মনে হয়।

(গ) প্রতি পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় না।

15. উত্তল লেন্স কাহাকে বলে? পরিষ্কার ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও, কিরূপে উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন করে? এই প্রতিবিম্ব সদ্ কি অসদ্?

16. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(a) চন্দ্রের বলয় গ্রহণ হয় না কেন?

(b) ঘসা কাচকে অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হয় কেন?

(c) টর্চের আলোকে রশ্মির পথ আমরা বুঝিতে পারি কেন?

17. আলোকের মাধ্যম বলিতে কি বুঝ? স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং ঈষদচ্ছ মাধ্যম কাহাকে বলে, উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

18. আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

19. পিন প্রণালীতে প্রতিফলনের নিয়ম কিভাবে পরীক্ষা করিবে বর্ণনা কর।

Objective test

(A) **Recall type test :**

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) আমাদের মনে হয় আলোক দেখি কিন্তু বাস্তবিক আলোক——।

(খ) ছায়ার যে অংশে উৎসের সকল অংশ হইতে আলোক পৌঁছায় না তাহার নাম——।

(গ) আলোক রশ্মি যখন এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন তাহার——ঘটে।

(ঘ) তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় আলোকও একপ্রকার——।

(B) 'Yes' or 'No' type test :—হ্যাঁ বা না বলিয়া উত্তর কর :—

(ক) আলোক বক্ররেখায় গমন করিতে পারে কি?

(খ) ছায়ার উৎপত্তির জন্যই গ্রহণ হয় কি?

(গ) শব্দের গতি কি আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী?

(C) True or False type test :—

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির যে-গুলি ঠিক তাহাদের ডান দিকে T এবং যে-গুলি ঠিক নয় তাহাদের ডানদিকে F লিখ।

(ক) আলো যে সরল রেখায় চলে ছায়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(খ) চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে পৃথিবী।

(গ) সাধারণ দর্পণে আপতিত রশ্মির সম্পূর্ণটাই প্রতিফলিত হয়।

(ঘ) উত্তল লেন্স সদ্ ও অসদ্ উভয় প্রকার প্রতিবিম্ব গঠন করে।

(ঙ) মাঝে মাঝে চন্দ্রেরও বলয় গ্রহণ হয়।

(D) Multiple Choice type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পার্শ্বে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিও নিচে দাগ দাও।

(ক) চন্দ্রগ্রহণের সময় কোন্ বস্তুকে বাধা দিয়া আলোকরশ্মি ছায়ার সৃষ্টি করে? চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী।

(খ) জলে লাঠি ডুবাইলে উহার নিমজ্জিত অংশ হইতে আলোকশ্মি কিভাবে আসে?—প্রতিফলিত, প্রতিসৃত, বিচ্ছুরিত।

(গ) যদি আলোকের উৎস এবং অস্বচ্ছ বস্তু আকারে সমান হয় তবে প্রচ্ছায়ার আকার কিরূপ হইবে। বস্তুর সমান, বড়, ছোট।

(ঘ) বলয় গ্রহণ কাহার হয়?—চন্দ্রের, সূর্যের, পৃথিবীর।

(ঙ) নিয়মিত প্রতিফলনের জন্য কি রকম প্রতিফলকের দরকার?—মসৃণ, অমসৃণ।

(চ) অবতল দর্পণে কি প্রকারের প্রতিবিম্ব হয়?—সদ্‌বিম্ব, অসদ্‌বিম্ব।

(E) Association type test :—

:: চিহ্নের পূর্বে দুইটি শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক, :: চিহ্নের পরের শব্দ দুইটির মধ্যেও অনেকটা সেই সম্পর্ক থাকিবে শেষের শূন্যস্থানের পদটি বাহির কর :—

(ক) অবতল দর্পণ : উত্তল দর্পণ : : সদ্ ফোকাস্ : ——।

(খ) পূর্ণিমা : চন্দ্রগ্রহণ : : অমাবস্যা : ——।

(গ) প্রতিফলন : দর্পণ : : প্রতিসরণ : ——।

(ঘ) কাচ : স্বচ্ছ : : কাঠ : ——।

(ঙ) অসদ্‌বিম্ব : পর্দা : : বলয় গ্রহণ : ——।

তাপের প্রকৃতি :—রৌদ্রে বা আগুনের কাছে দাঁড়াইলে অথবা কোন গরম জিনিষে হাত দিলে, আমাদের দেহে একপ্রকার অনুভূতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, আমরা গরম বোধ। আবার শীতকালে, যখন আমরা খালি গায় থাকি, অথবা যখন বরফে হাত দেই তখন এক বিপরীত অনুভূতি আসে। আমরা ঠাণ্ডাবোধ করি। ঠাণ্ডা বা গরমের কোন স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নাই। তাই ইহাকে আমরা সোজাসুজি অনুভব করিতে পারি না; অনুভব করি, কোন ঠাণ্ডা বা গরম বস্তুর মাধ্যমে, উহাকে স্পর্শ করিয়া বা উহার নিকটে উপস্থিত হইয়া। সুতরাং, তাপকে **আমরা এমন একটি জিনিষ বলিব যাহা গ্রহণ করিলে বস্তু গরম হয় এবং যাহা বর্জন করিলে বস্তু ঠাণ্ডা হয়।** তবে সর্বদা মনে রাখিবে যে তাপ এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির সাহায্যে রেল চলে, জাহাজ চলে এবং আরো বহু কাজ হয়।

এখন, এই তাপ কোথা হইতে আসে, তাপের উৎস কি তাহাই আমরা আলোচনা করিব। প্রধানতঃ তাপের উৎস হইল সূর্য। সূর্যকে প্রতিদিন আমরা আকাশে দেখি, শীত-গ্রীষ্মে তাহার উত্তাপ শরীরে অনুভব করি। আবার কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পুড়াইয়াও আমরা তাপ পাই। কিন্তু সে তাপও পরোক্ষভাবে সূর্য হইতেই গৃহীত হয়। সুতরাং সূর্যকেই আমরা সকল তাপ-শক্তির উৎস স্বরূপ বলিতে পারি। নিম্নে তাপের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল।

সূর্য :—সূর্য সকল তাপশক্তির মূল উৎস একথা বলিয়াছি। বস্তুত, সূর্য যুগ যুগ ধরিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং উহা হইতে যে তাপশক্তি বাহির হইতেছে তাহাই সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ গ্রহণ করিতেছে। আমাদের পৃথিবীও সৌরজগতের অতি সামান্য একটু স্থান দখল করিয়া আছে। তাই সে সূর্যালোকের অতি সামান্য অংশ প্রাপ্ত হয়। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে সূর্য দেহে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহার দুইশত কোটি

ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবী পায়। তাহা ছাড়া, আমরা সূর্য হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছি। কিন্তু এত দূরে থাকিয়া এবং অতি সামান্য তাপ পাইয়াও আমরা সময় সময় উহা সহ্য করিতে পারি না। অতএব একবার ভাবিয়া দেখ সূর্যের তাপ কি প্রচণ্ড, উহা কি বৃহৎ তাপ-শক্তির উৎস! বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে সমগ্র পৃথিবীতে সূর্য হইতে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তাপ আসিয়া পৌছায়, তাহা যদি এক জায়গায় জমা করা যায় তবে সেই তাপে দশ লক্ষ মণ জল ফুটাইতে মাত্র এক মিনিট সময় লাগিবে। সূর্য হইতে পৃথিবীতে তাপ আসে বলিয়াই জীবজন্তু, মানুষ, গাছপালা প্রভৃতি সবকিছু বাঁচিয়া আছে। যদি পৃথিবী সূর্যকিরণ না পাইত কোন প্রাণীই পৃথিবীর বুকে বাঁচিত না।

সূর্য হইতে আমরা যে তাপশক্তি পাই তাহা সরাসরি এবং ব্যাপকভাবে এখনও কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই। তবে তোমরা হয়তো সৌরচুল্লীর (solar cooker) কথা শুনিয়া থাকিবে। উহা এক প্রকার উনান, যাহা সৌরশক্তির সাহায্যে জ্বলে। আবার অনেক ছোট ছোট যন্ত্রপাতি চালান, বেতার-যন্ত্র চালান, কিংবা ঘরবাড়ী প্রভৃতি গরম রাখা, এইসব কাজের জন্যও বিজ্ঞানীরা সৌরশক্তি কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন্।

রাসায়নিক শক্তি ঃ—রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে রাসায়নিক তাপশক্তি বলে। কাঠ, কয়লা, তৈল, পেট্রল প্রভৃতি জ্বালাইয়া অল্প পরিশ্রমেই আমরা প্রচুর তাপ পাই। অক্সিজেনের সংস্পর্শে কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয় তাহা হইতেই প্রচুর তাপশক্তি নির্গত হয়। বর্তমানে সভ্য জগতের নানা কাজে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাহার বেশীর ভাগ তাপশক্তিই এই রসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

আমরা যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তাহাও শরীরের ভিতরে এক প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ সৃষ্টি করে। সেই তাপই আমাদের দেহকে উষ্ণ রাখে এবং কাজ করিবার শক্তি দেয়।

একটি কথা মনে রাখিবে যে কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি সূর্য হইতেই প্রথমে তাহাদের তাপশক্তি লাভ করিয়াছিল।

যান্ত্রিক শক্তি :—যান্ত্রিক বা দৈহিক শক্তি ব্যয় করিয়াও তাপশক্তির সৃষ্টি করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, নূতন জুতার ঘর্ষণে ঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয় এবং পায়ে ফোস্কা পড়ে। এ অভিজ্ঞতা তো তোমাদের অনেকেরই আছে। দেশলাই'র কাঠি, সিগারেটের লাইটার ঘর্ষণে জলিয়া উঠে, এ সবও নিশ্চয় তোমরা দেখিয়াছ। আদিকালে মানুষ পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালাইত। ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি শান দেওয়ার সময়ে ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া থাকে। ফুটবলের ব্লাডার পাম্প করিবার সময় পাম্পের মুখ গরম হইয়া যায়। এইসব হইতে বেশ. বুঝা যায় যে ঘর্ষণাদি ক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। তবে এই প্রকার তাপের পরিমাণ কম। তাই ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগও কম।

বৈদ্যুতিক শক্তি :—একটি জলন্ত বৈদ্যুতিক বাতিতে হাত দাও দেখিতে পাইবে উহা বেশ গরম। এখানে তড়িৎ-শক্তির ফলে. তাপের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার একটা সরু তারের মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার যে তারটি গরম হইয়া উঠিবে অর্থাৎ তড়িৎশক্তি হইতে আমরা সহজেই তাপশক্তি পাইতে পারি। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া আজ আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য নানাপ্রকার জিনিষ তৈরী হইতেছে। যেমন—তড়িৎ-ইস্ত্রি, তড়িৎ-চুল্লী, বৈদ্যুতিক-হিটার ইত্যাদি। বস্তুত, তড়িৎ হইতেই সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে তাপ পাওয়া যায়। তবে এই প্রকারে পাওয়া তাপশক্তির খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তাপ শক্তির বিভিন্ন উৎস দেখান হইল :—
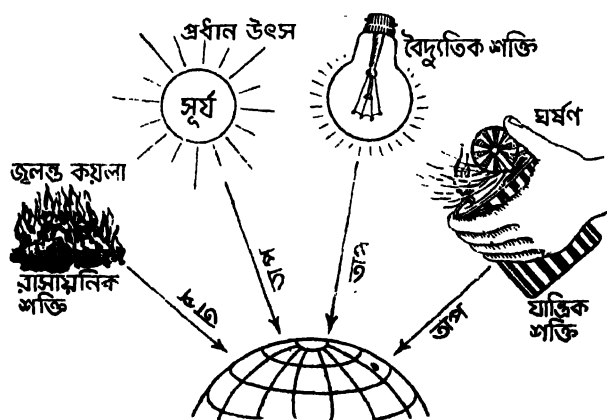
৬৮ নং চিত্র

তাপের বিভিন্ন উৎস

তাপের ফল (Effects of heat)—তাপের ফল নানাভাবে প্রকাশ পায়। যথা—

(i) কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) তাপের প্রয়োগে অনেক কঠিন পদার্থ তরলে এবং তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। আবার বিপরীত ভাবে, বাষ্পের তাপ কমাইলে প্রথমে উহা তরল এবং পরে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। উদাহরণ, বরফ+তাপ=জল, জল+তাপ=বাষ্প। আবার, বাষ্প–তাপ=জল, জল–তাপ=বরফ। অর্থাৎ, তাপের তারতম্যে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

(iii) সাধারণতঃ কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই নীতি কঠিন, তরল ও বাষ্প সব জাতীয় পদার্থের বেলায়ই সত্য। বিষয়টি লইয়া আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

(ক) **কঠিন পদার্থের প্রসারণ** (Expansion of solids) :

তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ হয়। একথা উপরে বলিয়াছি, তবে ঐ তিন জাতীয় পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় সর্বাপেক্ষা কম।

খালি চোখে বা না মাপিয়া সে প্রসারণ অনেক সময় ধরা যায় না। তবে পরীক্ষা দ্বারা সে প্রসারণ সহজেই ধরা যায়। নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি লক্ষ্য কর।

৬৯ নং চিত্র—(ক) (খ)
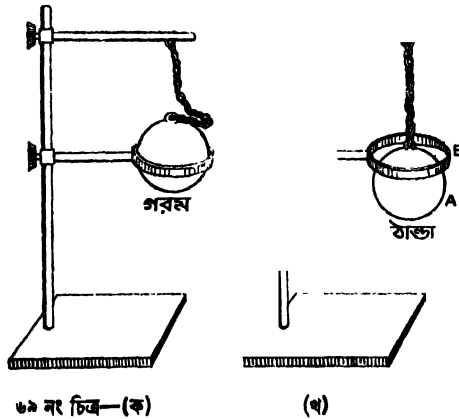
বল ও আংটার পরীক্ষা :—৬৯ নং খ চিত্রে A একটি পিতলের গোলাকার বল এবং B একটি গোল আংটা। ঠাণ্ডা অবস্থায় A বলটি B আংটার ভিতর দিয়া কোন প্রকারে গলিয়া যাইতে পারে (চিত্র ৬৯ খ)। এখন বলটিতে

তাপ প্রয়োগ করিয়া উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে, উহা আর আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতেছে না (চিত্র নং ৬৯ ক)। আবার, বলটিকে ঠাণ্ডা অবস্থায় আনিলে সে পূর্বের মত আংটার ভিতর দিয়া ঠিক গলিয়া যাইবে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থের বলটি আয়তনে বর্ধিত হইয়াছে।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন :—

তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ আয়তনে বাড়ে, ইহা আমরা দেখিলাম কিন্তু তাই বলিয়া সব কঠিন পদার্থই তাপ প্রয়োগে সম পরিমাণে বাড়ে না। এক এক জাতীয় পদার্থের বৃদ্ধি এক এক পরিমাণের হয়। নিম্নের পরীক্ষা লক্ষ্য কর।

পরীক্ষা : একটি লোহ ও একটি তামার পাত পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে জোড়া দেওয়া (রিভেট=rivet) হইল। ৭০ নং চিত্র দেখ, সাধারণ অবস্থায় উহারা সোজা থাকিবে। কিন্তু উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে মিশ্র পাতটি লোহার দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে। এই ধনুকের উত্তল দিকে তামা আর অবতল দিকে লোহার পাতটি থাকিবে। যদি তাপ প্রয়োগে তামা ও লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ এক হইত তবে বক্রতার সৃষ্টি হইত না, সাধারণ অবস্থায় মিশ্র ধাতুটি যেমন ছিল, তেমনি সোজা থাকিত।
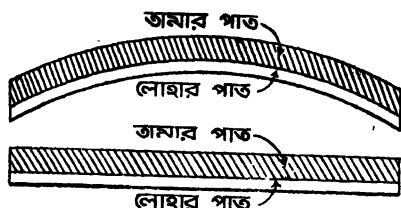
৭০ নং চিত্র

তরল পদার্থের প্রসারণ (Expansion of liquids) :

তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থও কঠিন পদার্থের ন্যায় প্রসারিত হয়। তবে তরল পদার্থের কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ নাই বলিয়া উহা কেবল আয়তনে বৃদ্ধি পায়। উহার আয়তন প্রসারণের মাত্রা কঠিন পদার্থের চেয়ে বেশী, কিন্তু বাষ্পজাতীয় পদার্থের অপেক্ষা কম হয়।

পরীক্ষা : একটি কাচকুপী (flask) রঙিন জল দিয়া পূর্ণ কর। তার মুখে ছিপির (cork) সাহায্যে একটা সরু নল এমন ভাবে আঁটিয়া দাও, যেন নলের মধ্যে O দাগ পর্যন্ত জল উঠে। (৭১ নং চিত্র)

এখন কাচকুপীটিকে একটি বড় পাত্রে গরম জলে খাড়াভাবে বসাইয়া রাখিলে দেখিতে পাইবে যে প্রথমে নলের জল O দাগের নিচে P-তে নামিয়া

আসিবে। ইহার কারণ জল গরম হইবার পূর্বেই কাঁচকুপীটি গরম হইয়া আয়তনে বাড়িয়া গিয়াছে। সেই বাড়তি স্থান পূর্ণ করিবার জন্য জলতল নামিয়া P দাগে আসে। আবার একই উষ্ণতায় কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ আয়তনে অধিক প্রসারিত হয়। সেইজন্য কিছুক্ষণ পরে যখন কঠিন পদার্থ কাচ ও তরল পদার্থ জল একই উষ্ণতায় আসিবে তখন জলতল O দাগ ছাড়াইয়া Q দাগ পর্যন্ত উঠিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে জল যখন তাপ পাইতেছিল তখন জলতল ছিল P দাগেতে, O দাগে নয়। অতএব জলের প্রসারণ P দাগ হইতে O দাগ পর্যন্ত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে উত্তপ্ত হইলে জল প্রসারিত হয় এবং সে প্রসারণের মাত্রা কাচের চেয়ে বেশী। অন্যান্য তরল পদার্থ লইয়াও এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে সে ক্ষেত্রে অবশ্য প্রসারণের মাত্রা বিভিন্ন হইবে।
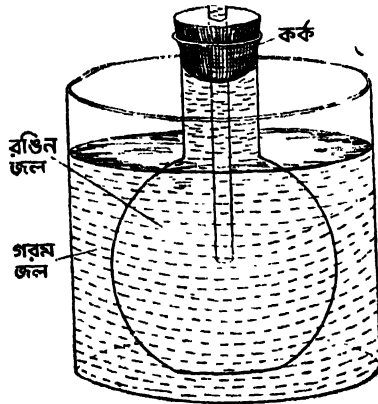
তরলের প্রসারণের পরীক্ষা
৭১ নং চিত্র

গ্যাসের প্রসারণ (Expansion of gases): তাপ প্রয়োগে কঠিন এবং তরলের ন্যায় গ্যাসেরও প্রসারণ ঘটে। গ্যাসের কোন নিজস্ব আকার না থাকায় উহা কেবল আয়তনে বাড়ে। এবং সে বৃদ্ধি কঠিন বা তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। একটি ছিপিযুক্ত খালি বোতল কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে উত্তাপে ভিতরের বায়ু এত প্রসারিত হয় যে ছিপিটি সশব্দে ছিটকাইয়া পড়ে, ইহা তোমরাও অনেকেই দেখিয়াছ। গ্যাসের প্রসারণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সমান তাপ প্রয়োগে সব গ্যাসেরই সমান প্রসারণ হয়। কিন্তু কঠিন বা তরলের বেলায় তাহা হয়

না। নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষা দ্বারা গ্যাসের প্রসারণের ঐ বিশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা : (A) একটি খালি ফ্লাস্কের মুখ একটি ছিদ্রযুক্ত চিপির দ্বারা বন্ধ কর। ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি সরু কাচের নল ছিপির মধ্যে এমনভাবে কিছুটা ঢুকাও যেন উহা বায়ু নিরুদ্ধ (air tight) হয়। এইবার কাচনলের বাহিরের মুখটি একটি জলপাত্রের মধ্যে রাখ। [৭২ নং চিত্র দেখ] এখন ফ্লাস্কের
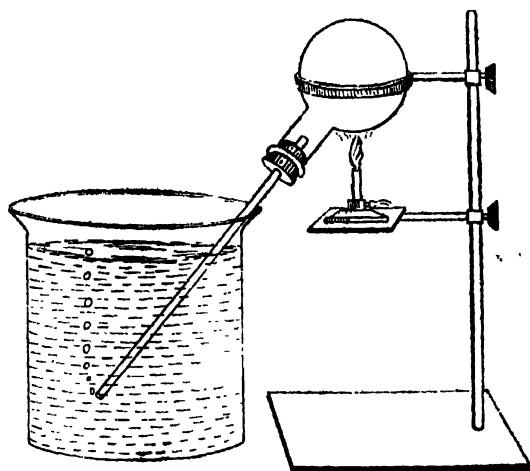
গ্যাসের প্রসারণ দেখাইবার ব্যবস্থা

৭২ নং চিত্র

নিচে উত্তাপ দিলে দেখিতে পাইবে যে ফ্লাস্কের-ভিতরের বায়ু আয়তন বৃদ্ধির জন্য জলের মধ্য দিয়া বুদ্‌বুদ্ আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে তাপ প্রয়োগে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(B) একটি পাতলা কাচের ফ্লাস্ক লইয়া উহাতে কিছু পরিমাণ জল নাও। ইহার মুখটি একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দ্বারা বন্ধ কর। এইবার ছিপির ছিদ্রপথে একটি সরু কাচনল প্রবেশ করাও। ছিদ্রপথ ও ফ্লাস্কের মুখ এমন ভাবে বন্ধ কর যেন সমস্তটাই বায়ু (air tight) হয়। লক্ষ্য রাখিবে যেন কাচনলটি রঙিন জল পর্যন্ত পৌঁছায়। এইবার দুই হাত দিয়া ফ্লাস্কটির উপরাংশ কিছুক্ষণ আবৃত করিয়া রাখিলে দেখিবে যে কাচনল বাহিয়া রঙিন জল উর্ধে উঠিয়াছে। [৭৩ নং চিত্র দেখ) ইহার কারণ কি ?

কারণ, হাতের উত্তাপে ফ্লাস্কের উপরাংশের বায়ু উত্তপ্ত হওয়ায় আয়তনে

বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, রঙিন জলের উপর অধিক চাপ পড়িয়াছে এবং সে কাচনল বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে সামান্য তাপ পাইলেও গ্যাস বেশ উত্তপ্ত হয়।

বিভিন্ন গ্যাস যে সমান তাপ পাইলে সমান আয়তনে প্রসারিত হয় তাহাও খুব সহজেই নিম্নোক্ত পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়।

উপরে বর্ণিত ফ্লাস্কের ন্যায় দুইটি ফ্লাস্কে রঙিন জল ভর্তি কর। এইবার ফ্লাস্ক দুইটির মধ্যে দুইটি ভিন্ন গ্যাস লও। ধর একটিতে বায়ু, অপরটিতে হাইড্রোজেন। এখন, পূর্বের ন্যায় কাচনলযুক্ত ছিপির সাহায্যে ফ্লাস্কের মুখ দুইটি বন্ধ কর। ৭৪ নং চিত্র দেখ। এইবার হাতের সাহায্যে উত্তাপ না
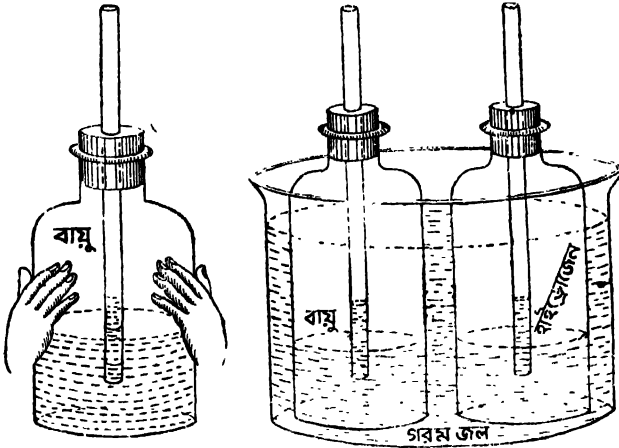
সামান্য তাপেও গ্যাসের প্রসারণ হয়
৭৩ নং চিত্র

সমপরিমাণ গ্যাস সমান তাপে সমান আয়তনের প্রসারণ হয়
৭৪ নং চিত্র

দিয়া ফ্লাস্ক দুইটিকে একটি গরম জলপূর্ণ বড় গামলায় রাখ। ইহাতে ফ্লাস্ক দুইটির গ্যাস একই উষ্ণতায় থাকিবে, ফলে উহারা সমান তাপ পাইবে। তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখ যে পূর্বের ন্যায় রঙিন জল কাচনল বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং উভয় নলের জলতলের উচ্চতা সমান। উভয় পাত্রের জলের উপরের গ্যাস তাপে প্রসারিত হইয়া সমান চাপ দিয়াছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সামান তাপে বিভিন্ন গ্যাস সমান আয়তনে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য গ্যাসের আয়তন, তাহার উপরের চাপ এবং

তাপ প্রথম অবস্থায় এক হওয়া দরকার। এখানে ফ্লাস্কের আয়তন, তাহার ভিতরের চাপ (বায়ুর চাপের সমান) ও তাপ (ঘরের তাপ) এক ছিল।

পদার্থের প্রসারণের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ :—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং নানারকম কলকারখানায় পদার্থের প্রসারণ-ধর্মকে নানা ভাবে কাজে লাগানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসারণের জন্য আমাদের কাজের সুবিধা হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। নিম্নে কঠিন, তরল ও গ্যাসের প্রসারণের কথা আলোচনা করা হইল।

সুবিধার কথা :

(১) গরুর গাড়ীর চাকার বেড়ে লাগাইবার সময় লোহার সংকোচন-প্রসারণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। লোহার বেড়ের ব্যাস চাকার ব্যাস অপেক্ষা কিছু ছোট থাকে। বেড়টিকে উত্তপ্ত করিলে উহা প্রসারিত হইয়া কিছুটা বড় হয় এবং তখন উহাকে সহজেই কাঠের চাকায় পরাইয়া দেওয়া হয়। পরে জল ঢালিয়া লোহার বেড়টিকে ঠাণ্ডা করা হয় এবং উহা সংকুচিত হইয়া কাঠের চাকায় দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া বসে।

(২) লৌহদণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের প্রয়োগ করিয়া যে সমস্ত বাড়ির দেওয়াল বাহিরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে সোজা করা হয়। দেওয়ালের মধ্য দিয়া একটি অথবা একাধিক লৌহদণ্ড ঢুকাইয়া পাত ও স্ক্রুর সাহায্যে শক্ত করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। [১৫ নং চিত্র দেখ] তারপর
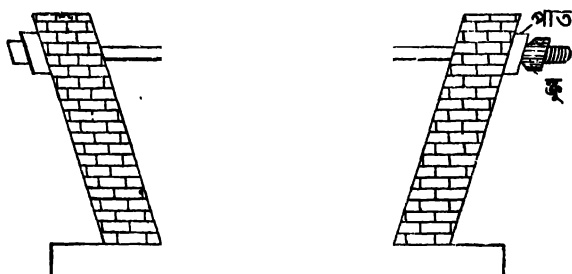
১৫ নং চিত্র

দণ্ডগুলিকে উষ্ণ করিয়া স্ক্রুগুলিকে আরও জোরে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইবার দণ্ডগুলিকে জলধারা ঠাণ্ডা করিলে লৌহদণ্ডগুলি সংকুচিত হইয়া ছোট হইবে এবং বাঁকা দেওয়ালকে টানিয়া সোজা করিয়া আনিবে।

(3) কঠিন, তরল ও গ্যাসের প্রসারণ ও সংকোচনের ধর্মকে কাজে লাগাইয়া নানাপ্রকার উষ্ণতা-মাপক যন্ত্রও (Thermometer) তৈয়ারী করা হইয়াছে। কঠিন পদার্থের প্রসারণ খুব কম বলিয়া উহা থার্মোমিটারের কাজে কম প্রয়োগ করা হয়। আবার গ্যাসের প্রসারণ খুব বেশী বলিয়া উহাও থার্মোমিটারে কম প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য আজকাল নানা ধরণের গ্যাস-থার্মোমিটারও প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তরলের প্রসারণ মাঝামাঝি রকমের বলিয়া উহাই থার্মোমিটারের বেশী কাজে লাগে। পারদ, অ্যাল্‌কোহল প্রভৃতি থার্মোমিটারের কথা তোমরা পরে বিস্তারিত জানিবে।

(4) শিশিতে কাচের ছিপি যদি খুব জোরে আটিয়া যায় তবে শিশিকে সামান্য গরম করিলেই ছিপি খুলিয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে তাপে শিশির মুখ বড় হয় কিন্তু কাচ তাপের কু-পরিবাহী, তাই ছিপি তাড়াতাড়ি গরম হয় না এবং ছিপির প্রসারণও হয় না। সে যেমন ছিল তেমনি থাকে এবং শিশির মুখ হইতে সহজে বাহির হইয়া আসে।

(5) দুইটি পাতকে দৃঢ়ভাবে আটকাইতে হইলে রিভেটের সাহায্যে করা ভাল। উত্তপ্ত অবস্থায় রিভেট করা হয়। তারপর যখন পাত ঠাণ্ডা হয় তখন রিভেটের লোহাটি সংকুচিত হইয়া পাত দুইটিকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া ধরে। যাহা হউক, উপরের উদাহরণগুলি কেবল সংকোচন-প্রসারণের সুবিধার উদাহরণ। কিন্তু উহার নানা রকমের অসুবিধাও আছে। নিম্নে কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল।

অসুবিধার কথা :—(1) কোন রেল লাইন লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে দুইটি
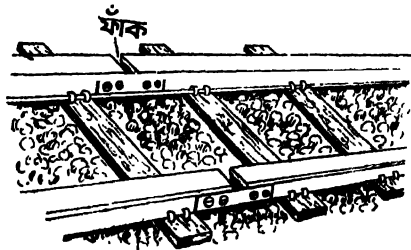
রেল লাইনের জোড়ের মুখে ফাঁক থাকে
৭৬ নং চিত্র

লাইনের [৭৬ নং চিত্র দেখ] জোড়ার মুখে কিছুটা ফাঁক থাকে। চাকার ঘর্ষণের তাপে ও সূর্যের তাপে লাইনের রেলগুলির দৈর্ঘ্য কিছুটা বাড়িয়া

যায়। যদি জোড়ার মুখে ফাঁক না থাকিত তবে রেলগুলি প্রসারিত হইবার জায়গা পাইত না। ফলে রেল বাঁকিয়া যাইত।

(2) লোহার সেতু তৈয়ারী করিবার সময় লোহার বিমগুলিকে ইটের গাঁথুনীর সংগে দৃঢ়ভাগে আটকাইয়া দেওয়া হয় না। সেতুর এক প্রান্ত একটি
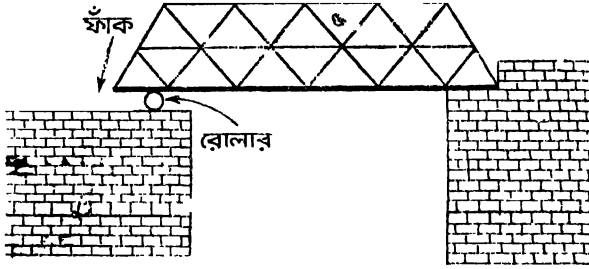
চিত্র নং ৭৭

চাকার (roller) উপর রাখা হয়। ইহাতে লোহার প্রসারণের কোন অসুবিধা হয় না। [৭৭ নং চিত্র দেখ]

(3) কোন ধাতু-নির্মিত স্কেলের দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। ঋতু পরিবর্তনের, অর্থাৎ তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈর্ঘ্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

(4) মোটা কাচের গ্লাসে গরম জল ঢালিলে অনেক সময় উহা ফাটিয়া যায়। কাচ ভাল তাপ পরিবাহী নহে। ফলে, মোটা গ্লাসের ভিতর দিকটি উত্তাপে প্রসারিত হইলেও বাহিরের দিকটির প্রসারণ কম হয়। প্রসারণের এই তারতম্যের ফলেই গ্লাস ফাটিয়া যায়।

(5) দুধের মধ্যে কিছু বায়ু সর্বদাই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তাই দুধ ফোটাইবার সময় উহার ভিতরে বায়ুর প্রসারণ ঘটে এবং দুধ উপ্‌ছাইয়া পড়ে। এই একই কারণে লুচি ভাজিবার সময় উহা ফুলিয়া উঠে। অবশ্য এগুলি সবই যে আমাদের অসুবিধার বিষয় তাহা নহে।

অবস্থার পরিবর্তন

(Change of State)

আমরা জানি পদার্থ তিন প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে; যথা, কঠিন, তরল ও বায়বীয়। উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা যখন কোন পদার্থ কঠিন হইতে তরল কিংবা তরল হইতে বায়বীয় অবস্থায় যায় অর্থাৎ এক অবস্থা

হইতে অন্য অবস্থাতে পরিবর্তিত হয় তখন তাহাকে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন বলে। কঠিন বরফ উত্তাপ পাইলে জলে পরিণত হয়। আবার, জলকে উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। বিপরীত ক্রমে বাষ্পকে শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ তাপ হ্রাস দ্বারা জলে পরিণত করা যায়। আরও শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ আরও তাপ হ্রাস দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সব পদার্থকেই উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা জলের মত তিন অবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ কঠিন অবস্থায় কর্পূর বা আয়োডিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহারা তাপ পাইলে কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়; কোন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আবার, এমন অনেক পদার্থ আছে যাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। তাহাদের কিন্তু উত্তাপের দরুণ কোন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। যেমন কাঠ, কয়লা ইত্যাদিতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহারা তরল হয় না। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

গলন (Fusion or Melting) :—কোন কঠিন পদার্থকে অনেকক্ষণ গরম করিলে দেখা যাইবে উহার উষ্ণতা বাড়িতেছে। এইরূপে উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পৌছাইলে ঐ পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে এবং যে-পর্যন্ত গলা শেষ না হয় ততক্ষণ তাহার উষ্ণতা আর বৃদ্ধি পায় না। গলন শেষ হইলে, আবার ঐ পদার্থের উষ্ণতা বাড়িতে থাকে।

উদাহরণ : এক টুকরা বরফকে—10°C তাপমাত্রায় রাখা আছে। ঐ বরফের টুকরাতে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তবে দেখা যাইবে যে ধীরে ধীরে উহার তাপমাত্রা বাড়িতেছে। ক্রমে যখন—10°C হইতে তাপ 0°C উঠিবে তখন বরফের আর কোন উষ্ণতার পরিবর্তন হইবে না। তারপর আরও তাপ দিলে ধীরে ধীরে বরফ গলিতে আরম্ভ করিবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বরফ গলা শেষ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত, তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হইবে না অর্থাৎ তাপমাত্রা 0°C-তে স্থির থাকিবে। বরফ-গলা শেষ হইলে অবশ্য ঐ জলের তাপমাত্রা আবার আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকিবে:

উপরের ঘটনা হইতে বলা যায় যে, **কোন কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছিলে সে পদার্থটি গলিতে শুরু করিবে এবং ঐ অবস্থায় তাপপ্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন**

হইবে না। কঠিন পদার্থের তরলে পরিণত হওয়ার ঐরূপ ব্যাপারকে **গলন** (Melting) বলে। বায়ুর সাধারণ চাপে যে উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হইতে থাকে তাহাকেই তাহার **গলনাঙ্ক** (Melting point) বলে। বিভিন্ন বস্তুর গলনাঙ্ক বিভিন্ন হয়। সীসার গলনাঙ্ক 317°C বলিলে বুঝায় যে, সাধারণ চাপে খানিকটা সীসাতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে যখন 317°C-এ পৌছিবে তখন উহা গলিতে আরম্ভ করিবে এবং সমস্ত সীসা, না গলা পর্যন্ত উষ্ণতা 317°C-তে স্থির থাকিবে। নিচের তালিকায় কয়েকটি বস্তুর গলনাঙ্ক দেওয়া হইল।

পদার্থ	গলনাঙ্ক	পদার্থ	গলনাঙ্ক
তামা	1083°C	ঢালাই লোহা	1200°C
পিতল	1000°C	ন্যাপথেলীন	80°C
সোনা	1063°C	বরফ	0°C
রূপা	960°C	মোম	52°—58°C

তরল পদার্থেরও তাপ কমাইতে থাকিলে কোন এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সে কঠিন হইতে আরম্ভ করিবে। ঐ অবস্থাকে তরল বস্তুর কঠিনীভবন (Solidification) বলে। বায়ুর সাধারণ চাপে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ জমিয়া কঠিনে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে পদার্থের **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বলে। যেমন, যখন জল ঠাণ্ডা হইতে হইতে 0°C পৌছায় তখন উহা জমিতে শুরু করে। সুতরাং জলের হিমাঙ্ক 0°C। আবার তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে জলের গলনাঙ্কও 0°C। মনে রাখিবে সাধারণতঃ একই পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক এক হয়।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

পরীক্ষা : প্রায় 4" ইঞ্চি লম্বা একটি কৈশিক নল (Capillary tube) লও। যে নলের রন্ধ্র খুব সূক্ষ্ম তাহাকে কৈশিক নল বলে। যে পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ণয় করিতে হইবে তাহার খানিকটা গুঁড়া নলের মধ্যে ঢুকাও। নলটিকে এইবার একটি থার্মোমিটারের সংগে বাঁধ [৭৮ নং চিত্র দেখ]। পরে উহাকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে এমনভাবে ডুবাও যেন কৈশিক নলের অপর খোলা মুখ জলের বাহিরে থাকে। একটি বার্ণারের সাহায্যে এইবার জলকে

আস্তে আস্তে নাড়িতে নাড়িতে গরম কর। এইভাবে উষ্ণতা বাড়াইতে থাকিলে এক সময় পদার্থটি গলিতে আরম্ভ করিবে এবং ঐ অবস্থায় থার্মোমিটারে
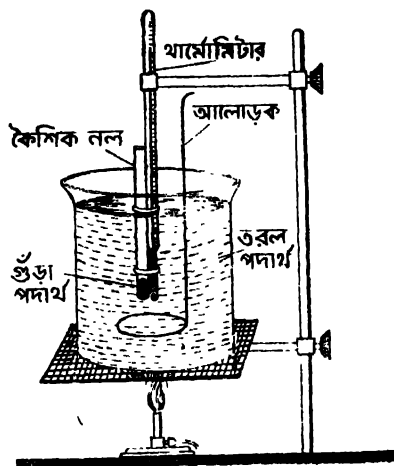
৭৮ নং চিত্র—গলনাঙ্ক নির্ণয়

পারদস্তম্ভ একটি বিশেষ দাগে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। ঐ তাপমাত্রাই পদার্থের গলনাঙ্ক হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। সেটি এই যে, যে গুঁড়া পদার্থকে গলাইবার জন্য যে তরল বস্তু ব্যবহার করিবে তাহার স্ফুটনাঙ্ক যেন উক্ত পদার্থের গলনাঙ্ক হইতে বেশী হয়। যেমন, মোম, ন্যাপ্‌থেলীন প্রভৃতির গলনাঙ্ক 100°C এর (জলের স্ফুটনাঙ্কের) নিচে তাই ইহাদের বেলায় জল ব্যবহার করিলেই চলিবে। কিন্তু, গন্ধক প্রভৃতির বেলায় সালফিউরিক অ্যাসিড লইতে হইবে। কারণ, জলের স্ফুটনাঙ্ক গন্ধকের গলনাঙ্ক অপেক্ষা কম। অনেক ক্ষেত্রে তৈল, গ্লিসারিণ ইত্যাদি তরল পদার্থ ব্যবহার করিয়াও গলনাঙ্ক বাহির করা হয়।

উপরের আলোচনা হইতে দুইটি বিশেষ ধর্ম আমরা পাই।

(i) প্রত্যেক কঠিন পদার্থ একটি নির্দিষ্ট চাপে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রাতে গলিতে সুরু করে।

(ii) যতক্ষণ গলন চলিতে থাকে ততক্ষণ তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না।

স্ফুটন (Boiling) এবং **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling point) :—

কোন তরল পদার্থে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে এক প্রকার শব্দ করিয়া উহা ফুটিতে থাকে। তোমরা সকলেই বুদ্‌বুদ্‌ সহকারে জল ফুটিতে দেখিয়াছ। বস্তুত, তরল পদার্থ মাত্রই একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটিতে শুরু করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, **একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সমস্ত অংশ হইতে দ্রুতগতিতে তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়া রূপ যে প্রক্রিয়া তাহাকে তাহার স্ফুটন** (Boiling) **বলে**। এখন যদি বায়ুর চাপ স্থির রাখা যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তরল পদার্থের সমস্তটুকু বাষ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ নির্দিষ্ট উষ্ণতা স্থির থাকে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট চাপে এবং স্থির উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ যদি বাষ্পে পরিণত হয় তবে ঐ স্থির উষ্ণতাকে তরলের পদার্থের **স্ফুটনাঙ্ক** বলে। (Boiling point)।

বিভিন্ন পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন হয়। নিচের ছকে বায়ুর সাধারণ চাপে (760 মি: মিঃ) কয়েকটি পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হইল।

তরল	স্ফুটনাঙ্ক	তরল	স্ফুটনাঙ্ক
জল	100°C	গ্লিসারিন	280°C
অ্যাল্‌কোহল	78°C	অক্সিজেন	—183°C
পারদ	375°C	হাইড্রোজেন	—253°C
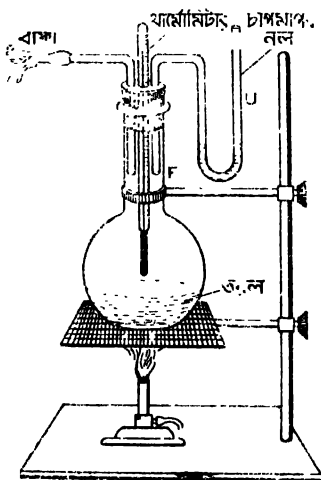
স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের পরীক্ষা -একটি কাচের ফ্লাস্ক F-এর কিছু অংশ জলপূর্ণ কর। (৭৯ নং চিত্র দেখ) ফ্লাস্কের মুখ তিনটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ছিদ্রগুলির একটিতে থার্মোমিটার, একটিতে বাষ্প বাহির হইবার নল এবং শেষটিতে একটি U-নল প্রবেশ করাও। U-নলের আর একটি দিক বাইরের দিকে খোলা থাকিবে।

৭৯ নং চিত্র—স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়েরপরী ক্ষা

U-নলের মধ্যে কিছুটা পারদ ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহাতে U-নলটি একটি চাপ-মাপক যন্ত্রের কাজ করিবে। U-নলের পারদস্তম্ভ দুইটি যখন এক উচ্চতায় থাকিবে তখন

ফ্লাস্কের ভিতরের বাষ্পের চাপ ও বাহিরের বায়ুর চাপ সমান থাকিবে। এইবার ফ্লাস্কটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর। প্রথমে যে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিবে তাহা দ্রবীভূত বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। আরও কিছুক্ষণ গরম করিতে থাকিলে, তাপমাত্রা যখন স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি যাইবে, তখন সোঁ, সোঁ শব্দ শুনিতে পাইবে। তাহার কিছুক্ষণ পরেই সোঁ সোঁ শব্দ থামিয়া যাইবে এবং জলের প্রায় সমস্ত স্থান হইতে বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌সহ জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। এই অবস্থাকেই জলের **স্ফুটন** বলে। এই সময় থার্মোমিটারে তাপমাত্রা লক্ষ্য করিবে। দেখিবে, যতক্ষণ না সমস্ত জল বাষ্প হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত থার্মোমিটারের পারদ একই স্থানে স্থির রহিয়াছে। এই স্থির তাপমাত্রাকেই **স্ফুটনাঙ্ক** বলা হয়। লক্ষ্য রাখিবে যেন U-নলের দুই বাহুতে পারদের উচ্চতা এক থাকে। যদি U-নলের দুই বাহুর পারদ সমান উচ্চে না থাকে তবে কিছুক্ষণের জন্য উত্তাপ দেওয়া বন্ধ করিয়া কিছু বাষ্প বাহির করিয়া দিবে এবং দুই বাহুর পারদ স্তম্ভকে সমান উচ্চতায় আনিবে। এই অবস্থায় যে স্ফুটনাঙ্ক পাইবে তাহাই প্রকৃত স্ফুটনাঙ্ক। বিভিন্ন তরল পদার্থ লইয়া এই পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক পাওয়া যাইবে।

স্ফুটনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব ঃ—চাপ কমাইলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায় অর্থাৎ তরল পদার্থ কম তাপমাত্রায় ফুটে। চাপ কমিলে যে স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায় তাহার একটি পরীক্ষা দেখ ঃ

একটি ফ্লাস্কের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইয়া তাহার মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এখন ইহাকে একটি ধারকের উপর উপুড় করিয়া রাখ [৮০ নং চিত্র দেখ]। এবার ফ্লাস্কের উপর ঠাণ্ডা জল ঢালিলেই জল আবার ফুটিতে আরম্ভ করিবে। ইহার কারণ কি? ছিপি লাগাইবার সময় ফ্লাস্কে গরম বাষ্প ছিল, ঐ বাষ্পের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান ছিল। উপরের ঠাণ্ডা জল পড়িলেই গরম বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং চাপ অনেক কমিয়া যায়।
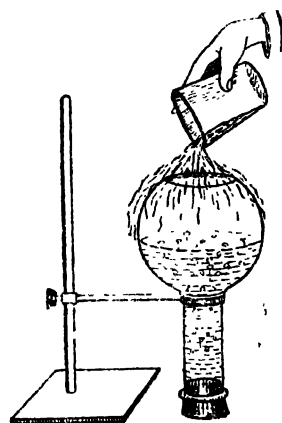
৮০ নং চিত্র—চাপ হ্রাসের সংগে সংগে স্ফুটনাঙ্কেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়

চাপ হ্রাস পাওয়ায় জলের স্ফুটনাঙ্কও কমিয়া আসে। কিন্তু এই কম স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় ফ্লাস্কের জল অনেক বেশী গরম থাকে তাই জল পুনরায় ফুটিতে থাকে সুতরাং এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে তরলের উপরের চাপ কমাইলে তরলের স্ফুটনাঙ্কও কমিয়া যায়।

পাহাড়ের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ অনেক বলিয়া অল্প তাপমাত্রায়ই জল ফুটিতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন উচ্চতায় জলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন হয়। তাই জলের স্ফুটনাঙ্ক দেখিয়া কোন স্থানের উচ্চতাও বাহির করা যায়।

প্রেসার কুকারে (Pressure Cooker) রান্না কেন তাড়াতাড়ি হয় জান? প্রেসার কুকার হইতে বাষ্প খুব কম বাহির হয় তাই ইহার ভিতরে বাষ্পের চাপ খুব বেশী হয়। ফলে, ভিতরের জলও বেশী গরম হয় অর্থাৎ জলের স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। তাই রান্না দ্রুত হইয়া যায়।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা স্ফুটনাঙ্কের নিম্নলিখিত ধর্মগুলি পাই।

(i) **প্রত্যেক তরল পদার্থ নির্দিষ্ট চাপে একটি নির্দিষ্ট তাপ মাত্রায় ফুটিতে থাকে। এই তাপ মাত্রাকে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে।**

(ii) যতক্ষণ তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে ততক্ষণ তাহার তাপমাত্রায় কোনও পবিবর্তন হয় না।

(iii) চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির সংগে সংগে স্ফুটনাঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

স্ফুটন ও গলনের মিল :—কঠিন পদার্থের গলন ও তরলের স্ফুটনের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। নিম্নে কয়েকটি মিলের কথা বলা হইল।

(i) দুইটি প্রক্রিয়াতেই উষ্ণতা স্থির থাকে।

(ii) দুইটি প্রক্রিয়াতেই চাপ স্থির রাখিতে হয়। চাপের হ্রাস বৃদ্ধির সংগে গলনাঙ্কের ও স্ফুটনাঙ্কের মানের বদল হয়।

(iii) পদার্থ যদি বিশুদ্ধ অবস্থায় না থাকে তবে গলনাঙ্কের ও স্ফুটনাঙ্কের মানের বদল হয়।

বাষ্পীয়ভবন (Vaporisation) :—কোন তরলের বায়বীয় অবস্থাকে উক্ত তরলের **বাষ্প** বলা হয়। আমরা জানি স্ফুটনের বেলায় এই বাষ্প তরল হইতে খুব দ্রুত বাহির হইয়া আসে। কিন্তু তরল হইতে বাষ্প যখন ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে তখন তাহাকে বাষ্পীভবন বলে। আমরা ইহাও জানি যে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কিছু তাপের প্রয়োজন হয়। তরল হইতে বাষ্পে পরিণত হইতেও কিছু তাপের দরকার হয়। এই তাপ বাষ্পে লীন

(অপ্রকাশ্য) অবস্থায় থাকে। তাহাকে **বাষ্পীয় ভবনের লীনতাপ** (**Latent heat of vaporisation**) বলে।

বাষ্পায়ণ কেবল তরলের উপরিতল হইতে হয় এবং যে কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে নদী, পুকুর শুকাইয়া যায়, খোলা পাত্রের জল শুকাইয়া যাওয়া, ভিজা কাপড় রৌদ্রে শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি সবই বাষ্পায়ণের উদাহরণ।

বাষ্পায়ণের হার কিসের উপর নির্ভর করে ?

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বাষ্পায়ণের হারের পরিবর্তন হয়।

(1) **তরলের প্রকৃতি :**—যে তরলের স্ফুটনাঙ্ক যত কম, কোনও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাহার বাষ্পায়ণের হার তত বেশী। যে সকল পদার্থ অধিক মাত্রায় এবং তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয় তাহাদিগকে বলা হয় **উদ্বায়ী** পদার্থ। পদার্থ যত বেশী উদ্বায়ী হইবে (অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্ক কম হইবে) উহা তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে।

উদাহরণ :—

খোলাপাত্রে স্পিরিট ও জল রাখিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্পিরিট সম্পূর্ণরূপে উবিয়া যাইবে, কিন্তু জল যাইবে না। কারণ স্পিরিটের স্ফুটনাঙ্ক, জলের তুলনায় খুবই কম, তাই উহার বাষ্পায়নের হারও দ্রুততর। স্পিরিট, পেট্রল, ইথার ইত্যাদি উদ্বায়ী পদার্থ।

(2) **বায়ুর শুষ্কতা :**—(Dryness of air) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত কম থাকে অর্থাৎ বায়ু যত শুষ্ক হয় জলের বাষ্পায়ণের হার তত বেশী হয়।

উদাহরণ :—

(i) শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে কিন্তু বায়ুতে বর্ষাকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। সেই জন্য শীতকালে ভিজা কাপড় বর্ষাকাল অপেক্ষা তাড়াতাড়ি শুকায়।

(ii) কুয়াশা হইলে ভিজা কাপড় শুকাইতে চাহে না—কারণ তখন বায়ুর আর্দ্রতা বেশী থাকে।

(3) **তাপমাত্রা বৃদ্ধি :**—

প্রত্যেক তরল পদার্থই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়।

উদাহরণ :—

ভিজা কাপড়, ভিজা জামা ছায়া হইতে রৌদ্রে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়। জল গরম করিলে দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(4) **বায়ু চলাচল**—তরল হইতে উত্থিত বাষ্প যদি সরাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বাষ্পায়ণের প্রক্রিয়া দ্রুত হয় অর্থাৎ, বায়ু চলাচল বেশী হইলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়।

উদাহরণ ঃ—

(i) ধূমায়িত চা, গরম দুধ বা ভাতে পাখার বাতাস করিলে বা ফুঁ দিলে উহা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়।

(ii) হাওয়া থাকিলে বা পাখার নীচে রাখিলে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

(5) **তরলের তলের বিস্তৃতি ঃ**—আবার তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বৃদ্ধি পায় বাষ্পায়ণের হারও তত বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ ঃ

গরম চা বা দুধ ডিসে ঢালিলে, গরম ভাত ছড়াইয়া দিলে উহারা তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয় এবং ঠাণ্ডা হয়।

বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের পার্থক্য :

(i) বাষ্পায়ণ সকল তাপমাত্রাতেই হয়, কিন্তু স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হয়।

(ii) বাষ্পায়ণ কেবলমাত্র তরলের উপরিতল হইতেই হয়, কিন্তু স্ফুটনের সময় তরলের উপর ও ভিতর সমস্ত স্তর হইতেই বাষ্প নির্গত হয়।

(iii) বাষ্পায়ণ ধীরে ধীরে হয় আর স্ফুটন খুব দ্রুতগতিতে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করিতে গেলে কিছু তাপের (লীন-তাপ) দরকার হয়। যদি বাহির হইতে এই তাপ প্রদান করা না হয় তবে তরল পদার্থটি নিজ দেহ হইতে বা উহা যাহার সংস্পর্শে থাকে তাহা হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ফলে, তরল বা পারিপার্শ্বিক বস্তু শীতল হয়। শরীরের ঘাম বাষ্পীভূত হওয়ার সময় শরীর এই কারণেই শীতল হয়। মাটির কুঁজার গায়ের অসংখ্য ছিদ্রপথে জল চোঁয়াইয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। তখন কুঁজার জল শীতল হইতে থাকে বাষ্পায়ণের ফলে যে শৈত্যের সঞ্চার হয় তাহা প্রয়োগ করিয়া বরফ জল ও

রেফ্রিজারেটার তৈয়ারী করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক কাজে বাষ্পায়ণের এই ধর্মকে কাজে লাগানো হয়।

তাপমাত্রা (Temperature) :

তাপ (Heat) প্রয়োগ করিলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে, আর একটি পরিবর্তনের কথা বলিব। সেটি হইল, তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের তাপমাত্রা বা উষ্ণতার (Temperatue) পরিবর্তন হয়। আমরা অনেক সময় তাপ ও তাপমাত্রাকে একই জিনিস বলিয়া মনে করি। উহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারি না। আসলে কিন্তু উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। যেমন, একটি পাত্রের জল ও জলতলের পরিমাণ এক জিনিষ নহে। জলতল বলিতে আমরা বুঝি জলের উপরিতল কতটা উঁচুতে আছে। আর জলের পরিমাণ বলিতে বুঝি পাত্রের কতটা অংশ জলে ভরা আছে। একটি ইঞ্চিতে বা ফুটে এবং অপরটি কিলোগ্রাম বা লিটারে মাপিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে পাত্রে জলের পরিমাণ ও জলতলের পরিমাণ এক জিনিষ নয়। ইহাদের এককও (unit) ভিন্ন। একটাকে প্রকাশ করা হয় উচ্চতা দ্বারা, আর একটাকে প্রকাশ করা হয় ওজন দ্বারা। নিচের ৮১ নং চিত্র লক্ষ্য করিলে
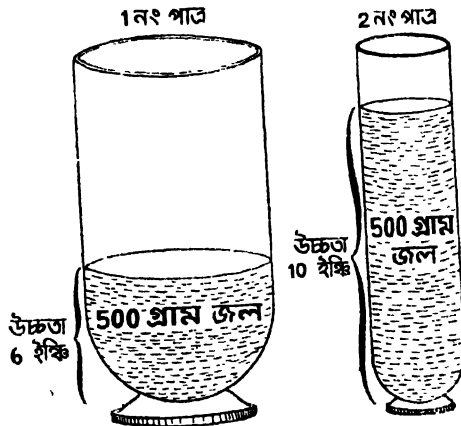
৮১ নং চিত্র—দুইটি পাত্রে জলের পরিমাণ সমান কিন্তু উচ্চতা এক নয়

দেখিতে পাইবে যে দুইটি পাত্রে জলের পরিমাণ সমান কিন্তু উচ্চতা এক নয়। অনুরূপভাবে, তাপ এবং তাপমাত্রাও এক নহে। জল ও জলতলের একক

যেমন ভিন্ন তাপ এবং তাপমাত্রার একক তেমনি ভিন্ন। তাপের একক ক্যালোরি (Colorie), আর তাপমাত্রার একক ডিগ্রি। এখানে অবশ্য আমরা শুধু তাপমাত্রার পরিমাণের কথাই আলোচনা করিব। তাপের পরিমাণের কথা নহে। তাপের পরিমাণের কথা তোমরা আরও উপরের শ্রেণীতে পড়িবে।

৮২ নং চিত্রে দুইটি লোহার খণ্ড লওয়া হইয়াছে। উহাদের একটির উষ্ণতা 60° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অপরটির উষ্ণতা 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অথচ জলের পরিমাণের মত লৌহখণ্ড দুইটির তাপের পরিমাণ এক, অর্থাৎ উহাদের ক্যালোরির পরিমাণ সমান।

এক্ষণে, ৮১ নং চিত্রের ১নং পাত্রে জল ঢালিয়া উহার উচ্চতা বাড়ান যায় এবং ২নং পাত্রের উচ্চতার সমান করা যায়। অনুরূপভাবে ৮২ নং

৮২ নং চিত্র—লৌহখণ্ড দুইটির তাপের পরিমাণ এক হইলেও উষ্ণতা এক নয়

চিত্রের ১নং লৌহখণ্ডে তাপপ্রয়োগ করিয়াও [অর্থাৎ ক্যালারির পরিমাণ বাড়াইয়া ২নং লৌহখণ্ডের উষ্ণতার সমান করা যায়। জলপাত্র দুইটি যদি একটি নলদ্বারা যুক্ত করিয়া দেই ; তবে উচ্চতল বিশিষ্ট প্রথম পাত্র হইতে জল নিম্নতল-বিশিষ্ট দ্বিতীয় পাত্রে প্রবাহিত হইবে। ইহাই জলের ধর্ম। সেইরূপ নিম্ন উষ্ণতা বিশিষ্ট প্রথম লৌহখণ্ডটিকে যদি উচ্চ উচ্চতা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় লৌহখণ্ডটির সহিত সংযুক্ত করি, তবে দ্বিতীয়টি হইতে তাপ প্রথমটিতে প্রবাহিত হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারি :

(i) তাপ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু হইতে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়।

(ii) যখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করে তখন তাহার তাপমাত্রা বর্ধিত হয় এবং যখন তাপ ছাড়িয়া দেয় তখন তাহার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ তাপ হইল হেতু (cause), আর তাহার ফল (effect) হইল তাপমাত্রা।

(iii) দুইটি বস্তুর তাপ এক হইলেও তাপমাত্রা ভিন্ন হইতে পারে।

(iv) 'তাপমাত্রা' বস্তুর একটা তাপীয় (Thermal) অবস্থা আর 'তাপ' বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত একপ্রকার শক্তি।

তাপমাত্রা নিরূপণ (Measurement of temperature):

বস্তুর তাপমাত্রা কি তাহা দেখিলাম। কিন্তু তাপমাত্রার পরিমাণ কি ভাবে নির্ণয় করা যায় তাহাই আমরা এখন দেখিব। তাপমাত্রার কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই। কাজেই চক্ষু, কর্ণ বা নাসিকা দ্বারা তাহাকে বুঝা যাইবে না। তবে কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া আমরা তাপের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যদিও তাহার পরিমাপ নির্ণয় করিতে পারি না। যেমন, রোগীর গায় হাত দিয়া তাহার জ্বর হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্বর সঠিক কত তাহা বলিতে পারি না। অর্থাৎ কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা কোন বস্তুর উষ্ণতা বুঝিতে পারা যায় কিন্তু উষ্ণতার পরিমাপ সঠিক নির্ণয় করা যায় না। নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।
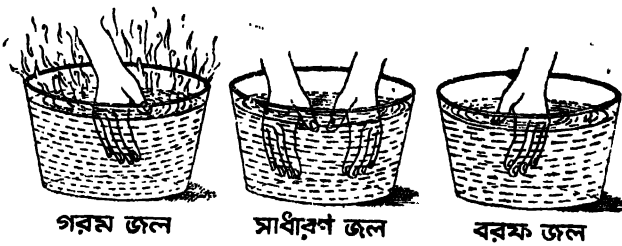
৮৩ নং চিত্র

পাশাপাশি তিনটি পাত্রের প্রথমটিতে গরম জল, দ্বিতীয়টিতে সাধারণ জল ও তৃতীয়টিতে বরফ জল রাখ। তারপর প্রথমে ১নং বাটিতে তোমার ডান হাত ৩নং বাটিতে তোমার বাঁ-হাত কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। তারপর

দুই হাত এক সংগে ২নং বাটির সাধারণ জলে রাখ। দেখিবে, এক হাতে গরম আর এক ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। ফলে, সাধারণ জলের উষ্ণতা বিষয়ে তুমি সঠিক কিছু বলিতে পারিবে না। তাই কোন বস্তুর উষ্ণতা ঠিকভাবে মাপিবার জন্য একপ্রকার উষ্ণতা-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাকে **তাপমান বা থার্মোমিটার** (Thermometer) বলে। রোগীর জ্বর মাপিবার জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। হয়ত অন্য প্রকার থার্মোমিটারও দেখিয়া থাকিবে।

তাপমান যন্ত্র বা Thermometer :—তোমরা পড়িয়াছ যে কোন পদার্থের সংকোচন বা প্রসারণ তাহার উষ্ণতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। পদার্থের এই যে সংকোচন বা প্রসারণ-ধর্ম তাহাকে কাজে লাগাইয়াই বিভিন্ন রকমের থার্মোমিটার তৈয়ারী করা হয়। যেমন—

(i) তাপমাত্রা পরিবর্তনের সংগে তরল পদার্থের আয়তনের যে পরিবর্তন হয় তাহাকে কাজে লাগাইয়া পারদ থার্মোমিটার, অ্যালকোহল থার্মোমিটার প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়াছে।

আবার (ii) গ্যাসের সংকোচন-প্রসারণ ধর্মকে ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ধরনের গ্যাস-থার্মোমিটারের উদ্ভব হইয়াছে।

এখানে অবশ্য আমরা কেবল তরল-পদার্থে তৈয়ারী থার্মোমিটারের কথাই উল্লেখ করিব।

পারদ-থার্মোমিটার প্রস্তুত প্রণালী
(Construction of a Mercury-in-glass Thermometer) :—

(১) **নলপ্রস্তুত** :—প্রথমে একটি সরু রন্ধ্র-বিশিষ্ট শক্ত কাচনল লও। রন্ধ্রের ব্যাস যেন আগাগোড়া সমান থাকে। এইবার কাচ নলটির একপ্রান্ত আগুনে গলাইয়া অপর প্রান্ত হইতে ফুঁ দাও, দেখিবে গরম প্রান্তে একটি কুণ্ডের মত তৈয়ারী হইয়াছে। উহাকে থার্মোমিটারের কুণ্ড (bulb) বলে। তারপর নলের খোলা মুখটি আগুনে গরম করিয়া টানিয়া একটু সরু করিয়া লও। [৮৪ নং. চিত্র দেখ]

(২) **নলে পারদ ভর্তি :**—নলের ছিদ্র অতিশয় সরু বলিয়া উপর হইতে ঢালিয়া উহাতে পারদ ভরা যাইবে না, কারণ নলের ভিতরটি বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে। ইহার জন্য খোলা মুখের সঙ্গে রবার নলের সাহায্যে একটা ফানেল আটকাও। তারপর এই ফানেলের উপর কিছু পারদ ঢাল। দেখিবে, পারদ নলের ভিতরে ঢুকিবে না। এইবার কুণ্ডটিকে যদি আগুনে গরম কর তবে দেখিবে যে বায়ু বুদ্‌বুদ্‌ আকারে ফানেলের পারদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। তারপর কুণ্ডটি ঠাণ্ডা হইলে বাহিরের বায়ুর চাপে আপনা হইতে কিছু পারদ কুণ্ডটির মধ্যে ঢুকিবে। সম্পূর্ণ নলটিকে পারদপূর্ণ করিবার জন্য এই গরম-ঠাণ্ডা পদ্ধতিটি কয়েকবার প্রয়োগ করিতে হইবে।

৪৮ নং চিত্র—নলে পারদ ভর্তির ব্যবস্থা
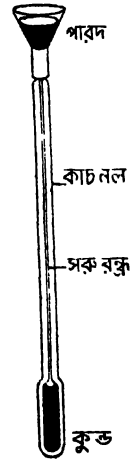
অতঃপর, তুমি যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয় করিতে চাও, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী তাপমাত্রায় কুণ্ডটিকে গরম কর। দেখিবে, সে অবস্থায় পারদ প্রসারিত হইয়া পুনরায় ফানেল পর্যন্ত উঠিয়াছে। এইবার অতিরিক্ত পারদটুকু ফানেল হইতে সরাইয়া দাও এবং কুণ্ডটিকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা কর। ঠাণ্ডার ফলে পারদ-শীর্ষ যখনই একটু মুখের নিচে নামিবে তখনই মুখটির সরু রন্ধ্রটি গলাইয়া বন্ধ করিয়া দাও। এই অবস্থায় রন্ধ্রপথে কোন বায়ু থাকিবে না। কেবল মাত্র পারদ ও কিছু পারদ-বাষ্প থাকিবে। এইবার পারদপূর্ণ নলটিকে বেশ কয়েকদিন ধরিয়া ঠাণ্ডা করিবার পর উহা থার্মোমিটারের রূপ গ্রহণ করিবে। অবশ্য এখনও তিনটি কাজ বাকী আছে। যথা—(i) নিম্ন স্থিরাঙ্ক নির্ণয় (Lower fixed point), (ii) ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক নির্ণয় (Upper fixed point) এবং (iii) দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যের অংশ অঙ্কন (Graduation) অর্থাৎ দাগকাটা। নিম্নে এই কাজগুলি করিবার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

নিম্নস্থিরাঙ্ক নির্ণয় :

যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ অথবা জল জমিয়া বরফ হয় তাহাকে **নিম্নস্থিরাঙ্ক** বা হিমাঙ্ক (Lower fixed point) বলে। নিম্নস্থিরাঙ্ক নির্ণয়

করিবার জন্য ৮৫নং চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একটি ফানেলে পরিষ্কার বরফের টুকরা লইয়া থার্মোমিটারের কুণ্ড ও নলের কিছু
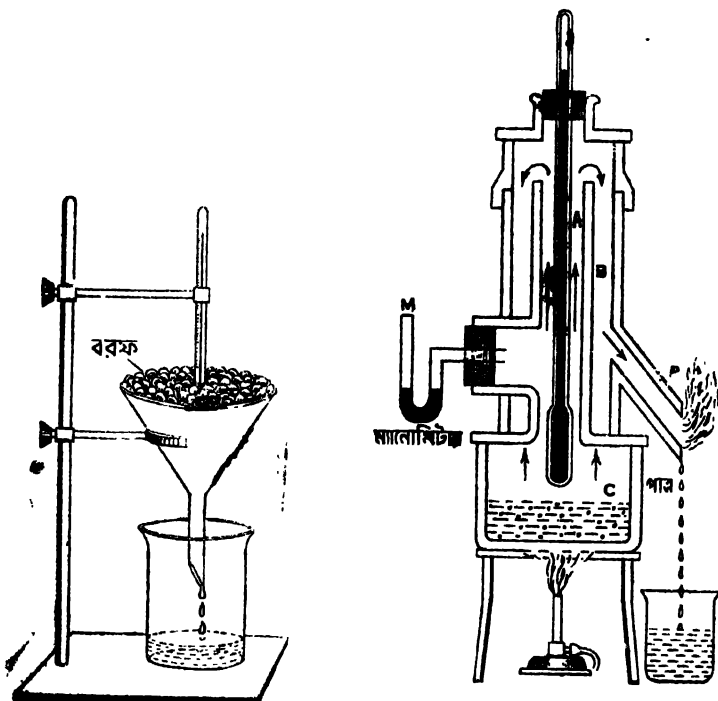
৮৫ নং চিত্র নিম্নস্থিরাঙ্ক নির্ণয়

৮৬ নং চিত্র—হিপ্‌সোমিটারে ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক

অংশ বরফে ডুবাইয়া দাও। বরফের সংস্পর্শে কুণ্ডটি যত ঠাণ্ডা হইবে পারদ স্তম্ভও রন্ধ্রপথে তত নামিয়া আসিবে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আর সে নামিবে না। এক জায়গায় স্থির হইবে। সেই স্থির জায়গাটিতে, নলের গায়ে একটি দাগ দাও। এই দাগকেই নিম্নস্থিরাঙ্ক বলে।

ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয়:

ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয় করিবার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তাহাকে হিপ্‌সোমিটার বলে। ৮৬নং চিত্রে হিপ্‌সোমিটারের (Hypsometer) সাহায্যে ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয়ের ব্যবস্থা দেখান হইল। থার্মোমিটারটিকে

হিপ্‌সোমিটারের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাও। কিন্তু এমন ভাবে প্রবেশ করাও, যেন ইহার কুণ্ডটি, নিচের তামার পাত্রের (C) জল স্পর্শ না করে। C পাত্রের উপর A ও B চিহ্নিত দুইটি ধাতব চোঙ্‌ আছে। জলীয় বাষ্প A চোঙের ভিতর দিয়া B চোঙের মাঝখানে আসে এবং P পথে বাহির হইয়া যায়। A চোঙের বাষ্পের চাপ ও বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপ এক কিনা তাহা বুঝিবার জন্য উহার একদিকে U আকৃতির একটি বাঁকান কাচনল (M) লাগান থাকে। উহার মধ্যে কিছু পারদ ঢালিয়া দেওয়া হয়। উহাকে ম্যানোমিটার বলে। ম্যানোমিটারের দুই বাহুর পারদের তল সমান হইলে, বাষ্পের চাপ ও বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপ এক আছে, বুঝা যায়। উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক নির্ণয় করিবার সময় বাষ্পের চাপ ও বায়ুমণ্ডলের চাপ এক রাখা হয়।

এইবার C পাত্রের জলকে উত্তাপের সাহায্যে ফুটাও। দেখিবে কুণ্ডের পারদ রন্ধ্রপথে উপরে উঠিবে। কিছুক্ষণ পরে পারদের প্রসারণ বন্ধ হইবে এবং পারদস্তম্ভ রন্ধ্রের কোন্ এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। উত্তাপ দিলেও উহা আর উপরে উঠিবে না। এই স্থির জায়গায় কাচ নলে একটা দাগ কাট। উহাকেই উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়।

এইভাবে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক পাওয়ার পর উহার মধ্যবর্তী অংশটুকু উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ করাকে থার্মোমিটারের দাগ কাটা (graduation) বলে এবং প্রত্যেক ছোট ভাগকে এক ডিগ্রী বলে। অঙ্কের মাথায় শূন্য বসাইয়া (যেমন) ১° ডিগ্রীর চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। তোমরা আগেই পাইয়াছ যে ডিগ্রীই তাপ মাত্রার একক। এইবার থার্মোমিটারের তৈয়ারীর কাজ শেষ হইল।

তাপমাত্রার স্কেল : স্থিরাঙ্ক দুইটির মধ্যবর্তী স্থানকে ভাগ করিয়া থার্মোমিটারের স্কেল তৈরী করা হয়। তপমাত্রা মাপিবার জন্য তিন প্রকারের স্কেল প্রচলিত আছে যথা,—সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট ও রিউমার। আমাদের দেশে কেবল প্রথম দুই রকমের স্কেলই ব্যবহৃত হয়।

(ক) **সেন্টিগ্রেড স্কেল :** এই স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক 0° ডিগ্রী ও উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক 100° ডিগ্রী ধরা হয়। মধ্যবর্তী স্থানকে সমান 100 ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলা হয়।

(খ) ফারেনহাইট স্কেল ঃ—ইহার নিম্ন-স্থিরাঙ্ক 32°ডিগ্রী এবং উর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক 212° ডিগ্রী ধরা হয় এবং উহাদের মধ্যবর্তী অংশকে সমান 180 ভাগে ভাগ
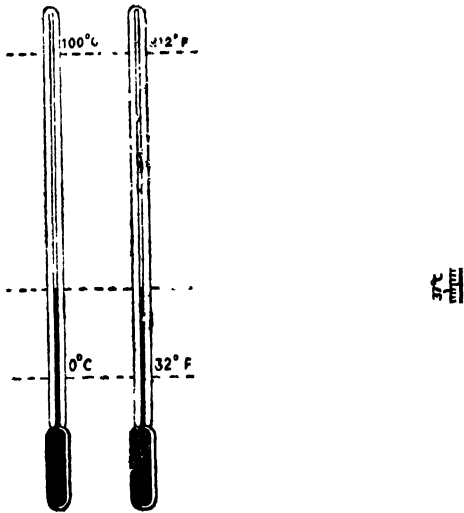
৮৭ নং চিত্র—সেন্টিগ্রেড স্কেল ও ফারেনহাইট স্কেল ৮৮ নং চিত্র—ডাক্তারী থার্মোমিটার

করা হয়। ইহার প্রত্যেক ভাগকে এক এক ডিগ্রী ফারেনহাইট বলে। ৮৭ নং চিত্রে দুইটি স্কেলের ছবি পাশাপাশি দেখানো হইল।

ডাক্তারী বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ঃ—

জ্বর হইলে দেহের তাপ দেখিবার জন্য ডাক্তারগণ যে থার্মোমিটার ব্যবহার করেন তাহাকে ডাক্তারী থার্মোমিটার বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বলে। উহাতে ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহৃত হয়। আজকাল সেন্টিগ্রেড স্কেলেও ডাক্তারী থার্মোমিটার তৈয়ারী হইতেছে। ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে 95° (বা 35°C) ডিগ্রী হইতে 110° (বা 43·3°C) ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে (৮৮ নং চিত্র)। 95° ডিগ্রীর নিচের এবং 110 ডিগ্রীর উপরের দাগগুলি ডাক্তারী থার্মোমিটারে দরকার হয় না। কারণ, জীবিত মানুষের দেহের তাপমাত্রা ইহার ভিতরেই উঠানামা করে। মনে রাখিবে যে এই থার্মোমিটারকে 110° ডিগ্রীর বেশী উত্তপ্ত কোন তরলে ডুবাইলে পারদ প্রসারিত হইয়া উহাকে ফাটাইয়া দিবে। অল্পসংখ্যক দাগ থাকে বলিয়া

উহা আকারে বেশ ছোট হয়। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98·4°F এর কাছাকাছি থাকে। তাই. 98·4°F এর উপর একটি লাল তীর চিহ্ন থাকে। সেই দাগের উপর দেহের উষ্ণতা থাকিলেই শরীরে জ্বর আছে বলিয়া ধরা হয়।

এই থার্মোমিটারের কুণ্ডের একটু উপরে রন্ধ্রটিকে একটু বাঁকাইয়া দেওয়া হয় এবং আরও একটু বেশী সরু করিয়া দেওয়া হয়। [৮৮ নং চিত্রে A অংশ] ফলে, দেহের তাপে পারদ যখন প্রসারিত হয় তখন এই বাঁকা ও সরু পথ দিয়া পারদ উপরে যায় বটে কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার সময় আর নিচে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাই, থার্মোমিটার শরীর হইতে সরাইয়া আনিলেও পারদশীর্ষ স্থির জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং রোগীর তাপমাত্রা পাঠ করিতে অসুবিধা হয় না। কাজ শেষ হইয়া গেলে ঝাঁকুনি দিয়া পারদ পুনরায় কুণ্ডে নামান হয়।

অ্যালকোহল থার্মোমিটার (Alcohal Thermometer) :—

অ্যালকোহল ব্যবহার করিয়া যে থার্মোমিটার প্রস্তুত করা হয় তাহাকে অ্যালকোহল থার্মোমিটার বলে। অ্যালকোহল স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া ইহাতে সামান্য রং মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে নলের কোন্ দাগে অ্যালকোহল আছে তাহা সহজেই চোখে পড়ে। অ্যালকোহল থার্মোমিটারের সুবিধা এবং অসুবিধা দুইটাই আছে। নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল :--

সুবিধা সমূহ :

(i) অ্যালকোহল—130°C এ জমিয়া যায় কিন্তু পারদ মাত্র—39°C এ জমে। সুতরাং নিম্ন তাপমাত্রা মাপিবার জন্য অ্যালকোহল থার্মোমিটার পারদ থার্মোমিটার অপেক্ষা সুবিধাজনক।

(ii) পারদ অপেক্ষা অ্যালকোহলের আয়তন বৃদ্ধি বেশী।

(iii) নির্দিষ্ট আয়তনের অ্যালকোহল পারদ অপেক্ষা কম তাপেই সমান তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা সমুহ :—

(অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক মাত্র 78°C কিন্তু পারদের স্ফুটনাঙ্ক 356°C বলিয়া উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য পারদ থার্মোমিটার সুবিধাজনক।

(ii) আবার অ্যালকোহল পারদের চাইতে কম পরিবাহী।

(iii) অ্যালকোহলের আয়তন বৃদ্ধি সকল তাপ মাত্রায় সমান হারে হয় না এবং ইহা কাচ নলকে ভিজাইয়া দেয়। কিন্তু পারদের এই ত্রুটি নাই।

থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় কেন ?

নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় :

(i) পারদের প্রসার সমান ভাবে হয়।

(iii) পারদ সহজেই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

(iii) পারদের হিমাঙ্ক—39°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 360°C, তাই পারদ ব্যবহার করিলে অনেক ব্যবধান পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়।

(iv) পারদ নলের গায়ে লাগিয়া থাকে না।

তাপ সঞ্চালন (Transmission of heat) :—তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে তাপ উষ্ণ বস্তু হইতে ঠাণ্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়। গরম চায়ে চামচ ডুবাইয়া রাখিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই চামচটি গরম হইয়া উঠিবে। এখানে তাপ গরম চা হইতে ঠাণ্ডা চামচে প্রবাহিত হইয়াছে। চায়ের সংগে চামচের সংযোগ আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সরাসরি সংযোগ না থাকিলেও তাপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হইতে পারে। যেমন, সূর্যের সংগে আমাদের সরাসরি কোন সংযোগ নাই, অথচ রৌদ্রে দাঁড়াইলে আমাদের দেহ উত্তপ্ত হয়। এইরূপ নানা উপায়ে এক বস্তু বা এক স্থান হইতে অন্য বস্তু বা অন্য স্থানে তাপ প্রবাহিত হইলে তাহাকে তাপের সঞ্চালন বলে। তাপ সঞ্চালন তিন উপায়ে ঘটিয়া থাকে।

যথা—(ক) পরিবহন (conduction) (খ) পরিচলন (convection) (গ) বিকিরণ (radiation)। নিম্নে প্রত্যেক প্রক্রিয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল।

পরিবহন (Conduction)—একটি লৌহ-দণ্ডের এক প্রান্ত জলন্ত উনানে ডুবাইয়া দিয়া অপর প্রান্ত হাত দিয়া ধরিয়া রাখ। দেখিবে তাপ আস্তে আস্তে প্রবাহিত হইয়া অপর প্রান্তকে উত্তপ্ত করিতেছে। ক্রমে উহা এত গরম হইবে যে তুমি আর হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। এখন প্রশ্ন হইল তাপ কি করিয়া একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিল? তাহার উত্তর এই যে জল যেমন কোন নালা বাহিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে তাপও তেমনি কোন লোহদণ্ড বাহিয়া একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছাইতে পারে।

৬

ধর, তুমি ক্লাসের এক কোণে বসিয়া আছ। অপর কোণ হইতে তোমার বন্ধু তোমার নিকট একটি বই চাহিল। বইটি তুমি প্রথমে তোমার পাশের ছেলেকে দিলে। সে তাহার পাশের ছেলেকে দিল। সে আবার তৃতীয় ছেলেকে দিল। এইভাবে বইটি তোমার বন্ধুর নিকট চলিয়া গেল। বইটি হাতবদল হইতে হইতে ঘরের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল অথচ তোমাদের কাহারও স্থানত্যাগ করিতে হইল না। লৌহদণ্ডের মধ্য দিয়াও তাপ অনেকটা

এইভাবে প্রবাহিত হয়। লৌহদণ্ডটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণিকা দ্বারা গঠিত। দণ্ডের যে প্রান্ত অগ্নিতে থাকে সেই প্রান্তের কণিকাগুলি প্রথমে উত্তপ্ত হয়। পরে ঐ কণিকাগুলি হইতে পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা কণিকাগুলিতে তাপ প্রবাহিত হয়। ফলে, পার্শ্ববর্তী কণিকাগুলি উত্তপ্ত হয়। ক্রমে দণ্ডের সব কণিকাগুলিই পর পর উত্তপ্ত হয়। এইরূপে তাপ কণিকাগুলির স্থানচ্যুতি না ঘটাইয়াই এক কণিকা হইতে অপর কণিকায় প্রবাহিত হইতে হইতে দণ্ডের অপর প্রান্তকে উত্তপ্ত করে। কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালন সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়াতেই ঘটিয়া থাকে এবং ইহাকেই তাপ-সঞ্চালনের **পরিবহন** পদ্ধতি বলে।

অতএব, **যে পদ্ধতিতে তাপ কোন বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে, বস্তুর কণার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় অথচ সেজন্য বস্তুর কণিকাগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে না তাহাকেই পরিবহন বলে।**

মনে রাখিবে বস্তুকণাগুলির পরস্পর সংযোগ না থাকিলে পরিবহন সম্ভব নয়।

পরিবাহিতা এবং বিভিন্ন পদার্থের পরিবাহিতার তুলনা :—

যে ধর্মের বলে কোন পদার্থ পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন করে তাহাকে সেই পদার্থের **পরিবাহিতা** (conductivity) বলে। বলা বাহুল্য সকল পদার্থের পরিবহন ক্ষমতা সমান হয় না। যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ দ্রুত এবং সহজে প্রবাহিত হইতে পারে তাহাদিগকে তাপের সুপরিবাহী (good conductor) বলে। আর যাহাদের মধ্য দিয়া তাহা সম্ভব নয় তাহাদিগকে কু-পরিবাহী (bad conductor) বলে। সাধারণতঃ, সোনা, তামা, পিতল, রূপা প্রভৃতি ধাতু তাপের সু-পরিবাহী। এদের মধ্যে আবার তামা ও রূপাই সবচেয়ে ভাল সু-পরিবাহী। কাচ, কাঠ, বেত, পশম প্রভৃতি কঠিন পদার্থ তাপের কু-পরিবাহী। তাহা ছাড়া অধিকাংশ তরল গ্যাসীয়। পদার্থই তাপের কু-পরিবাহী।

পরিবাহিতার তুলনা :—

সব পদার্থের তাপ-পরিবাহিতা যে এক নয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যায়।

(**ইনগেনহাউজের পরীক্ষা**—Ingenhausz's experiment)—বিভিন্ন ধাতুর (যথা—তামা, লোহা, কাচ, পিতল প্রভৃতি) কতকগুলি দণ্ড লও।

ইহাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ যেন সমান হয় এবং প্রত্যেকটি দণ্ডে যেন যথাসম্ভব সমভাবে মোমের প্রলেপ লাগানো হয়। একটি আয়তকার ধাতব পাত্রের গায়ে ছিদ্র করিয়া কর্কের সাহায্যে দণ্ডগুলির সমান অংশ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এইবার পাত্রে জল ঢালিয়া জলকে গরম কর ও নাড়িতে থাক। পাত্রের ভিতরের অংশগুলি যেন সমান তাপ পায় ও বাহিরের শীতল অংশে এই তাপ পরিচালিত হয় [৯০ নং চিত্র দেখ।]
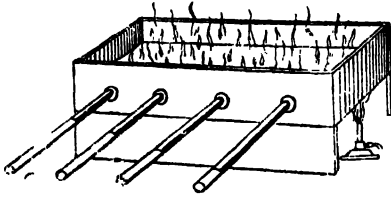
৯০ নং চিত্র—ইনগেনহাউজের পরীক্ষা

লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে বিভিন্ন দণ্ড হইতে মোম বিভিন্ন সময়ে গলিতে শুরু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যখন দণ্ডের তাপমাত্রা স্থির অবস্থায় আসিবে তখন দেখিবে যে বিভিন্ন দণ্ডের মোমের আবরণ বিভিন্ন দূরত্ব পর্যন্ত গলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বিভিন্ন ধাতুর পরিবাহিতা বিভিন্ন। দেখা গিয়াছে, তামার দণ্ডে মোম কাচ দণ্ড অপেক্ষা বেশী গলে। অতএব তামার পরিবাহিতা কাচ হইতে বেশী।

জলের তাপ-পরিবাহিতা খুব কম। নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা :—একটি দীর্ঘ পরীক্ষা-নলের তলায় তামার তারে আটকাইয়া একখণ্ড বরফের টুকরা রাখ। তারপর জল ঢালিয়া পরীক্ষা নলের অনেকটা পূর্ণ কর [৯১ নং চিত্র দেখ]। এইবার পরীক্ষা নলটিকে কাত করিয়া নলের উপরের অংশের জল উত্তপ্ত কর। দেখিবে, উপরের জল ফুটিতে থাকিলেও নিচের বরফ গলিতেছে না।
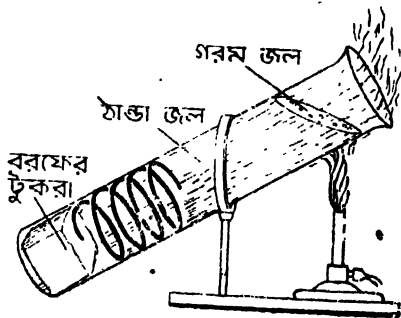
৯১ নং চিত্র—জলের কুপরিবাহিতার পরীক্ষা

অর্থাৎ জল-তাপের কু-পরিবাহি বলিয়া তাপ সহজে জলের কণিকাগুলি বাহিয়া নিচের বরফে পৌছাইতেছে না।

পরিবাহিতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত :—

(i) আমাদের দেহ তাপ বর্জন করিলে আমরা শীত অনুভব করি। যদি আমাদের দেহ তাপের কু-পরিবাহী কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা যায় তবে দেহ হইতে আর তাপ বাহির হইতে পারিবে না। ফলে, আমাদের দেহ গরম থাকিবে। দেখা গেছে পশম, ফ্লানেল, পশুর লোম প্রভৃতি তাপের কু-পরিবাহী। তাহা ছাড়া পশম ও ফ্লানেলের আঁশ খুব আল্‌গাভাবে থাকে এবং উহাদের ফাঁকে ফাঁকে অধিক বায়ু স্থির অবস্থায় আটকাইয়া থাকে। আবার বায়ু তাপের কু-পরিবাহী। সুতরাং পশমের পোষাক ও তাহার মধ্যে আটকানো বায়ু উভয়েই তাপের কু-পরিবাহী হওয়ায় উহাদের ব্যবহারে শীতকালে আমদের দেহ হইতে কোনরূপ তাপ বাহিরে আসে না। ফলে আমাদের শরীর গরম থাকে।

(ii) শীতকালে লেপ গায়ে দিলে বেশ গরম লাগে। কারণ, লেপের তুলার আঁশের ফাঁকে ফাঁকে বায়ু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তোমরা জান, বায়ু তাপের কু-পরিবাহী। তাই, লেপের ভিতরে আবদ্ধ বায়ু দেহ হইতে তাপ বাহিরে আসিতে বাধা দেয় এবং শরীর গরম রাখে।

(iii) শীতকালে একটা পুরু জামা গায়ে না দিয়া তাহার পরিবর্তে পাতলা দুই তিনটি জামা গায়ে দিলে বেশী গরম লাগে। ইহার কারণ দুইটি জামার ফাঁকে পাতলা বায়ুস্তর আবদ্ধ থাকে। এই বায়ুস্তর কু-পরিবাহী বলিয়া দেহকে গরম রাখে।

(iv) একখণ্ড বরফকে কাঠের গুড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে উহা সহজে গলে না। কারণ, কাঠের গুঁড়া তপের কু-পরিবাহী। তাই বাহিরের গরম বাতাস হইতে তাপ সহজে বরফে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে, বরফ সহজে গলে না।

(v) তোমরা জান, তামা তাপের সু-পরিবাহী। একটি তামার তারের জাল (wire gauge) একটি জ্বলন্ত বুনসেন্ দীপের উপর রাখ, দেখিবে জালের নীচের অংশে দীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু জালের উপর গ্যাস থাকা সত্ত্বেও কোন দীপশিখা দেখা যাইবে না [৯২ নং চিত্র দেখ]।

তামা সু-পরিবাহী বলিয়া তাপ দ্রুত জালে ছড়াইয়া পড়ে এবং জালের উপরাংশে যে গ্যাস থাকে তাহা জ্বলিয়া উঠার মত উপযুক্ত তাপ পায় না।

অর্থাৎ, উহার তাপমাত্রা গ্যাসের জলনাঙ্কের (ignition temperature) নিচে থাকে। কিন্তু জালের উপরে একটি জলন্ত কাঠি ধরিলে গ্যাস জলিয়া
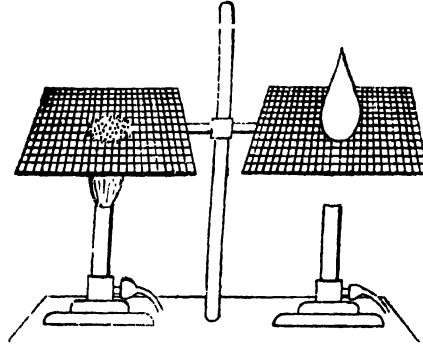
৯২ নং চিত্র ৯৩ নং চিত্র
তামার সুপরিবাহিতার পরীক্ষা

উঠিবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তার-জালের উপরে গ্যাস প্রবাহ থাকে।
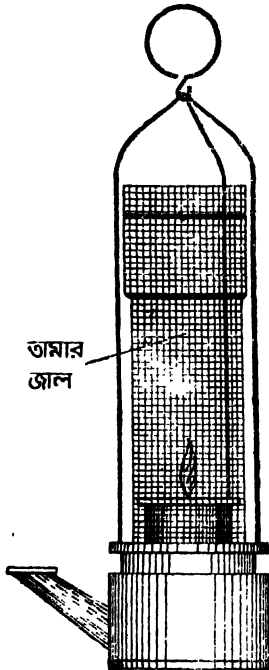
৯৪নং চিত্র—ডেভির নিরাপত্তা বাতি

এইবার বুনসেন্ দীপের উপর তার-জালি রাখিয়া গ্যাস ছাড়িয়া দাও এবং দেশলাইয়ের সাহায্যে জলের উপরাংশের গ্যাস জ্বালাইয়া দাও। দেখিবে, এবারে জালের নিচে কোন শিখা দেখা যাইবে না। কেবল উপরেই আগুন জলিবে। ইহাও তামার সুপরিবাহিতার জন্যই হয়। [৯৩ নং চিত্র দেখ]

(vi) ডেভির নিরাপত্তা বাতি (Davy's Safety lamp) :—কয়লার খনিতে একপ্রকার গ্যাস (marsh gas) থাকে যাহা আগুনের সংস্পর্শে আসিলে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটায় এবং তাহাতে শত শত লোক মারা যায়। এরকম বিস্ফোরণ নিবারণের জন্য ডেভি একপ্রকার বাতি আবিষ্কার করেন। এই বাতিতে শিখার চতুর্দিক চিমনীর বদলে তামার জাল দিয়া ঢাকা থাকে [৯৪ নং চিত্র দেখ]। মার্স-গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু সামান্য

পরিমাণে জালের মধ্যদিয়া বাতির ভিতরে যায় এবং নীল শিখায় জ্বলিতে থাকে। কিন্তু তারের মধ্য দিয়া শিখার তাপ দ্রুত পরিবাহিত হয় না বলিয়া বাহিরের গ্যাস জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত হয় না। ফলে, আগুন লাগার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না।

তাপের পরিচলন (Convection): তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে পরিবহনের বেলায় পদার্থের সূক্ষ্ম কণাগুলি তাপ বিনিময়ের সময় স্থান পরিবর্তন করে না। কিন্তু পরিচলনের বেলায় পদার্থের সূক্ষ্ম কণাগুলি স্থান পরিবর্তন করে। অতএব যে **প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপ উষ্ণতর স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে উত্তপ্ত সূক্ষ্ম কণাগুলির স্থানচ্যুতির দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহাকে পরিচলন বলে।** তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ এই প্রণালীতেই উত্তপ্ত হয়। কঠিন পদার্থে অবশ্য তাপের পরিচলন সম্ভব নয়।

পরীক্ষা :—(A) একটি কাচের ফ্লাস্কে খানিকটা জল লইয়া উহার ভিতর একদানা নীল ফেলিয়া দাও। এখন ফ্লাস্কটিকে গরম কর। দেখিবে তলার নীল-জল উত্তপ্ত হইয়া পাত্রের মাঝখান দিয়া উপরের দিকে উঠিবে, আবার পাত্রের গা বাহিয়া দুই পার্শ্ব দিয়া নামিয়া আসিবে [৯৫ নং চিত্র দেখ]। এইভাবে দুইটি জলস্রোতের সৃষ্টি হইবে। এস্থলে উত্তপ্ত জলের কণাগুলি নিচ হইতেউপরে গিয়া তাপ সঞ্চালনকরিল। এইরূপে বস্তুর কণাগুলির স্থানচ্যুতির ফলে যে তাপসঞ্চালনহয় তাহাকে পরিচলন বলে।
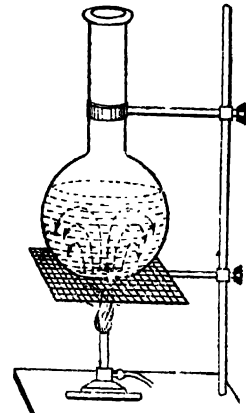
৯৫ নং চিত্র—তাপের পরিচালনের পরীক্ষা

পরীক্ষা :—(B) গ্যাসের ক্ষেত্রেও তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। নিম্নের পরীক্ষা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। একটি চওড়া পাত্রের মাঝখানে একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া বসাইয়া দাও। একটি চিমনির উপর একটি T আকারের কার্ডবোর্ড রাখ এবং চিমনিটিকে পাত্রের উপর বসাও। পাত্রে কিছু জল ঢালিয়া দাও। [৯৬ নং চিত্র দেখ] এইবার একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি চিমনির মুখে ধর। দেখিবে ধোঁয়া পিচবোর্ডের একপাশ দিয়া ঢুকিয়া অন্য পাশ দিয়া বাহির হইতেছে। অর্থাৎ ঠাণ্ডা বায়ু চিমনির ভিতরে

ঢুকিতেছে এবং মোমবাতিটিকে জ্বলিতে সাহায্য করিতেছে। পরে উত্তপ্ত হইয়া চিমনির অন্য মুখ দিয়া সে বাহির হইতেছে। এইরূপে গ্যাসীয় কণাগুলির স্থানচ্যুতির ফলে তাপ সঞ্চালিত হইতেছে। যদি T বোর্ডটি উঠাইয়া নাও তবে দেখিবে মোমবাতিটি একটু পরে নিভিয়া যাইবে। কারণ, তখন বায়ু আর চিমনীর ভিতরে ঢুকিবে না চিমনীর নিচে পাত্রে জল থাকায় বায়ু প্রবেশের কোন রাস্তা থাকে না। কিন্তু হ্যারিকেন বা টেবিল ল্যাম্পের নিচে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশ করাইবার জন্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। আর উপরে ছিদ্র থাকে গরম বায়ুর নির্গমনের জন্য।
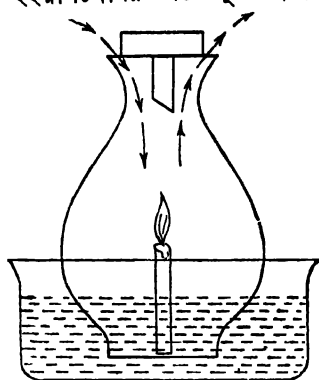
৯৬ নং চিত্র—গ্যাসের মধ্যে তাপের পরিচলন

তাপ-পরিচালনের কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত :—

(1) বায়ুপ্রবাহ, স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু, মৌসুমীবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বায়ুর পরিচালনের জন্য হইয়া থাকে।

(2) ঘরের বায়ু চলাচল ঠিক রাখিবার জন্য বায়ুর পরিচলন-স্রোতকে আমরা কাজে লাগাই। তোমরা জান, বেশী লোক ঘরে থাকিলে বা ঘরে আগুন জ্বালিলে ঘরের বায়ু উষ্ণ এবং বিষাক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঘরের ঘুলঘুলি থাকিলে উষ্ণবায়ু হাল্কা হইয়া ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। তখন আর সহজে বায়ু বিষাক্ত হয় না।

(3) শীতের দেশে বাড়িঘর গরম রাখার জন্য উষ্ণ বায়ুর পরিচলন-স্রোতকে কাজে লাগানো হয়। বাহির হইতে গরম হাওয়া, পাইপ দিয়া ঘরে আনিয়া ঘর গরম করা হয়। এই গরম হাওয়া হাল্কা বলিয়া উপরে উঠিতে চায় এবং উহাকে পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে ঘরগুলি গরম থাকে।

তাপের বিকিরণ (Radiation of heat) :—পরিবহন ও পরিচলনের বেলায় লক্ষ্য করিয়াছ যে তাপ সঞ্চালনের জন্য একটি মাধ্যমের (যেমন তামা, লোহা, জল, বায়ু ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাপের বিকিরণ প্রক্রিয়াতে সেইরূপ কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। উনুনের কাছে বসিয়া থাকিলে আমাদের দেহে তাপ লাগে। সে তাপ কি করিয়া লাগে? তোমরা হয়

তো বলিবে উনুনের গরম বাতাস আমাদের দেহে লাগে বলিয়া আমরা গরম অনুভব করি। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে তো আমাদের পৃথিবীর কোন মাধ্যমের যোগ নাই। বাতাস তো পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাতশত মাইল উপর পর্যন্ত আছে। তারপর কেবল মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের ভিতর দিয়া তাপ পৃথিবীতে আসিতেছে। এইরূপ তাপ প্রবাহকে তাপের বিকিরণ বলে। অবশ্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ইথার (Ether) নামক একপ্রকার পদার্থ মহাশূন্যে আছে। এবং এই ইথারের মধ্যে দিয়াই সূর্যতাপ পৃথিবীতে তরঙ্গাকারে পৌছায়।

বিকার্ণ তাপের কয়েকটি ধর্ম :—

(1) আলোকের ন্যায় বিকীর্ণ তাপও উত্তপ্ত বস্তু হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। একটি গরম লোহার বলের নিকটে যে কোন দিকে হাত রাখ দেখিবে হাতে গরম লাগে অর্থাৎ বল হইতে তাপ চতুর্দিকেই ছড়াইয়া পড়ে।

(2) বিকীর্ণতাপ আলোকের মত শূন্যস্থান দিয়া চলাচল করিতে পারে। সূর্য হইতে যে বিকীর্ণতাপ পৃথিবীতে আসে তাহার বেশীর ভাগই শূন্যস্থান দিয়া আসে।

(3) আলোকের ন্যায় বিকীর্ণতাপও সরলরেখায় চলে। ইহার ফলেই ছাতার সাহায্যে সূর্যের তাপ হইতে আমরা দেহকে রক্ষা করিতে পারি।

(4) আলোকের মত বিকীর্ণ তাপেরও প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ হয়। আয়নার সাহায্যে তোমার দেহের কোন অংশে সূর্যালোক ফেলিলে দেখিবে তোমার দেহের ঐ অংশে কেবল আলোই পড়ে নাই সংগে সংগে তাপও পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া সূর্য রশ্মিকে আতস কাচের (Burning glass) সাহায্যে প্রতিসৃত করিয়া এক জায়গায় মিলিত করিয়া আগুন জ্বালানো যায়। অর্থাৎ, আলোকরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ তাপরশ্মিও প্রতিসৃত হয়।

বিকীর্ণ তাপের কয়েকটি ধর্ম :—

(1) বিকিরণের বিশেষত্ব এই যে. বিকীর্ণ উত্তাপ-রশ্মি যে যে মাধ্যম দিয়া আসে তাহাকে উত্তপ্ত করে না, যে বস্তুতে বাধা পায় শুধু তাহাকেই উত্তপ্ত করে। রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ ছাতা মাথায় দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখিবে ছাতার কাপড় বাতাসের তুলনায় বেশী গরম মনে হইবে। এক্ষেত্রে সূর্যের বিকীর্ণ তাপ বাতাসের মধ্য দিয়া আসিলেও তাহাকে বেশী গরম করে নাই, কিন্তু ছাতাতে বাধা পাইয়া উহাকেই বেশী গরম করিয়াছে। তাহা ছাড়া, কালো রং-এর কোন বস্তু বিকীর্ণ তাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা বেশী রাখে। ছাতার বদলে একখণ্ড কাঁচ মাথার উপর ধরিলে রৌদ্র নিবারণ হইবে না। কারণ, বিকীর্ণ তাপ কাচের মধ্যে বিশেষ শোষিত হয় না। প্রতিসৃত হইয়া চলিয়া আসে।

(2) শীতকালে আমাদের অধিক তাপ শোষণ করা প্রয়োজন, এইজন্য শীতকালের পোষাক কালো হয়। আবার সাদা কাপড়ের তাপশোষণ ক্ষমতা খুবই কম, তাই গরমের দিনে আমরা সাদা পোষাক ব্যবহার করি। এই একই কারণে সাদা কাপে গরম চা রাখা হয়। কারণ তাহাতে চা হইতে তাপের বিকীরণ কম হয়।

(3) রান্নার পাত্রের বাহিরের দিকটা কালো এবং অমসৃণ হইলে তাপের সদ্‌ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয়। এই জন্য বোধ হয় পাড়াগাঁয়ে রান্নার উদ্দেশ্যে মাটির হাঁড়ি বেশি পছন্দ করা হয়। মনে রাখিবে যে, যে সমস্ত জিনিষের রং কালো এবং পৃষ্ঠদেশ অমসৃণ তাহাদের তাপ বিকরণ করিবার এবং বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী।

তাপ সঞ্চালনের তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য :—

উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাপ সঞ্চালন-প্রক্রিয়া তিনটির মধ্যে যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে তাহা বোঝা গিয়াছে। এখন সেই পার্থক্যগুলি নিম্নে একসংগে ছকের আকারে দেখানো হইল :—

পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
1. তাপ যে কোন জড় মাধ্যমে যাতায়াত করে।	1. তাপ তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমের সাহায্যে চলে।	1. তাপ জড় মাধ্যমে বা শূন্যের মধ্য দিয়া চলে।
2. মাধ্যমের উষ্ণতার পরিবর্তন হয়।	2. মাধ্যমের উষ্ণতার পরিবর্তন হয়।	2. যদি মাধ্যম থাকে তবে তাহার উষ্ণতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না।
3. মাধ্যমের কণিকাগুলির স্থান ত্যাগ হয় না।	3, মাধ্যমের কণিকাগুলির স্থান ত্যাগ হয়।	3. ইহা ঢেউয়ের মত চলে।
4. প্রণালী মন্থর।	4. প্রণালী মন্থর।	4. অতিশয় দ্রুত প্রণালী।
5. তাপ যে কোন পথে সঞ্চালিত হয়।	5. কেবল ঊর্ধ্বদিকে সঞ্চালিত হয়।	5. চতুর্দিকেই সঞ্চালিত হয়।
6. তাপ সরল ও বক্র উভয় পথেই চলিতে পারে।	6. তাপ সরল ও বক্র উভয় পথেই চলিতে পারে।	6. কেবল সরল পথে তাপের বিকিরণ ঘটে।

থার্মোফ্লাস্ক (Thermos flask) :—থার্মোফ্লাস্ক হয়তো তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহার মধ্যে গরম দুধ, চা ইত্যাদি রাখিলে অনেকক্ষণ গরম থাকে। আবার, কোন ঠাণ্ডা জিনিষও বহুক্ষণ ঠাণ্ডা রাখিবার কাজে ইহার ব্যবহার হয়।
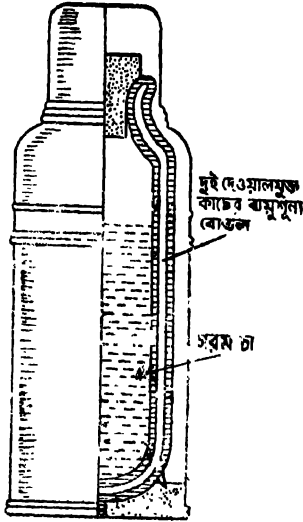
৩৭ নং চিত্র—থার্মোফ্লাস্ক

নির্মাণ কৌশল :—প্রথমে দুই প্রাচীর যুক্ত একটি বোতল লওয়া হয়। দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের বায়ু একটি ছিদ্রপথ দিয়া পাম্প করিয়া যথাসম্ভব বাহির করিয়া ছিদ্রটি বন্ধ করা হয়। কাচ পাত্রটির দেয়ালের ভিতরের তলদ্বয় রূপা বা পারদের প্রলেপ (silvering) দিয়া চক্‌চকে করা হয়। ইহাতে উপরিভাগ বেশ সাদা হয়। বোতলের মুখ কোন কু-পরিবাহী পদার্থের তৈয়ারী ছিপি দ্বারা বন্ধ করা হয়। সমগ্র বোতলটি একটি টিন বা কোন ধাতব পদার্থের খোলের মধ্যে ভরা থাকে এবং স্প্রিং-এর সাহায্যে দৃঢ়ভাবে বসানো থাকে।

কার্য প্রণালী :—আমরা জানি তিনপ্রকারের ফ্লাস্কের ভিতরে তরল পদার্থ হইতে বাহির হইতে পারে। যথা—পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ। তাপের পরিবহন ক্রিয়া পদার্থের সু-পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। এখানে পাত্রটি কাচের তৈয়ারী, উহা খুবই কু-পরিবাহী। উহার মুখের কর্কটিও কু-পরিবাহী পদার্থের তৈয়ারী, কাজেই পরিবহন সম্ভব নয়। আবার পরিচলনের জন্য উষ্ণ বস্তুর সহিত গ্যাসীয় তরল পদার্থের সংযোগ থাকা চাই। কাচপাত্রের দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশে কোন বায়ু না থাকায় এখানে তাপের পরিচলন সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাচ দেওয়ালের ভিতরের উভয় তল সাদা এবং চক্‌চকে হওয়ায় তাপের বিকিরণও সম্ভব নয়। তাই ফ্লাস্কের ভিতরের তরল পদার্থের তাপমাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. তাপ এক প্রকার শক্তি—উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

2. তাপ কাহাকে বলে ? তাপের বিভিন্ন উৎসের নাম কর।

3. কি হয় বল :—(i) দুইটি পাথর ঠুকিলে, (ii) কয়লা পুড়াইলে, এবং (iii) সরু তারের মধ্যদিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করাইলে।

4. তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন পদার্থের যে আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহা একটি উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও। দৈনন্দিন জীবনে এই জ্ঞানের প্রয়োগ কোন্ কোন্ কাজের মধ্যে দেখা যায় তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

5. তরলের তাপ-প্রয়োগে যে সম্প্রসারণ হয় তাহা একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর। প্রকৃত এবং আপাত সম্প্রসারণ বলিতে কি বুঝ ?

6. তাপ দিলে যে গ্যাসীয় পদার্থের সম্প্রসারণ হয় তাহা একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

7. তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কি ? কঠিন পদার্থের উপর তাপের দুই একটা ক্রিয়া বল।

8. ক্লিনিক্যাল বা ডাক্তারী থার্মোমিটারের বর্ণনা দাও।

9. থার্মোমিটার নির্মাণ-প্রণালী ব্যাখ্যা কর।

থার্মোমিটার নির্মাণ কৌশল সূক্ষ্ম কৈশিক নলও বাল্‌ব লওয়া হয় কেন ?

10. সিক্স থার্মোমিটারের গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর। ইহার সাহায্যে কি করিয়া সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা যায় ?

11. নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাখ্যা কর :—

(i) গলন (ii) কঠিনীভবন (iii) বাষ্পীভবন (iv) স্ফুটন (v) গলনাঙ্ক (vi) হিমাঙ্ক (vii) স্ফুটনাঙ্ক।

12. বাষ্পীভবনের হার যে সমস্ত কারণগুলির উপর নির্ভর করে তাহা বল ও ব্যাখ্যা কর।

13. তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন প্রণালীগুলি উপযুক্ত উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

14. স্ফুটন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে কি পার্থক্য ?

15. স্ফুটনাঙ্ক কি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় তাহার বর্ণনা দাও।

16. তাপ চলাচলের তিনটি প্রণালীর পার্থক্য কি ?

17. নিম্নলিখিত জিনিসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(i) থার্মোফ্লাস্ক।

(ii) ডেভির নিরাপত্তা বাতি।

(iii) হিপ্‌সোমিটার।

18. জলের তাপ পরিবহন ক্ষমতা কম। ইহা পরীক্ষার সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

19. বিভিন্ন কঠিন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন, তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিবে?

20. কঠিন, তরল ও গ্যাসের মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা বেশী প্রসারণশীল? গ্যাসের প্রসারণশীলতা সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

21. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(ক) বোতলের গায়ে গরম জল ঢালিলে আঁট ছিপি আল্‌গা হয় কেন?

(খ) রেললাইন পাতার সময় প্রত্যেক দুই টুকরা লাইনের মাঝে খানিকটা ফাঁক থাকে কেন?

(গ) দুইটি বিভিন্ন ধাতুর পাত শক্তভাবে জোড়া লাগাইয়া উত্তপ্ত করিলে বাঁকিয়া যায় কেন?

(ঘ) থার্মোমিটার পারদ ব্যবহার করা হয় কেন?

(ঙ) হ্যারিকেনের গরম কাঁচের চিম্‌নিতে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়িলে উহা ফাটিয়া যায় কেন?

(চ) কেটলীর হাতল বেত দ্বারা মোড়ান থাকে কেন?

(ছ) মাটির কলসীতে জল বেশী ঠাণ্ডা থাকে কেন?

(জ) গরমের দিনে সাদা জামা কাপড় ব্যবহার করা হয় কেন?

(ঝ) গরমকালে পাখার হাওয়ায় আরাম বোধ হয় কেন?

(ঞ) গরমকালে জানালায় খস্‌খস্‌ টাঙানো হয় কেন?

(ট) পশমের পোষাক গায় দিলে শরীর গরম লাগে কেন?

Objective Test

(A) 'Yes' or 'No' type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া করিবে।

(ক) তাপ কি এক প্রকার শক্তি?

(খ) দুইটি বস্তুর তাপ এক থাকিলেই কি তাপমাত্রা এক হইবে ?

(গ) গ্যাসের প্রসারণ কি তরলের অপেক্ষা বেশী ?

(ঘ) বাষ্পীভবন কি তরলের সমস্ত অংশ হইতে হয় ?

(ঙ) স্পর্শ দ্বারা কি উষ্ণতা সঠিক জানা যায় ?

(B) True or False type test :—

সত্য উক্তির পার্শ্বে T এবং ভুল উক্তির পার্শ্বে F লিখিবে।

(ক) তরল বাষ্পীভূত হইলে তাপ শোষণ করে না।

(খ) জলের স্ফুটনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে।

(গ) সমান তাপ পাইলে সকল গ্যাসেরই সমান প্রসারণ হয়।

(ঘ) বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যমের দরকার হয় না।

(ঙ) জলকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিলে উহার উষ্ণতা সর্বদাই বৃদ্ধি পাইবে।

(C) Recall type test :—

শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বস্তু তাপমাত্রা মাপিবার জন্য——ব্যবহার করা হয়।

(খ) পৃথিবীর সকল তাপের মূল উৎস—।

(গ) যে প্রণালীতে তাপ পদার্থের অণুর অবস্থানের পরিবর্তন না করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায় তাহাকে—।

(ঘ) স্পিরিট জল অপেক্ষা অধিক——।

(ঙ) ফারেনহাইট স্কেলে হিমাঙ্ককে ধরা হয় 32° ডিগ্রি আর স্ফুটনাঙ্ককে ধরা হয়——।

(D) Multiple choice type test :—

অনেকগুলি উত্তর ডানদিকে লেখা আছে। যেটি ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও।

(ক) যে প্রণালীতে পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে গমন করিয়া তাপ সঞ্চালন করে তাহাকে কি বলা হয় ?——পরিবহন, পরিচলন, বিকিরণ।

(খ) খুব দ্রুত তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হইবার পদ্ধতিকে কি বলা হয় :—বাষ্পায়ণ, কঠিনীভবন, স্ফুটন।

(গ) তরলের কি প্রকারের প্রসারণ সম্ভব?—ক্ষেত্রপ্রসারণ, আয়তন-প্রসারণ দৈর্ঘ্যপ্রসারণ।

(ঘ) চকমকি পাথর ঘষিয়া তাপ উৎপন্ন করিলে ঐ উৎসকে কি বলা হইবে?—রাসায়নিক, যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক।

(ঙ) যে বিশেষ উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় তাহাকে পদার্থের কি বলা হয়?

——স্ফুটনাঙ্ক, হিমাঙ্ক, গলনাঙ্ক।

(E) **Matching type test :—**

নিচের পংক্তি II হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছাই করিয়া I পংক্তির শূন্যস্থান পূরণ কর :—

I	II
(ক) জল—উষ্ণতায় সর্বাপেক্ষা ঘন হয়। (খ)—উষ্ণতায় তরলের——হইতে তরল বাষ্পে পরিণতিকে——বলে। (গ) তাপ হ্রাসে তরল পদার্থের কঠিনে পরিণত হওয়াকে——বলে।	4°C, বাষ্পীভবন, উপরতল, কঠিনীভবন, যে কোন।

(F) **Association type test :—**

: : চিহ্নের বাম দিকের দুই শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক, ডানদিকের দুই শব্দের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। ডানদিকের একটি শব্দ দেওয়া আছে অপর শব্দটি কি বাহির কর :—

(ক) কঠিন : গলনাঙ্ক : : তরল :——।

(খ) বাষ্পীয়ভবন : মন্থর : : স্ফুটন :—

চতুর্থ অধ্যায়
রাসায়নিক বিক্রিয়া
CHEMICAL REACTIONS

অম্ল (Acid), ক্ষারক (Base) এবং লবণ (Salt)

জগতে আমরা নানাজাতীয় পদার্থ দেখি। তাহাদের অবস্থা ও গুণাগুণের মধ্যে কত বিচিত্রিতা। রাসায়নিক বিজ্ঞান এই পদার্থ সমূহকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে। যথা—

(i) মৌলিক পদার্থ (Element) এবং (ii) যৌগিক পদার্থ (Compounds)। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন এবং ঐ সকল মৌলিক পদার্থের দুই বা ততোধিক একত্রে মিলিত হইয়াই যে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। উহাদিগকে অম্ল (Acid), ক্ষারক (Base) এবং লবণ (Salt) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে উহাদের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

(A) অম্ল :—

অম্ল বা অ্যাসিড (Acid) কথাটির অর্থ টক। বস্তুত, অধিকাংশ অ্যাসিডই খাইতে টক লাগে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত টক জাতীয় জিনিষ খাইয়া থাকি তাহারা অ্যাসিড শ্রেণীর অন্তর্গত। লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid), তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড (tartaric acid) দধিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড (lactic acid) থাকে। এক প্রকার কালো পিঁপড়ার দেহে ফরমিক অ্যাসিড (formic acid) পাওয়া যায়। নানাপ্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ হইতে আমরা যে সমস্ত অ্যাসিড পাইয়া থাকি তাহাদিগকে জৈব অ্যাসিড (organic acid) বলে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত অ্যাসিড অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহারা হইল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি। এই সমস্ত অ্যাসিড সাধারণতঃ খণিজ লবণ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে খনিজ অ্যাসিড (mineral acids) বলে।

অম্লের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই ধর্মগুলির সাহায্যে কোন বস্তু অ্যাসিড কিনা নির্ণয় করিতে পারি। নিম্নে অ্যাসিডের ধর্মগুলির পরীক্ষা ও নির্ণয় প্রণালী দেখান হইল।

(i) অ্যাসিড খাইতে টক লাগে। কোন লঘু অ্যাসিডের দুই এক ফোঁটা জিহ্বায় লাগাইলেই তাহা বুঝা যাইবে। (ii) অ্যাসিড নীল লিট্‌মাস-দ্রবণকে (বা লিটমাস-সিক্ত শোষক কাগজকে) লাল করে। মিথাইল অরেঞ্জ-এর হলুদ-দ্রবণকে গোলাপী (লাল) করে এবং ফেনল্‌প্‌থ্যালীন দ্রবণের কোন বর্ণ পরিবর্তন করে না। নিম্নের পরীক্ষা হইতে উহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। (৯৮ নং চিত্র দেখ)
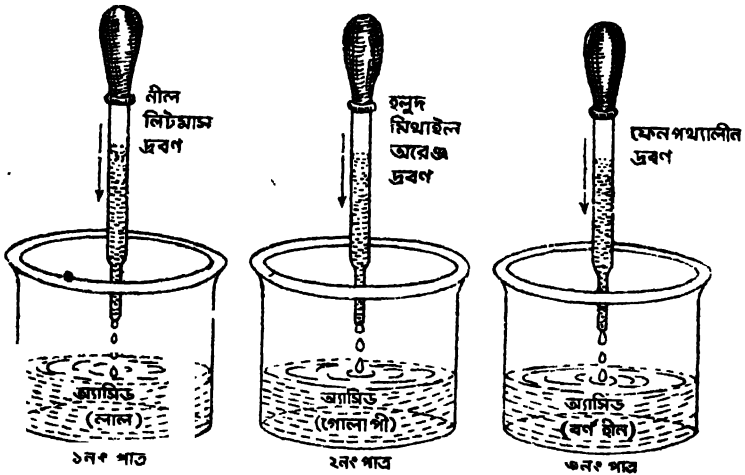
৯৮ নং চিত্র

তিন পাত্রে (বীকার) সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড লও। এইবার প্রথম পাত্রে কয়েক ফোঁটা নীল লিট্‌মাস দ্রবণ দাও। দেখিবে উহার রং লাল হইবে। তারপর দ্বিতীয় পাত্রে কয়েক ফোঁটা মিথাইল অরেঞ্জের হলুদ-দ্রবণ যোগ কর। তখন অ্যাসিডের রং গোলাপী হইবে। এইবার তৃতীয় পাত্রে সামান্য ফেনল্‌প্‌-থ্যালীন দ্রবণ মিশাও। দেখিবে, এই ক্ষেত্রে কোনরূপ রং-এর পরিবর্তন হইবে না। কাজেই এই সব পরীক্ষা হইতে আমরা কোন অজানা বস্তু অ্যাসিড কিনা, তাহা জানিতে পারি।

(iii) অ্যাসিড এক বা একাধিক প্রতিস্থাপন-যোগ্য (replaceable) হাইড্রোজেনের পরমাণু থাকে। সেই হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধাতুর পরমাণু

দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। ৯৯ নং চিত্রের ন্যায় দুই মুখের একটি বোতল (উল্‌ফের বোতল) লও। উহাতে কয়েক টুকরা দস্তা রাখিয়া ফানেলের সাহায্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখিবে, তৎক্ষণাৎ হাইড্রোজেন গ্যাস, নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। জল অপসারণ করিয়া
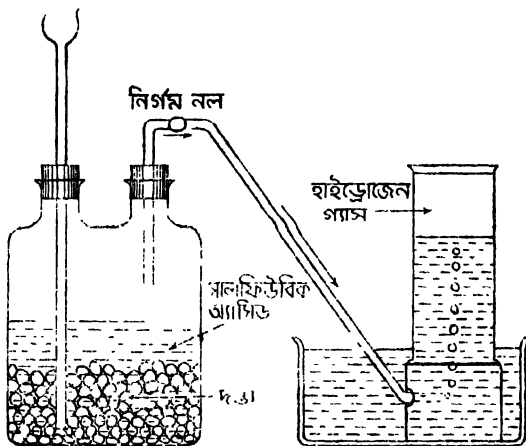
অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত
৯৯ নং চিত্র

গ্যাসজারে গ্যাস জমাও। তারপর দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়া ঐ গ্যাস জ্বালাইয়া দেখ। দেখিবে, হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠিবে।

(iv) ইহার আর একটি প্রধান ধর্ম এই যে, ইহা কোন ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ এবং জল উৎপন্ন করে।

অ্যাসিড + ক্ষারক = লবণ + জল

[Acid + Base = Salt + Water]

সালফিউরিক অ্যাসিড + ক্যালসিয়াম অক্সাইড্ (ক্ষারক)
= ক্যালসিয়াম সালফেট (লবণ) + জল।

উপরোক্ত ধর্মগুলিকে একত্রে বলিলে অ্যাসিডের সংজ্ঞা এইরূপ হইবে—**অ্যাসিড মাত্রই হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক পদার্থ। উহার অণুতে এমন-এক বা একাধিক হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে, যাহা সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিকভাবে ধাতব পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায় এবং তদ্দ্বারা লবণ জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়।**

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিবে, জলীয় দ্রবণে সকল অ্যাসিডের ক্ষমতা এক হয় না। অর্থাৎ, সকল অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু সমান হয় না। যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয়-দ্রবণে হাইড্রোজেন পরমাণু কম উৎপন্ন করে তাহাদিগকে ক্ষীণ (week) অ্যাসিড বলে। ভিনেগার (অ্যাসিটিক অ্যাসিড), সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি জৈব অ্যাসিড সমূহ ক্ষীণ অ্যাসিড। আর, হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক, নাইট্রিক প্রভৃতি খনিজ অ্যাসিড খুবই তীক্ষ্ণ (strong)।

(B) **ক্ষারক** (Base)

জল যেমন আগুনকে নিভায়, ক্ষারকও তেমনি অ্যাসিডকে প্রশমিত করে। অর্থাৎ, ক্ষারক অ্যাসিডের বিপরীতধর্মী। ইহার লাল লিট্‌মাস-দ্রবণকে নীল করে। চুন, সোডা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ক্ষারকের উদাহরণ। **যে পদার্থ অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাকেই ক্ষারক** (base) **বলে**। ক্ষারক সাধারণতঃ কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হইয়া থাকে। যেমন, দস্তার (জিঙ্ক) অক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (চুনের জল) প্রভৃতি। অ্যামোনিয়া হাইড্রোক্সাইড ধাতব হাইড্রোক্সাইড না হইলেও উহা একটি ক্ষারক, কারণ অ্যামোনিয়াম মূলকটি (Radical) ধাতব-পরমাণুর ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এই ক্ষারক ধর্মকে কাজে লাগাইয়া আমরা ভেনিশিং রং (vanishing colour) তৈয়ারী করিয়া থাকি। ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

সব ক্ষারক কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না। যে সমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তাহাদিগকে **ক্ষার** (alkali) বলে।

ক্ষারককে চিনিয়া লইবার উপায় আছে। পরীক্ষা দ্বারা তাহা করা যায়। যথা :—

(i) ক্ষারকের জলীয়-দ্রবণ সাবান জলের মত পিচ্ছিল মনে হয়। একটি বীকারে কষ্টিক সোডার জল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, উহা পিচ্ছিল লাগিবে।

(ii) ক্ষারকের জলীয়-দ্রবণ লাল লিট্‌মাস দ্রবণকে নীল করে, মিথাইল অরেঞ্জ-দ্রবণের রং পরিবর্তন করে না এবং বর্ণহীন ফেনল্‌ফ্‌থ্যালীনকে লাল রং-এ পরিবর্তিত করে। ১০০ নং চিত্রের ন্যায় তিনটি বীকারে সামান্য পরিমাণ ক্ষারের দ্রবণ (কষ্টিক সোডা) লও। প্রথম পাত্রে কয়েক ফোঁটা

লাল লিট্‌মাস, দ্বিতীয় পাত্রে হলুদ রং-এর মিথাইল দ্রবণের কয়েক ফোঁটা এবং তৃতীয় পাত্রে বর্ণহীন ফেনল্‌প্‌থ্যালিনের কয়েক ফোঁটা দাও। দেখিবে
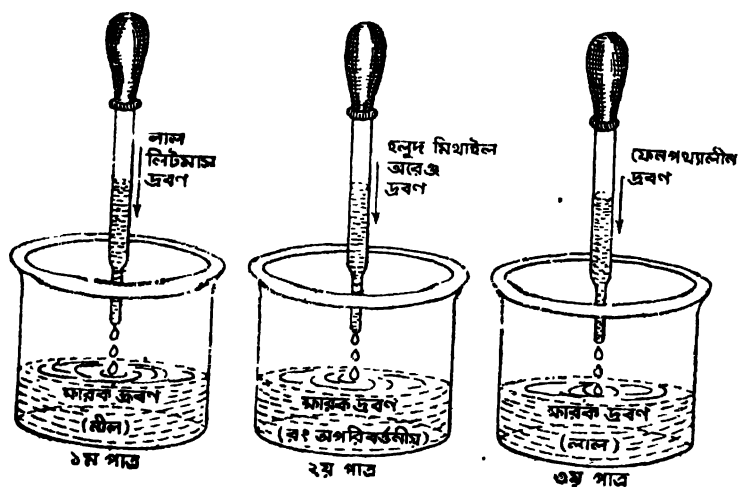
১০০ নং চিত্র

প্রথম পাত্রে লাল লিট্‌মাস নীল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পাত্রের মিথাইল অরেঞ্জের রং-এর পরিবর্তন হইবে না। আর তৃতীয় পাত্রে ফেনল্‌প্‌থ্যালিন লাল রং-এ পরিবর্তিত হইবে।

(C) লবণ (Salt)

কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেনকে ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলে যে যৌগিক বস্তু উৎপাদিত হয় তাহাকে লবণ (salt) বলে। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, অ্যাসিড ও ক্ষারকের পারস্পরিক রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল ভিন্ন যে যৌগিক পদার্থটি উৎপন্ন হয় তাহাকেই লবণ বলে। যেমন :—

সালফিউরিক অ্যাসিড + কষ্টিক সোডা = সোডিয়াম সালফেট্ + জল
(ক্ষারক) (লবণ)

হাউড্রোক্লোরিক অ্যাসিড + কষ্টিক সোডা = সোডিয়াম ক্লোরাইড + জল
(ক্ষারক) (লবণ)

নাইট্রিক অ্যাসিড + বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড = বেরিয়াম নাইট্রেট্ + জল
(ক্ষারক) (লবণ)
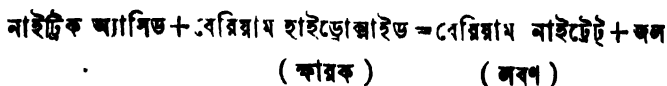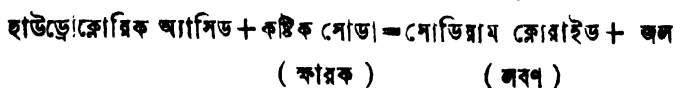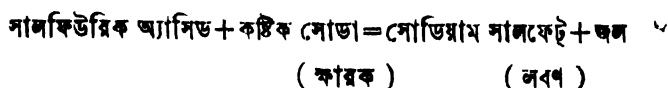
লবণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা,

(i) শমিত লবণ (Normal salt), (ii) আম্লিক লবণ (Acid salt) এবং (iii) ক্ষারকীয় লবণ (Basic salt)। শমিত লবণে প্রতিস্থাপনযোগ্য কোন হাইড্রোজেন থাকে না। যেমন, সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3)। আম্লিক লবণে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন থাকে। যেমন, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ($NaHCO_3$)। আর ক্ষারকীয় লবণে শমিত লবণের চাইতেও বেশী ক্ষারক মিশানো থাকে। অর্থাৎ ক্ষারকীয় লবণকে ক্ষারক ও শমিত লবণের মিশ্রণ বলা যাইতে পারে, যেমন, $Pb(OH)_2$ (ক্ষারক) ও $Pb(NO_3)_2$ (শমিত লবণ)-এর মিশ্রণ।

শমিত লবণের দ্রবণকে প্রশম-দ্রবণ বলে। এই দ্রবণে নীল অথবা লাল লিট্‌মাস কাগজ ডুবাইলে কাগজের রং-এর কোন পরিবর্তন হয় না।

ব্যবহারিক রসায়নে অম্ল, ক্ষার ও লবণ চিনিবার জন্য কয়েকপ্রকার রং ব্যবহার করা হয়। উহাদিগকে সূচক (indicator) বলে। সাধারণতঃ ফেনল্‌প্‌থ্যালিন, লিট্‌মাস রং, মিথাইল অরেঞ্জ রং প্রভৃতি সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে কয়েকটি নির্দেশক ও বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে তাহাদের বর্ণ-পরিবর্তন ছক আকারে দেখান হইল।

নির্দেশক	অ্যাসিড-দ্রবণে	ক্ষার দ্রবণে	শমিত লবণ বা প্রশমদ্রবণে
1. লিট্‌মাস	লাল	নীল	বেগুনী
2. মিথাইল অরেঞ্জ	লাল বা গোলাপী	হলুদ	কমলা
3. ফেনল্‌প্‌-থ্যালিন	বর্ণহীন	লাল	বর্ণহীন

টাইট্রেশন বা অনুমাপন :—

১০১ নং চিত্রের ন্যায় একটি বীকারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষারক-দ্রবণ (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড) লও। উহাতে কয়েক ফোঁটা সূচক (ফেনল্‌প্‌থ্যালিন) মিশাও। ইহাতে ক্ষারক দ্রবণের রং বেগুনী হইবে। এইবার অ্যাসিড ভর্তি লম্বা একটি সরু নল (ব্যুরেট) হইতে উহার নিচের ছিপিটি সামান্য খুলিয়া ফোঁটা ফোঁটা অ্যাসিড বীকারে ঢাল। যখন অ্যাসিড বীকারের ক্ষারকীয় দ্রবণকে সম্পূর্ণ প্রশমিত (neutralise) করিবে তখন ফেনল্‌প-থ্যালিন বর্ণহীন হইয়া যাইবে।

অ্যাসিড দ্বারা ক্ষারকীয় দ্রবণের প্রশমন
১০১ নং চিত্র

এইরূপে, সূচকের রং-এর পরিবর্তন দেখিয়া কত পরিমাণ ক্ষারককে প্রশমিত করিবার জন্য কত পরিমাণ অ্যাসিড প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা যায়। তোমরা বড় হইয়া এ বিষয় আরও বিস্তারিত জানিতে পারিবে।

ভেনিসিং রং (Vanishing colour) :—

তোমরা রং খেলার সময় বাজার হইতে একপ্রকার লাল রং কিনিয়া ব্যবহার কর যাহা জামাকাপড়ে দিলে জামাকাপড় রঙিন হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে রং আপনা হইতেই উঠিয়া যায়। ইহাকেই ভেনিসিং রং বলে। এই রংটি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সহিত ফেনল্‌প্‌থ্যালিন মিশাইয়া করা হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি ক্ষারক। তাই উহাতে ফেনল্‌প্‌-থ্যালিন দিলে সুন্দর লাল রং হয়। কিন্তু জামাকাপড়ে রং দেওয়ার পর অ্যামো-নিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ হইতে অ্যামোনিয়াম নামক পদার্থটি বাতাসে উড়িয়া যায়। ফলে, দ্রবণের ক্ষারত্ব আর থাকে না। ক্ষারত্ব না থাকায়
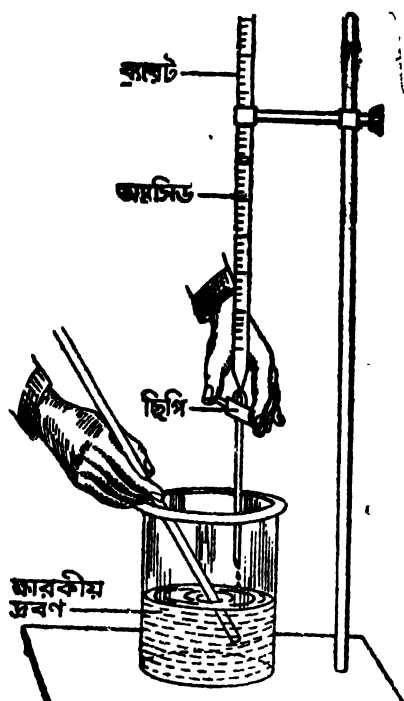
ফেনল্‌ফ্‌থ্যালিনও পুনরায় বর্ণহীন হইয়া যায়। এই জন্যই ভেনিসিং রং ক্ষণস্থায়ী হয়।

কৃষিকার্যে চুনের ব্যবহার :—

অনেক সময় নানা কারণে কোন স্থানের মাটি অম্লভাবাপন্ন (acidic soil) হইয়া ওঠে। কিন্তু মাটিতে অম্লগুণ অধিক হইলে উদ্ভিদের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হয়। মাটির এই অম্লভাব কমাইবার জন্য জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষারক পদার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। চুন একটি উত্তম ক্ষারক পদার্থ এবং উহা সুলভও বটে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে চুন পাওয়া যায়। সেই হেতু কম খরচে জমির অম্লভাব কমাইবার জন্য চুনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহা ছাড়া, উদ্ভিদের দেহের পুষ্টি সাধনের জন্যও ক্যাল্‌সিয়াম প্রয়োজন। মাটিতে চুন মিশাইলে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ক্যাল্‌সিয়ামও সরবরাহ করা হয়।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ (Some useful chemical compounds)

1. সাধারণ লবণ (common salt) বা সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium chloride) :—

আমরা খাদ্যের সংগে যে লবণ ব্যবহার করি তাহাকেই সাধারণ লবণ বলা হয়। উহার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। এই যৌগিক পদার্থটি সোডিয়াম নামক ধাতু এবং ক্লোরিণ নামক অ-ধাতুর মিশ্রণে তৈয়ারী।

সাধারণ লবণ সমুদ্র বা কোন কোন লোনা হ্রদের জল হইতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া লবণের খনিও আছে। খনিজ লবণকে রক্‌সল্ট (rock salt) বলা হয়। আমাদের দেশে উহা সৈন্ধব-লবণ নামে পরিচিত। জার্মানির স্টাসফুর্ট (Tassfurt) এবং পোল্যাণ্ডের উইলিস্কা (Wieliczka) লবণের খনির জন্য বিখ্যাত। আমাদের দেশে পাঞ্জাবের খেওড়া এবং রাজপুতনায় কলাবাগের লবণের খনিও প্রসিদ্ধ।

সমুদ্রের জলে গড়ে প্রায় 2·6% লবণ থাকে। অর্থাৎ, 2½ মণ সমুদ্রের জলে প্রায় 2½ সেরেরও বেশী লবণ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রতীরে বিস্তৃত এবং অগভীর পুকুর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সমুদ্রের জল রাখা হয়। (১০২ নং চিত্র দেখ) রৌদ্রতাপে জল বাষ্পীভূত হইয়া পুকুরের জল ক্রমে ঘন দ্রবণে পরিণত হয়। পরে যথাসময়ে তাহা হইতে দানার আকারে লবণ বাহির

হইয়া পড়ে। এই দানাগুলিকে একত্রে জমাইয়া সামান্য জলে ধুইয়া শুকান হয় এবং বাজারে বিক্রয় করা হয়।

লবণের ব্যবহার বহুবিধ। খাদ্য হিসাবে সকলেই লবণ ব্যবহার করে। খাদ্যে লবণ না দিলে উহা যে কেবল বিস্বাদই হয় তাহা নহে, পরিপাকেও ব্যাঘাত ঘটায়। আমাদের পাকস্থলীতে লবণের সাহায্যেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
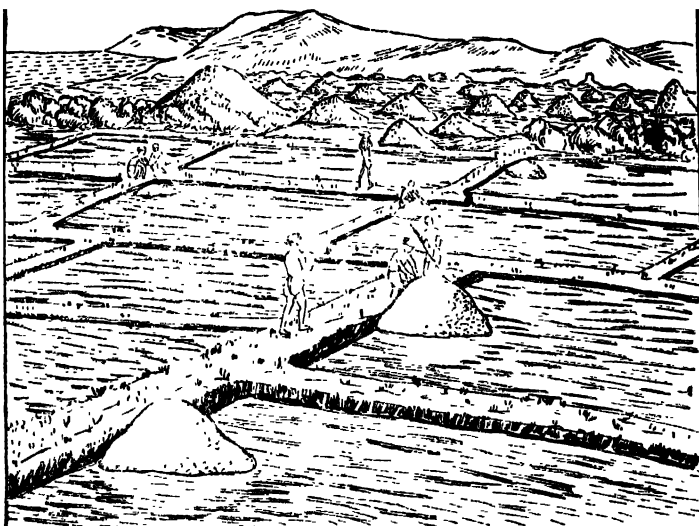
সামুদ্রের জল বাষ্পীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইতেছে
১০২নং চিত্র

তৈয়ারী হয়। তাহা ছাড়া মাছ, মাংস প্রভৃতি লবণের সাহায্যে সংরক্ষিত হয়। কাপড় কাচার সোডা, কস্টিক সোডা, ধাতব সোডিয়াম, ক্লোরিণ প্রভৃতি পদার্থ লবণ হইতে প্রস্তুত করা যায়।

2. কাপড় কাচার সোডা (Washing Soda) বা সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium Carbonate)—

সোডিয়াম কার্বনেট একটি যৌগিক পদার্থ। বাজারে উহা কাপড় কাচার সোডা নামে পরিচিত। রাসায়নিক ভাষায় উহাও এক প্রকার লবণ। উহাতে তিনটি মৌলিক পদার্থ আছে। যথা, সোডিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেন।

প্রাচীনকালে সামুদ্রিক উদ্ভিদকে পোড়াইয়া উহার ভস্ম হইতে সোডিয়াম

কার্বনেট প্রস্তুত করা হইত। বর্তমানে 'সাধারণ লবণ' হইতেই নানাপ্রকার পদ্ধতিতে এই প্রয়োজনীয় পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। **সলভে পদ্ধতি বা অ্যামোনিয়া সোডা পদ্ধতির** প্রচলন আজকাল সমধিক। এই পদ্ধতিতে তিনটি কাঁচামালের দরকার হয়, যথা—সাধারণ লবণ, অ্যামোনিয়া এবং চুনাপাথর। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণ লবণের গাঢ় দ্রবণে অ্যামোনিয়া এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালিত করিলে প্রথমে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট প্রস্তুত হয়। পরে, সোডিয়াম বাই-কার্বনেটকে উত্তাপ দিয়া সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করা হয়।

কাচ, সাবন, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সোডিয়াম কার্বনেটের প্রয়োজন হয়। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। জামাকাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য এবং জলের খরতা (hardness) দূরীকরণে ইহার প্রয়োজন হয়। খাইবার সোডা বা পাউরুটি প্রস্তুত করিবার জন্য যে বেকিং সোডা (baking soda) ব্যবহৃত হয় তাহাকে সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট বলে। উহাও সোডিয়াম কার্বনেট হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক কাজে এই বস্তুটির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

(3) **কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড**—(Caustic Soda or Sodium hydroxide)—এই যৌগিক পদার্থটি একটি তীব্র ক্ষার (alkali) পদার্থ, ইহা লবণ নহে। সোডিয়াম, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত।

ব্যবহারিক জীবনে কষ্টিক সোডার বহুল ব্যবহার আছে। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে ইহার প্রস্তুতি ভারী শিল্পের (heavy industries) অন্তর্গত। কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করিবার দুইটি পদ্ধতি আছে—(i) ক্ষারীকরণ পদ্ধতি (Causticising process) (ii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (electrolytic process)।

প্রথম পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড় কাচার সোডা) জলে গুলিয়া উপযুক্ত পরিমাণে চুন মিশাইতে হয়। তারপর ঐ মিশ্রণে জলীয় বাষ্প (steam) পরিচালনা করিলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহার ফলে কষ্টিক সোডা উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত লবণ-জলের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) বিশ্লেষণ দ্বারা সস্তায় প্রচুর পরিমাণে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করা হয়।

ইহা সাবানের মত পিচ্ছিল। সহজেই জলে দ্রবণীয়। খুব তীব্র ক্ষার, হাতে রাখিলে হাত পুড়িয়া যায়।

সাবান, কাগজ ও কৃত্রিম রেশম শিল্পে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি শোধন করিবার জন্য এবং ল্যাবরেটরীতে বিকারক (Reagent) হিসাবেও ইহা ব্যবহার করা হয়।

(4) চুন (lime) বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide) ঃ চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি সুলভ ক্ষারক (Base)। এই যৌগিক পদার্থটি ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। বহুপ্রকার খনিজ পদার্থে ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়—যেমন, চুনাপাথর (lime stone), চক (chalk), মার্বেল পাথর (marble) ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক, শাঁক প্রভৃতির কঠিন খোলা (shell) ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়া গঠিত বলিয়া উহাদিগকে পোড়াইয়াও চুন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে চুনাপাথর অথবা শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতির খোলা পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত করা হয়। দুই রকম পদ্ধতিতে এই চুন প্রস্তুত করা যায়—যথা, সবিরাম পদ্ধতি এবং অবিরাম-পদ্ধতি।

(i) সবিরাম-পদ্ধতি—

একটি ইটের চুল্লী বা ভাঁটি প্রস্তুত করিয়া উহা শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতির খোলা বা চুনাপাথরের টুকরো দ্বারা ভর্তি করা হয়। তারপর এই চুল্লীর তলদেশে কাঠ বা কয়লার দ্বারা আগুন সৃষ্টি করা হয়। তিন চার দিন পর দেখা যায়, চুনাপাথর পুড়িয়া চুনে পরিণত হইয়াছে। ভাঁটি শীতল হইলে চুন বাহির করিয়া পুনরায় উহাকে চুনাপাথর দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে কিছু সময় বিরাম দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে সবিরাম-পদ্ধতি বলে।

(ii) অবিরাম-পদ্ধতি—

এই পদ্ধতিতে কোন বিরামের ব্যবস্থা নাই বলিয়া ইহাকে অবিরাম-পদ্ধতি বলে। ইহাতে ইটের দ্বারা গম্বুজের মত একটি চুল্লী তৈরী করা হয়। ১০৩ নং চিত্র দেখ। উহার নিম্নাংশে, এক পার্শ্বে আগুন জ্বালাইবার উনান থাকে। অপর পার্শ্বে, চুন বাহির করিবার পথ থাকে। আর উপরে ফাঁকা

মুখ (hopper) দিয়া মাঝে মাঝে চুনাপাথর ঢালা হয়। চুল্লীর ভিতরে চুনাপাথর পুড়িয়া চুনে পরিণত হইলে নিচের নির্গম পথ দিয়া চুন বাহির
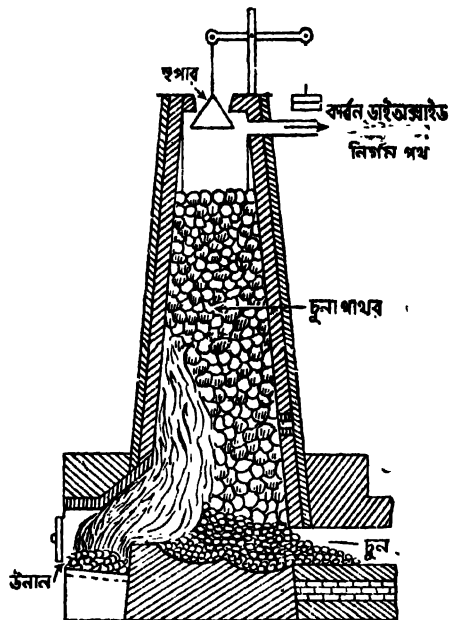
১০৩ নং চিত্র—চুনের ভাঁটি

করিয়া লওয়া হয়। এই প্রকারে চুল্লীর কাজ অনবরত চলিতে থাকে, আগুন নিভাইবার প্রয়োজন হয় না।

চুনের ধর্ম :—

চুন সাদা ও অনিয়তাকার (amorphous) কঠিন পদার্থ। তাপ প্রয়োগ করিলে সহজে গলে না, বরং ভাস্বর হইয়া উঠে। তবে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে অতি উচ্চ তাপে চুন গলানো যায়। জলের প্রতি চুনের স্বাভাবিক ও প্রবল আসক্তি আছে। চুন খুব জল শোষণ করে।

চুনের ব্যবহার :—

চুন জীবাণুনাশক হিসাবে, জলীয় বাষ্প শোষনকারী (desicating agent) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ধাতু শিল্পে বিগালকরূপে (flux) উহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তাহা ছাড়া সিমেন্ট, কংক্রীট, কাঁচ বিরঞ্জক (bleaching

powder) কষ্টিক সোডা, ক্যাল্‌সিয়াম কারবাইড্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চুন ব্যবহৃত হয়। চর্মশিল্পে চুনের প্রয়োজন হয়। জমিতে সার হিসাবে চুন ব্যবহার করা হয়। চুনকে উত্তপ্ত করিয়া এক প্রকার আলোক পাওয়া যায় তাহাকে চুনের-আলোক (lime light) বলে। পরিষ্কার চুনের জল শিশুদিগের পেটের অসুখে খাওয়ান হয়। খর জলকে মৃদু জলে পরিণত করা, বাড়ীর দেওয়াল রং করা, পানের সংগে খাওয়া প্রভৃতি নানাবিধ কাজে চুনের ব্যবহার হয়।

কৃষিকার্যে কয়েকটি সোরাজান জাতীয় যৌগিক (Some Nitrogeneous Compounds in Agriculture) পদার্থের ব্যবহার :—

প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের জন্য নাইট্রোজেন-খাদ্য অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও উদ্ভিদ্‌ তাহা সোজাসুজি গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদ্‌ মাটি হইতে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বার বার জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য মাটির নাইট্রোজেন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহার করিতে হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, প্রভৃতি নাইট্রোজেন ঘটিত সার। নিম্নে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট্‌ সারের আলোচনা করা হইল।

(ক) অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate) :—

ইহা এক প্রকার লবণ। ইহাতে চারটি মৌল পদার্থ আছে—যথা, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফার বা গন্ধক ও অক্‌সিজেন।

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে অত্যধিক চাপে ও তাপে উত্তপ্ত করিলে এই দুইটি গ্যাস যুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়া গ্যাস সোজাসুজি লঘু-সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে পরিচালনা করিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করা হয়।

ভারতের সিন্ধ্রির সার কারখানা বিখ্যাত। সেখানে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের জন্য কোক কয়লা, বাতাস, জল (ষ্টীমরূপে) এবং ক্যালসিয়াম সালফেট কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কোক কয়লা 1000°—1200°C-এ উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া বাতাস ও ষ্টীম চালনা করিলে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইডের

গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যায়। তাহা হইতে নাইট্রোজেন গ্যাসকে আলাদা করা হয় এবং হাবার-বশ্ পদ্ধতিতে (Haber-Bosch process) এই দুই গ্যাসকে একত্রে মিশাইয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। তারপর ক্যাল্সিয়াম সালফেটের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাকে অ্যামোনিয়াম সালফেটে পরিবর্তিত করা হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। উহা জলে দ্রবণীয় এবং প্রধানতঃ জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ফট্‌কিরি প্রস্তুত করিতে, ল্যাবরেটরিতে বিকারক হিসাবে এবং অন্যান্য অ্যামোনিয়ার লবণ প্রস্তুতকরণেও উহার ব্যবহার আছে।

(খ) **অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট** (Ammonium Nitrate) :—

অ্যামোনিয়াম গ্যাস দ্বারা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করিলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের দানা পৃথক হইয়া যায়।

অ্যামোনিয়াম্ নাইট্রেট লবণ একটি অস্থায়ী যৌগিক পদার্থ এবং জলে দ্রবণীয়। ইহা বিস্ফোরক (Explosives) প্রস্তুতিতে, জমির সার হিসাবে এবং মিশ্র পদার্থকে জমাট বাঁধানোর জন্য (in freezing mixture) ব্যবহৃত হয়।

কৃষিযোগ্য মৃত্তিকার কয়েকটি অত্যাবশ্যক পদার্থ :—

মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে জমিতে যে সকল অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক পদার্থ থাকা প্রয়োজন তাহার মধ্যে দশটি প্রধান। যথা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ, **নাইট্রোজেন,** কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। এই দশটি পদার্থকে 'মুখ্য পদার্থ' (Major Elements) বলা হয়। ইহাদের কোনটির অভাব ঘটিলে গাছ বাড়ে না, এমন কি বাঁচিতেও পারে না। কপার, বোরণ, জিঙ্ক প্রভৃতি পদার্থও উদ্ভিদের অল্প পরিমাণে লাগে। ইহাদিগকে গৌণ পদার্থ (Minor Elements) বলা হয়। ঐ পদার্থগুলি নানারূপ যৌগিক পদার্থরূপে মাটির মধ্যে সাধারণতঃ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যদি কোনটি জলে দ্রবণীয় না হয় তবে উদ্ভিদ্ নিজেই শিকড় বা মূল হইতে একপ্রকার অম্লরস্-বাহির করিয়া

তাহাদিগকে জলে দ্রবণীয় পদার্থে রূপান্তরিত করিয়া লয়। তবে সব মাটিতে এইসব পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। সেই জন্য ইহাদের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে আমরা নানাপ্রকার কৃত্রিম সার ব্যবহার করিয়া থাকি।

উদ্ভিদ্ কর্তৃক নাইট্রোজেন-বন্ধন (Fixation of Nitrogen by Plants) :

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের এক অপরিহার্য উপাদান হইল নাইট্রোজেন। বায়ুতে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এই প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কেহই বায়ুমণ্ডল হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। নানাপ্রকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য যৌগিক পদার্থ রূপে বন্ধন প্রাপ্ত (fixed) হয়। বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনের এইরূপ বন্ধনকেই '**নাইট্রোজেন-বন্ধন**' (Fixation of Nitrogen) বলে। নিম্নে ইহার বিষয় আলোচনা করা হইল।

(i) **সিমজাতীয় উদ্ভিদ্** (laguminous plants) **কর্তৃক নাইট্রোজেন বন্ধন :**—ছোলা, মটর, কলাই, সিম প্রভৃতি সিমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে এক প্রকার গুটি থাকে। ঐ গুটিগুলির মধ্যে 'রিজোবিয়াস র‍্যাভিসিকোলা নামক একপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া বা জীবাণু বাস করে। উহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী পদার্থে পরিণত করিয়া উদ্ভিদ্‌কে উপহার দেয়। উদ্ভিদও সেই নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যের বিনিময়ে জীবাণুগুলিকে শর্করা (carbohydrate) জাতীয় খাদ্য প্রদান করে। এইরূপ পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে উদ্ভিদ প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। তবে, এইভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে সোজাসুজি নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্ জগতে খুব কমই প্রবেশ করে, কারণ সিম-জাতীয় উদ্ভিদ্ তো উদ্ভিদ্ জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু কৃষিকার্যে ইহাদের অবদান যথেষ্ট কারণ ইহাদের চাষে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **শৈবাল** (Algae) **জাতীয় উদ্ভিদ্ কর্তৃক নাইট্রোজেনের বন্ধন :**—আধুনিক কালের গবেষণা হইতে জানা গিয়াছে যে অনুকূল অবস্থায় সকল প্রকার শৈবালই বায়ুমণ্ডল হইতে নাইটোজেন 'বন্ধন' করিতে পারে। ধানের জলাজমির অসংখ্য শৈবাল বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ধানগাছগুলিকে দেয়। এইজন্য শৈবাল যুক্ত জলাজমিতে ধানচাষ ভাল হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate)

অ্যামোনিয়াম সালফেট একটি নাইট্রোজেন-ঘটিত সার। উহা দেখিতে বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থের ন্যায়। ইহা সস্তা অথচ সার হিসাবে খুব ভাল। তাই ভারতে ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের সুবিখ্যাত সিন্ধ্রির সার কারখানায় প্রতিদিন প্রায় এক হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইতেছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট নানা রকম পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়। আমরা এখানে সিন্ধ্রিতে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সিন্ধ্রির কারখানায় যে সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নরূপ :

(i) কোক কয়লা (coke)

(ii) বাতাস

(iii) জলীয় বাষ্প

(iv) জিপ্সাম (Calcium Sulphate)। ইহা খনি হইতে পাওয়া যায়।

প্রথমে কোক 1000°—1200°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বাতাস ও জলীয় বাষ্প চালনা করিতে হয়। ইহাতে অন্যান্য পদার্থের সহিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইয়া আসে। তারপর নানা জটিল উপায়ে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস দুইটিকে পৃথক করিয়া আনা হয়।

এইবার প্রতি এক ভাগ আয়তনের নাইট্রোজেনের সহিত তিনভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন মিশাইয়া 350 গুণ বায়ুমণ্ডলের চাপে 550°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিলে এই গ্যাস দুইটি মিশিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। এইভাবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াকে জলে দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে কার্বনডাই-অক্সাইড মিশাইলে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হয়। অ্যামোনিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে জিপ্সামের (ক্যালসিয়াম সালফেট) চূর্ণ মিশাইলে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। পরে অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ হইতে দানারূপে পৃথক হইয়া যায়। তাহাকে ছাঁকিয়া ও শুকাইয়া বাজারে চালান দেওয়া হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারীর জন্য বিভিন্ন স্তরে কি কি জিনিষ লাগে তাহা নিম্নের ছকে দেখান হইল :

কোক+ বাতাস+ ষ্টীম	→	একভাগ নাইট্রোজেন+ তিনভাগ হাইড্রোজেন উচ্চচাপ ও তাপ	→	অ্যামোনিয়াম +কার্বনডাই অক্সাইড +জিপ্‌সাম চূর্ণ	→	দানারূপে অ্যামো-নিয়াম সালফেট

আরও কয়েক প্রকার সারের ব্যবহার :—

অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যতীত আরও নানাপ্রকার রাসায়নিক সারের (Chemical Fertilisers) ব্যবহার আছে। উহাদের মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট (চিলি-শোরা), পটাসিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট. ইউরিয়া, সুপার ফস্‌ফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট-নাইট্রেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে **অজৈব** (inorganic) সার বলে।

ইহাছাড়া প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে নানাপ্রকার গৃহজাত সার ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের বেশীর ভাগই গাছপালা, আবর্জনা প্রভৃতি 'অবশেষ দ্রব্যাদি' (waste products) হইতে তৈয়ারী হয়। ইহাদিগকে **জৈবসার** (organic manures) বলে। খামারের সার, কম্‌পোষ্ট সার, খোল জাতীয় সার, গোবর, সবুজ সার, ছাই, হাড়ের গুড়া, জীবজন্তুর রক্ত, মলমূত্র প্রভৃতি এই জাতীয় সারের অন্তর্গত।

জমিতে বার বার রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির অম্লতা বাড়িয়া যায়। তাই মাঝে মাঝে জমিতে চুণ ব্যবহার করা দরকার। তাছাড়া অতিরিক্ত সার ব্যবহারে ফসলের ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ জৈব সারের সঙ্গে অজৈব সার উপযুক্ত পরিমাণে মিশাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

খাদ্য (Food)

আমাদের দেহযন্ত্রকে একটি ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কয়লা না দিলে যেমন ইঞ্জিন চলে না, খাদ্য না পাইলে আমাদের দেহযন্ত্রও তেমন অচল হইয়া যায়। কয়লা পুড়াইয়া যেমন ইঞ্জিনের তাপশক্তি পাওয়া যায়, আমাদের খাদ্যও তেমন পাচক রসের সাহায্যে জীর্ণ হইয়া দেহের বিভিন্ন কোষে যায় এবং সেখানে অক্সিজেনের সহিত মৃদু দহনক্রিয়া ঘটায়। ফলে

দেহে তাপের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন কার্য করিয়া আমাদের দেহ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। খাদ্যই ঐ ক্ষয় পূরণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে।

মনে রাখিবে, যে কোন আহার্যই খাদ্য নহে। যে সকল সামগ্রী আহার করিলে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় থাকে এবং কাজ করিবার শক্তি জন্মায়, তাহাদিগকেই আমরা **খাদ্য** (food) বলি।

সাধারণতঃ আমরা প্রাণিজ, উদ্ভিজ ও খনিজ এই তিন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। যে কোন শ্রেণীর খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান থাকা আবশ্যক—(i) প্রোটিন (Protein), (ii) শ্বেতসার ও শর্করা (Carbohy-), drate), (iii) চর্বি (Fat), (iv) লবণ (Salt), (v) জল (Water), (vi) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার উপাদানের পৃথক পৃথক আলোচনা করা হইল।

(i) **প্রোটিন** (Protein) :—

মাছ, মাংস, ডিমের শ্বেতাংশ, দুধ, ছানা, ডাল ইত্যাদিতে প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাদ্য থাকে। প্রোটিন একটি যৌগিক পদার্থ। উহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে। কখনো কখনো সালফার এবং
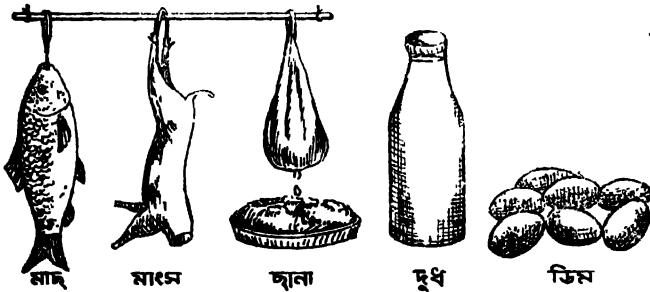
প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

১০৪নং চিত্র

ফস্‌ফরাসও থাকে। আমাদের দেহের পক্ষে প্রাণী-জাতীয় প্রোটিন বেশী মূল্যবান। কারণ, উদ্ভিজ্জ জাতীয় প্রোটিন আমরা সহজে পরিপাক করিতে পারি না। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করে এবং পেশী গঠন ও বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে, তাহা ছাড়া, ইহা পরোক্ষভাবে দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া

কর্মশক্তি ও মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বাড়ায়। প্রোটিন কথাটির অর্থ—প্রথম (Protos=first)। সত্যই, দেহের কোষ গঠনে অথবা উহার সংস্কার সাধনে প্রোটিনের স্থান সর্বপ্রথম।

(ii) **শ্বেতসার ও শর্করা** (Carbohydrate) :—

আটা, চাল, সাগু, বার্লি, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য। চিনি, গুড়, মধু, মিছরি, আম, খেজুর রস, নানারকম ফলের রস প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা বা চিনি জাতীয় খাদ্য থাকে। শ্বেতসার জীর্ণ হইলে শর্করায় পরিণত হয়। এই জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে।

শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য

১০৫ নং চিত্র

শর্করার সাহায্যেই তাপ ও কর্মশক্তি উৎপন্ন হয়। বেশী পরিমাণ শ্বেতসার খাইয়া হজম করিতে পারিলে শরীরে চর্বির পরিমাণ বর্ধিত হয়। ফলে, সহজেই মোটা হওয়া যায়। শাক, পাতা ইত্যাদির শ্বেতসারের সংগে সেলুলোজ নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। তাহা জীর্ণ হয় না বলিয়া মলের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

(iii) **চর্বি (Fat)** :—

মাখন, ঘৃত, তৈল, প্রাণীর চর্বি, দুধ প্রভৃতি হইতে চর্বি-জাতীয় খাদ্য পাওয়া

চর্বি জাতীয় খাদ্য

১০৬ নং চিত্র

যায়। চর্বির উপাদান অঙ্গার, (carbon) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। চর্বির

দহনে দেহের উত্তাপ জন্মে। উহা শরীরে মেদরূপে জমা থাকে। উহা যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের রস নিঃসরণে সাহায্য করে।

উপবাসের সময় বা রোগের সময় বা খাদ্যের অভাব ঘটিলে জমা চর্বি দেহের ইন্ধনের কাজ করে। আমরা সারাদিন যে পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তাহার অন্ততঃ পাঁচ ভাগের এক ভাগ চর্বি-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। শ্বেতসার, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া প্রায় একরূপ তাহা হইলেও প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যই আমাদের আবশ্যক।

(iv) জল (water) :—

খাদ্যবস্তুকে তরল করিয়া পরিপাকযোগ্য করা, রক্তকে তরল রাখা, দেহের দূষিত পদার্থকে ঘর্ম ও মূত্রাকারে নিকাশ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য জলের বিশেষ দরকার। এইজন্য প্রতিদিন গড়ে অন্ততঃ আড়াই সের জল পান করা উচিত।

(v) লবণ (Salt) :—

অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার লবণের আবশ্যক। নানাপ্রকার শাকসব্জি, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ঘটিত লবণ থাকে। আমরা যে সাধারণ লবণ খাই তাহাও লবণজাতীয় খাদ্যের কাজ করে।

(vi) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) :—

এতক্ষণ আমরা খাদ্যের প্রধান পাঁচটি উপাদানের কথা আলোচনা করিলাম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পাঁচটি উপাদানের একটিও আমাদের কাজে লাগিবে না যদি তাহাদের সংগে ভিটামিন না থাকে। ভিটামিন শূন্য খাদ্য প্রাণহীন পুতুলের সমান। তাই ভিটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলা হয়। ভিটামিনের অভাবে আমরা সত্যই প্রাণহীন হইয়া পড়ি। ইহার অভাবে বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট্‌স প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। তবে আশার কথা এই যে সবরকম টাটকা শাকসব্জি, ফলমূল ও খাবারের মধ্যেই কম বেশী ভিটামিন থাকে। আজ পর্যন্ত ষোল রকমের ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

তবে দেহের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য এ, বি, সি, ডি, ই ভিটামিন হইলেই চলে। নিচে ভিন্ন ভিন্ন ভিটামিনের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।

ভিটামিন-এ (A)—ইহা তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয়। দুধ, মাখন, চর্বি, ডিমের-কুসুম, গাজর, আম, কমলালেবু, কড্‌লিভার তৈল, পালংশাক, টমেটো ইত্যাদিতে এই ভিটামিন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'এ'
১০৭ নং চিত্র

এ-ভিটামিন আমাদের শরীরে টিস্যু গঠনের পক্ষে এতো প্রয়োজনীয় যে শৈশবে ইহার অভাব ঘটিলে চক্ষুরোগ, দাঁতের পাইওরিয়া (Pyorrhoea), চামড়ার রুক্ষতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। শিশুদের খাবারের সঙ্গে কড্‌লিভার তৈল দিলে এ-ভিটামিনের অভাব পূরণ হয়। রান্নায় এ-ভিটামিন তেমন নষ্ট হয় না।

ভিটামিন-বি (B)—ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডাল, আটা, পালংশাক, টমেটো, দুধ, দই, বাঁধাকপি, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতিতে এই ভিটামিন থাকে। ইহা জলে দ্রবণীয়। এর অভাবে শরীরের গঠন ও দহনক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে,

ভিটামিন 'বি'
১০৮ নং চিত্র

বেরিবেরি. ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও চর্মরোগ দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এ জাতীয় অনেকগুলি বিশুদ্ধ ভিটামিন পৃথক করা সম্ভব হইয়াছে ।

ভিটামিন-সি (C)—ইহা জলে দ্রবণীয়। সকল প্রকার লেবু, কমলালেবু, টমেটো, পালংশাক, মিষ্টি ফল, মূলা, আনারস, লঙ্কা, বাঁধাকপি প্রভৃতি খাদ্যে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। আমলকিতেও ইহা যথেষ্ট
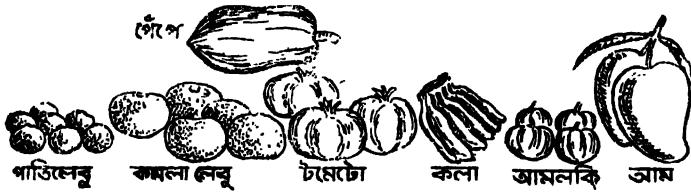
ভিটামিন 'সি'
১০৯ নং চিত্র

পরিমাণে থাকে। খাদ্য ফুটাইলে এই ভিটামিনের বেশীর ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহার অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

ভিটামিন-ডি (D)—ইহা তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয়। ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম, মাছের যকৃতের তৈল, কড্‌লিভার তৈল, নারিকেল, মটরশুঁটি প্রভৃতিতে

ভিটামিন 'ডি'
১১০ নং চিত্র

এই ভিটামিন পাওয়া যায়। সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মি এই ভিটামিনের উৎস। এই ভিটামিন অস্থি, দন্ত ও পেশীর পোষক। ইহার অভাবে শিশুদের অস্থি বিকৃতি বা রিকেটস এবং বড়দের দাঁতের রোগ হয়।

ভিটামিন-ই (E)—ইহা তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয়। কলা, মাখন, ঢেঁকিছাটা চাল, ডিম, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, গম, যব প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ভিটামিন 'ই'

১১১ নং চিত্র

সন্তানবতী মায়ের জন্য এই ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয়। ইহা মাতৃস্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি করে।

ভিটামিন-কে (K)—ইহা তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয়। যকৃত, মাছ,

ভিটামিন 'কে'

১১২ নং চিত্র

মাংস, শাক-সব্‌জি, টমেটো প্রভৃতিতে এই ভিটামিন আছে। ইহা রক্তকে জমাট বাঁধাইতে সাহায্য করে।

শুষ্ক শাক-সব্‌জী, ভেজিটেবিল ঘি, কলে ছাঁটা চাল, কলের ময়দা প্রভৃতিতে ভিটামিন প্রায় থাকে না। এইসব খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

নিম্নের তালিকায় কোন্ ভিটামিন কি বস্তুতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের কি কাজ তাহা দেখান হইল।

ভিটামিনের নাম	কাজ	কি কি বস্তুতে পাওয়া যায়
'A'	1. শরীর গঠন, ক্ষয় পূরণ ও রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়। ইহার অভাবে চক্ষুরোগ হয়।	1. ঘি, দুধ, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস, পালংশাক, গাজর, টমেটো, কডলিভার তেল ইত্যাদিতে।
'B'	2. এর অভাবে বেরি-বেরি, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ কাঠিন্য ও চর্মরোগ দেখা দেয়।	2. ঢেঁকিছাটা চাল, আটা, ঘি, মাখন, মাংস, ডিম, টমেটো, পালং-শাক, গাজর, কাঁচকলা ইত্যাদিতে।
'C'	3. রক্ত ও দেহকে সুস্থ রাখে। এর অভাবে স্কার্ভি ও দাঁতের রোগ দেখা দেয়।	3. সর্বপ্রকার লেবু, টমেটো, অঙ্কুরিত ছোলা, আমলকি ইত্যাদিতে।
'D'	4. অস্থি দন্ত ও পেশীর পোষক। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট্স রোগ হয়।	4. দুধ, ঘি, মাখন, কড্‌লিভার তেল, মটরশুঁটি, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ইত্যাদিতে।
'E'	5. সন্তানবতী মায়ের প্রয়োজন। ইহা মাতৃ স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি করে।	5. কলা, মাখন, ঢেঁকিছাটা চাল, যব চূর্ণ, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, লেটুস্ শাক ইত্যাদিতে।
'K'	6. রক্ত জমাট বাঁধার সাহায্য করে।	6. যকৃৎ, মাংস, মাখন শাকসব্‌জি ও টমেটো ইত্যাদিতে।

নিম্নে কয়েকটি সাধারণ খাদ্য ও তাহাদের উপাদানের (কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন্) শতকরা পরিমাণ দেওয়া হইল।

খাদ্য	কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট	প্রোটিন
চাল—	78	1	8
গম—	72·2	1·7	12·1
ডাল (মুসুর)—	59·7	·7	25·1
আলু—	22·9	·1	19·7
পেঁয়াজ—	13·2	·1	1·8
নারিকেল—	13	41	4·5
মাংস—	·5	13·8	18·5
ডিম—	·7	13·7	13·5
দুধ—	4·3	3·6	3·3
আম (পক্ক)	1·8	·1	·6
কলা (পক্ক)	11·1	·9	·1

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নোক্ত পদগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

অম্ল, ক্ষার, লবণ ও নির্দেশক বা সূচক (indicator)।

২। লবণ কাহাকে বলে ? লবণ কয় প্রকার ? সাধারণ লবণ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। অতি পরিচিত কয়েকটি লবণের নাম কর এবং উহাদের ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। কয়েকপ্রকার নির্দেশকের নাম কর এবং অম্ল, ক্ষার এবং লবণের দ্রবণে কোন্ নির্দেশকের কি রং হইবে তাহা একটি ছকে বর্ণনা কর।

৫। ক্ষার ও অ্যাসিডের ধর্ম কি কি ?

৬। একটি দ্রবণ ক্ষার কি অ্যাসিড তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে

৭। জৈব-অ্যাসিড এবং খনিজ-অ্যাসিড কাহাকে বলে ? কয়েকপ্রকার তীব্র ও ক্ষীণ অ্যাসিডের নাম কর।

৮। লেবু, দধি এবং কালো পিঁপড়ার দেহে কি প্রকার অ্যাসিড থাকে লিখ।

৯। জমিতে মাঝে মাঝে চুণ ব্যবহার করা হয় কেন ?

১০। ভেনেসিং রং (vanishing colour) সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১১। সাধারণ লবণের উৎস কি ? সমুদ্রের জল হইতে কি প্রকারে উহা পাওয়া যায়। উহার ব্যবহার কি কি ?

১২। চুনাপাথর হইতে কিভাবে চুন প্রস্তুত হয়, তাহা বর্ণনা কর। চুন আমাদের কি কি উপকারে লাগে ? কৃষিকার্যে চুনের উপকারিতা কি ?

১৩। কাপড় কাচার সোডা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৪। কষ্টিক সোডার ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৫। নিম্নলিখিত যৌগিক পদার্থগুলি সম্বন্ধে টীকা লিখ :—

অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট্, সোডিয়াম কার্বনেট।

১৬। জমিতে সার দেওয়া হয় কেন ? বিভিন্ন প্রকার সার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৭। কি করিয়া বায়ুর নাইট্রোজেন বন্ধনপ্রাপ্ত (Fixation of Nitrogen) হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ।

১৮। কৃষিযোগ্য ভূমির প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির নাম কর।

১৯। সিমজাতীয় উদ্ভিদ্ কি প্রকারে বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ?

২০। খাদ্য কাহাকে বলে ? আমাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি ? খাদ্যের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির নাম কর।

২১। প্রোটিন, শ্বেতসার ও চর্বি-জাতীয় খাদ্য আমরা কি কি জিনিষ হইতে পাইয়া থাকি ? উহারা আমাদের দেহগঠনে কিভাবে সাহায্য করে বর্ণনা কর।

২২। খাদ্যে জল ও লবণের প্রয়োজনীয়তা কি ?

২৩। ভিটামিন কাহাকে বলে ? কোন্ ভিটামিনের অভাব কি কি উপায়ে পূরণ করা যায় লিখ।

২৪। নিম্নলিখিত খাদ্যগুলির কোন্‌টির মধ্যে কি জাতীয় ভিটামিন অধিক পরিমাণে আছে বল :—

কড্‌লিভার তৈল, গাজর, পালংশাক, পাতিলেবু, আমলকি, ঢেঁকিছাটা চাল।

২৫। টীকা লিখ :—

খাদ্যপ্রাণ, বেরিবেরি, ভিটামিন-কে (K), প্রোটিন।

Objective Test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

(A) 'Yes' or 'No' type test :

যে বাক্যগুলি সত্য তাহার ডাইনে হ্যাঁ এবং যেগুলি ভুল তাহার ডাইনে 'না' লিখিয়া উত্তর কর :—

(i) কষ্টিক সোডা লাল লিটমাসকে নীল করে।

(ii) চুনের জল একটি ক্ষার।

(iii) জলের একটি উপাদান হাইড্রোজেন সুতরাং উহা একটি অ্যাসিড্।

(iv) বেরিবেরি খাদ্যের একপ্রকার উপাদান।

(v) ভিটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলা হয়।

(B) Recall type test :

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পুরণ কর।

(i) ভিনেগার একপ্রকার—— ।

(ii) লিট্মাস কাগজ ——হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(iii) ভারতের——কারখানায় অ্যামোনিয়াম সালফেট সার প্রস্তুত হয়।

(iv) আকাশে বিদ্যুৎ মোক্ষণের সময় নাইট্রোজেন——সহিত মিলিত হয়।

(v) গাছপালা হইতে যে সার প্রস্তুত হয় তাহাকে—— বলে।

(C) Multiple-choice type test :

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পার্শ্বে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যে উত্তরটি নির্ভুল মনে কর তাহার নিচে দাগ দাও।

(i) ফেনল্ফ্থ্যালিন অ্যাসিড দ্রবণে দিলে কি রং হইবে ?

নীল, লাল, বর্ণহীন।

(ii) চুনকে কি জাতীয় পদার্থ বলে ?

ক্ষারক, লবণ, অ্যাসিড।

(iii) তেঁতুলে কি জাতীয় অ্যাসিড থাকে ?

হাইড্রোক্লোরিক, টারটারিক, ফরমিক।

(iv) মানুষ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন কি জিনিষ হইতে নেয়।

বায়ু, উদ্ভিদ্, মাটি।

(v) কমলালেবু হইতে আমরা প্রচুর পরিমাণে কি ভিটামিন পাই ?

এ-ভিটামিন, বি-ভিটামিন, সি-ভিটামিন।

(D) Completion type test :

নিম্নের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

আমাদের দেহযন্ত্রকে একটি —— সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। —— না দিলে যেমন ইঞ্জিন চলে না, তেমনি —— না দিলে আমাদের দেহযন্ত্র চলে না। কয়লা হইতে ইঞ্জিনে —— উৎপন্ন হয় আর — হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়।

(E) Matching type test :

II নং প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ বাছিয়া I নং প্রকোষ্ঠের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

I	II
1. মটর গাছের শিকড়ের গুটিতে একপ্রকার—— থাকে।	ব্যাক্টেরিয়া
2. খনিতে যে লবণ পাওয়া যায় তাহাকে—— লবণ বলে।	নীল লিট্‌মাস
3. অ্যাসিড মাত্রেই——কাগজকে লাল করিবে।	সৈন্ধব, এন্‌জাইম

পঞ্চম অধ্যায়

মানবদেহ
THE HUMAN BODY

মানব রক্ত (Human blood):

রক্ত তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। আমাদের দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে যে উজ্জ্বল লাল রংয়ের তরল ও অস্বচ্ছ পদার্থ বাহির হইয়া আসে তাহাকেই রক্ত বা শোণিত বলা হয়। রক্ত আমাদের প্রাণস্বরূপ। ইহা দেহের হৃৎপিণ্ড (heart), ধমনী (artery), শিরা (veins) ও জালক (capillaries) প্রভৃতির মধ্যদিয়া সঞ্চালিত হইয়া সর্বাঙ্গে জীবনীশক্তি প্রদান করে। এই রক্তের সঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হইলে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্তের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত। ইহার একরকম বিশিষ্ট গন্ধও আছে। জীবিত অবস্থায় আমাদের দেহের রক্তে গড়ে 37·8°C তাপমাত্রায় থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ছয় লিটার (litre) পরিমাণ রক্ত থাকে।

রক্তের উপাদান:—একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে তিন প্রকারের রক্ত কণিকা (blood corpuscles) দেখা যায়, যথা:—(i) **শ্বেত রক্ত কণিকা** (white blood corpuscles = W. B. C,) (ii) **লোহিত রক্ত কণিকা** (red blood corpuscles = R.B.C.) এবং (iii) **অনুচক্রিকা** (platelets)। ইহারা **রক্তরস** (plasma) নামে এক প্রকার ঈষৎ-হলুদ রংয়ের তরল পদার্থের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। নিম্নে রক্তের বিভিন্ন উপাদানগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা করা হইল।

রক্তরস:—রক্তরস ক্ষারজাতীয় পদার্থ। জল ইহার প্রধান উপাদান (প্রায় শতকরা ৮০-৯০ ভাগ)। তাহাছাড়া ইহার মধ্যে ধাতব লবণ, শর্করা, স্নেহ, প্রোটিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি নানারকমের পদার্থ থাকে।

শ্বেত-কণিকা (White Corpuscles):—ইহারা বর্ণহীন রক্ত কণিকা, ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। সাধারণতঃ ইহাদের গোলাকৃতি বলা যাইতে পারে। লোহিত রক্ত কণিকাগুলি অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা কম।

প্রায় ৫০০ লোহিত রক্তকণিকার সঙ্গে একটি করিয়া শ্বেত-কণিকা থাকে। অবশ্য ইহারা লোহিত-কণিকা অপেক্ষা আকারে বড়। [১১৩ নং চিত্র দেখ]

শ্বেত-কণিকাগুলি আমাদের দেহরক্ষীর কাজ করে। শ্বেত-কণিকা নিজের দেহটিকে ইচ্ছামত নানাদিকে বাঁকাইতে অথবা প্রসারিত করিতে পারে। আমাদের শরীরের ক্ষতিকারক নানাপ্রকার জীবাণু প্রায়ই প্রশ্বাসবায়ু, খাদ্য, পানীয় অথবা ক্ষতস্থান দিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেহস্থিত শ্বেত-কণিকাগুলি এই ক্ষতিকারক
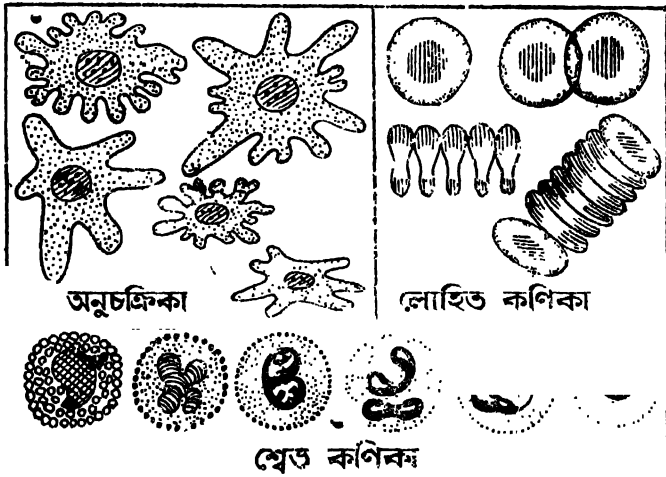
১১৩ নং চিত্র

জীবাণুগুলিকে নানাভাবে ঘিরিয়া লয় এবং নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলে। এইরূপে উহারা আমাদের দেহকে অনেক জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। তবে যদি ক্ষতিকারক জীবাণু প্রচুর পরিমাণে দেহে প্রবেশ করে কিংবা আমাদের দেহের দুর্বলতাবশতঃ শ্বেত-কণিকাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তবে তাহারা রোগ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় না। এবং তখনই আমরা রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ি। আমাদের দেহের কোন ক্ষতস্থানে পুঁজ দেখা দিলে তাহা নিহত শ্বেত-কণিকা হইতে হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

লোহিত-কণিকা (Red Corpuscles):—লোহিত-কণিকাগুলি চেপ্‌টা গোলাকার চাকতির মত [১১৩ নং চিত্র দেখ] প্রত্যেকটি কণিকা

দেখিতে হরিদ্রাভ। কিন্তু কতকগুলি একসঙ্গে থাকিলে উহাদের লাল দেখায়। রক্তে ইহারাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। একফোঁটা রক্তে ইহাদের সংখ্যা 30 লক্ষও হইতে পারে। উহাদের ভিতর এক প্রকার লাল রংয়ের লৌহ ঘটিত পদার্থ থাকে, উহাকে **হিমোগ্লোবিন** (haemoglobin) বলে। হিমোগ্লোবিনে যে লৌহ থাকে তাহা দ্বারা সে ফুসফুসের বাতাস হইতে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয়, এবং নিজে রক্তস্রোতের সঙ্গে সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন কোষে অক্সিজেন বিলাইয়া দেয়। আবার কোষ-নিঃসৃত দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডও লোহিত কণার সাহায্যেই ফুসফুসে ফিরিয়া আসে। এইজন্য হিমোগ্লোবিনকে অক্সিজেন-বাহক বলে।

অনুচক্রিকা (Blood Platelets) :—ইহাদের আকৃতি অসমান চাকৃতির ন্যায় (১১৩ নং চিত্র দেখ)। ইহারা বর্ণহীন এবং লোহিত-কণিকা অপেক্ষা অনেক ছোট। গড়ে প্রায় দশটি লোহিত-কণিকার সহিত একটি অনুচক্রিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে ইহারা রক্ত জমাইয়া রক্তপাত বন্ধ করিতে সাহায্য করে। পূর্বেই বলিয়াছি যে রক্তরসে ফাইব্রিনোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। রক্ত যখন দেহের মধ্যে তরল অবস্থায় থাকে তখন ফাইব্রিনোজেনও তরল থাকে। কিন্তু রক্ত দেহের বাহিরে আসিলেই ফাইব্রিনোজেন সরু সূতার জালের মত ফাইব্রিনে (fibrin) পরিণত হয় এবং রক্তকণিকা এই জালে আটকাইয়া গিয়া জমাট বাঁধে। ইহাকে **রক্তের তঞ্চন** (coagulation of blood) বলে। জমাট রক্ত ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং উহার ভিতর হইতে একপ্রকার ঈষৎ হলুদ রংয়ের রস বাহির হইয়া আসে। এই রসকে **রক্তমস্তু** (serum) বলে। রক্তের বিভিন্ন অংশকে ছকাকারে নিম্নে দেওয়া হইল।
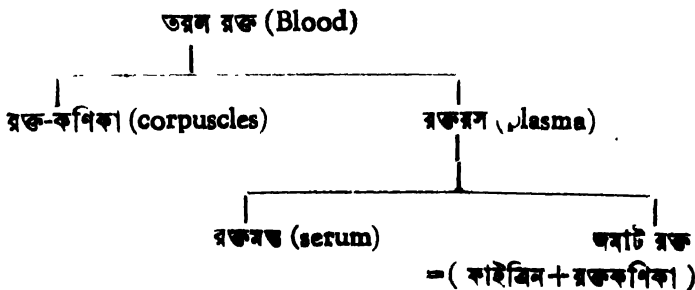
রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System) :

আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের কাজে হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, জালক প্রভৃতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। নিম্নে তাহাদের বিষয় আলোচনা করা হইল।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র হইল হৃৎপিণ্ড। ইহা কতকগুলি অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশী দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ ইহার ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এই যন্ত্রটি আমাদের দেহে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং পাম্পের
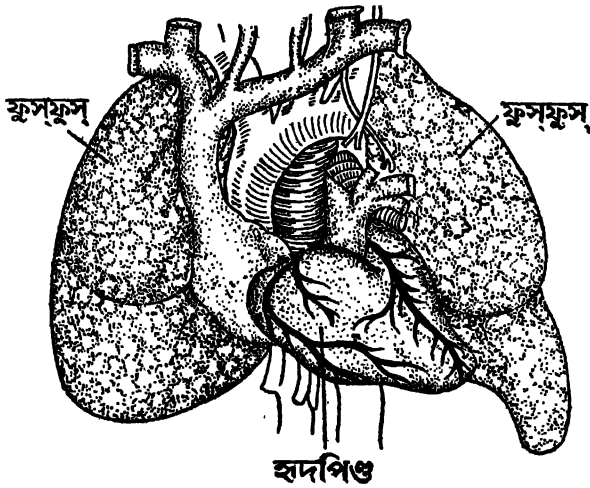
১১৪ নং চিত্র

ন্যায় কাজ করিতে থাকে। ইহা বুকের মধ্যে ফুস্ফুসের দুই অংশের মাঝখানে একটু বাঁদিকে হেলিয়া অবস্থান করে। (১১৪ নং চিত্র দেখ)। ইহার আকৃতি অনেকটা নোনা-আতার (উল্টান ত্রিভুজের) ন্যায়। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি। সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ডটি একটি পাতলা থলির মত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। ইহাকে **হৃৎপিণ্ডাবরক** (pericardium) বলে। ইহার জন্য হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক প্রসারণ সম্ভব হয় না। হৃৎপিণ্ডের চওড়া দিকটা উপরের দিকে থাকে এবং ইহাকে **বেস** (Base) বলে। আর সূচালো দিকটা নিচের দিকে থাকে। উহাকে বলা হয় **অ্যাপেক্স** (Apex)।

হৃৎপিণ্ডের ভিতরটি চারটি কক্ষে বিভক্ত। উপরের পাশাপাশি দুইটি কক্ষকে বলা হয় বাম **অলিন্দ** ও ডান **অলিন্দ** (Auricle)। আর নিচের দুইটি

কক্ষকে বলা হয় বাম নিলয় ও ডান নিলয় (.Ventricle)। নিলয় অপেক্ষা অলিন্দ আয়তনে ছোট। অলিন্দ দুইটি এবং নিলয় দুইটির মাঝখানে পেশীর দেওয়াল থাকায় এক অলিন্দ হইতে অন্য অলিন্দে বা এক নিলয় হইতে অন্য নিলয়ে রক্ত যাইতে পারে না। কিন্তু ডান অলিন্দ হইতে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে রক্ত যাইতে পারে। অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগ পথে এক রকমের কপাটিকা (valve) থাকে। ইহারা এমনভাবে গঠিত যে রক্ত কেবল উপর হইতে নিচে (অর্থাৎ অলিন্দদ্বয় হইতে নিলয়দ্বয়ে) নামিয়া আসিতে পারে; কিন্তু বিপরীত দিকে চলিতে পারে না। (১১৫ নং চিত্রে নক্সার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের গঠন দেখান হইল) অলিন্দ রক্ত গ্রহণ করে
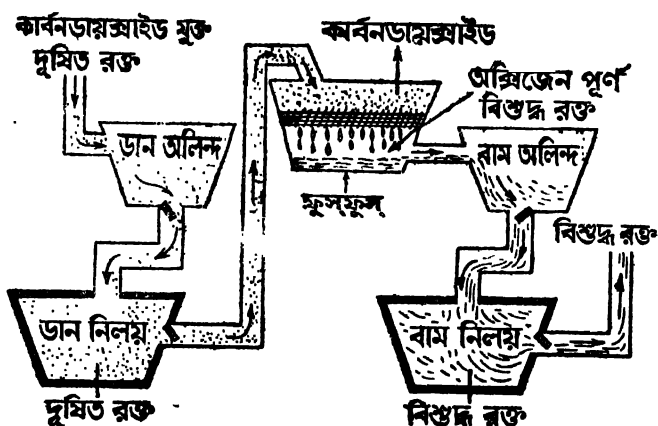
নক্সার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের গঠন দেখান হইল

১১৫ নং চিত্র

(rec.iving chamber)। ইহার ভিতরে রক্তের চাপ বাড়িলেই কপাটিকা খুলিয়া যায় এবং অলিন্দ হইতে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয় দুইটিকে রক্ত-সঞ্চালন প্রকোষ্ঠ (distributing chamber) বলে।

বামদিকের নিলয় হইতে একটি মোটা বৃহৎ রক্তবহা নালী বাহির হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তবহা নালীকে বলা হয় মহাধমনী (Aorta)। ডান দিকের নিলয় হইতে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় ধমনী বাহির হইয়া প্রথমে দুই ভাগ ও পরে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে বলা হয় ফুসফুসীয় ধমনী (Pulmonary Arteries)। আবার ফুস্‌ফুস্ হইতে অনেক শাখা-প্রশাখায়

বাহির হইয়া অবশেষে একটা মোটা শিরা হিসাবে ইহা বাম অলিন্দে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে বলে **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary vein)। ইহা ছাড়া দেহের সব জায়গা হইতে রক্ত দুইটি মোটা শিরা দিয়া ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ইহাদের একটি শরীরের দিক হইতে রক্ত লইয়া আসে তাহাকে বলা হয় **ঊর্ধ্ব-মহাশিরা** আর একটি শরীরের নিচের দিকের অংশ হইতে রক্ত লইয়া আসে তাহাকে বলে **নিম্ন-মহাশিরা**। (১১৬ নং চিত্র দেখ)
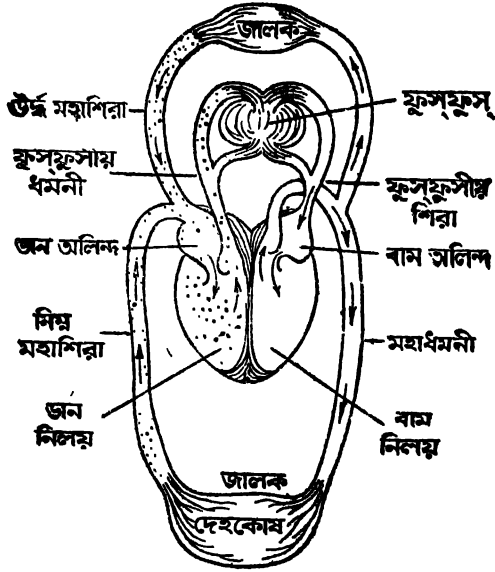
রক্ত সঞ্চালন

১১৬ নং চিত্র

একটা কথা মনে রাখিবে, ডান অলিন্দে ও নিলয়ে দূষিত রক্ত আর বাম অলিন্দে ও নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে।

রক্ত-বহা-নালী (Blood Vessels):—হৃদয় হইতে কতকগুলি নালী দিয়া রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। উহাদিগকে রক্ত-বহা নালী বলে। ইহারা তিন প্রকার; যথা—(ক) **শিরা** (Vein), (খ) **ধমনী** (Artery) ও (গ) **জালক** বা **কৈশিক নালী** (Capillaries)। নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

(ক) **শিরা** (Vein) :—শিরার মধ্য দিয়া সাধারণতঃ দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে যায়। এজন্য শিরা কাটিলে

কালচে রক্ত বাহির হয়। কিন্তু তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে ফুসফুসীয় শিরা দিয়া বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। শিরার মধ্যে মধ্যে কপাটিকা (valve) আছে (১১৭ ক নং চিত্র দেখ)। সেইজন্য শিরার মধ্য
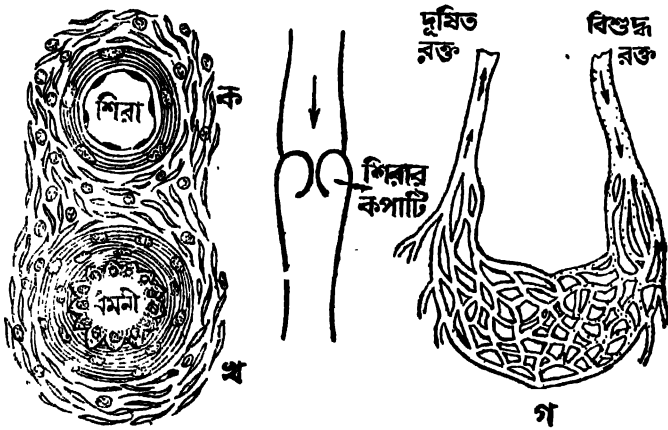
১১৭ নং চিত্র

দিয়া রক্ত একই দিকে প্রবাহিত হয়। শিরার গাত্র অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং কম স্থিতি-স্থাপক।

(খ) **ধমনী** (Artery):—ধমনী তিনটি মোটা আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। সেই জন্য ইহাদের গাত্র বেশ পুরু এবং স্থিতি স্থাপক (১১৭খ নং চিত্র দেখ)। ধমনীর কাজ অক্সিজেন-বহুল বিশুদ্ধ রক্ত হৃদযন্ত্রের বাম নিলয় হইতে সারা দেহে প্রবাহিত করা। ইহা বাম নিলয় হইতে মহাধমনী রূপে বাহির হইয়া বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ধমনী কাটিয়া গেলে হৃৎযন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণের (Pump) তালে তালে লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইতে থাকে। মনে রাখিবে মৃত্যুর পর ধমনী রক্তশূন্য অবস্থায় থাকে।

(গ) **জালক** (Capillaries):—ধমনী আর শিরা যখন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে সূক্ষ্মতম ধমনী ও শিরাতে পরিণত হয় তখন সেগুলিকে দেখিতে মাকড়সার জালের মত মনে হয়। ইহাদিগকে বলে **জালক**। ধমনী ও শিরার জালক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকে। জালকের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। সেই জন্য রক্তে রক্তরস ইহার গাত্র চুয়াইয়া দেহের কোষের মধ্যে যায়। পরে কোষের অব্যবহৃত পদার্থ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্রহণ করিয়া

অপর পথে জালকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শেষে শিরাতে পৌছায় (১১৭ গ নং চিত্র দেখ)।

রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী :—রক্ত সঞ্চালন প্রণালীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী এবং (খ) ক্ষুদ্রতর বা ফুসফুসীয় রক্ত সঞ্চালন প্রণালী।

(ক) **বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী :**—(১১৫ ও ১১৬নং চিত্র দেখ)। বাম নিলয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী দিয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও জালকের ভিতর দিয়া পৌছায়। তারপর জালকের ভিতর দিয়া রক্তরস চুয়াইয়া বাহিরে আসে এবং দেহের কোষে খাদ্যের সারাংশ ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। আবার ইহা কোষের অবাঞ্ছিত পদার্থ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া দূষিত রক্তরূপে শিরা উপশিরায় যায়। পরে এই দূষিত রক্ত মহাশিরা পথে প্রথমে ডান অলিন্দে ও পরে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই রক্ত-সঞ্চালন প্রণালীকে বলা হয় বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী (greater blood circulation)।

(খ) **ক্ষুদ্রতর রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী :**—সমস্ত দেহের দূষিত রক্ত যখন ডান অলিন্দে আসে তখন রক্তের চাপে ডান অলিন্দের কপাটিকা খুলিয়া যায় এবং রক্ত ডান নিলয়ে পৌছায়। সেখান হইতে রক্ত ফুসফুসে পৌছায়। ফুসফুসের বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দূষিত রক্ত পুনরায় বিশুদ্ধ হয়। এইবার বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরা দিয়া বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং পরে বাম নিলয়ে যায়। ইহাকে ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী (lesser blood circulation) বলে।

মানুষের পরিপাক তন্ত্র (Digestive system of man) :—জীবদেহের যে যে যন্ত্র খাদ্য পরিপাক করিতে সাহায্য করে তাহাদিগের সবগুলিকে একত্রে পরিপাক-তন্ত্র বা পাচন-তন্ত্র (Digestive System) বলে। মুখ-গহ্বর, দাঁত, জিহ্বা, অন্ননালী, অন্ত্র প্রভৃতি পরিপাক-তন্ত্রের প্রধান সাহায্যকারী। তাহা ছাড়া অগ্ন্যাশয়, লিভার প্রভৃতির কাজও উল্লেখযোগ্য। পরপৃষ্ঠায় কি ভাবে বিভিন্ন তন্ত্রে খাদ্য পরিপাক হয় তাহার আলোচনা করা হইল। (১১৮ নং চিত্র দেখ)।

(i) **মুখের মধ্যে পরিপাক—মুখ গহ্বর, দাঁত ও জিহ্বা**—এই তিনটি একত্রে মুখের মধ্যে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। মুখে দাঁতের

সংখ্যা মোট ৩২টি, উহাদের ১৬টি উপরের পাটিতে এবং ১৬টি নীচের পাটিতে আছে। প্রত্যেক পাটির সামনের দিকে চারটি করিয়া কৃন্তক (incisor) দন্ত আছে। উহাদের দুইদিকে দুইটি ছেদক (Canine) দন্ত আছে।
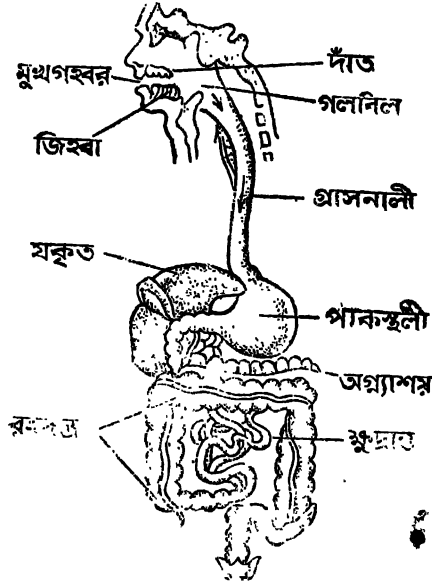
পরিপাক তন্ত্র

১১৮ নং চিত্র

উহাদের সাহায্যে আমরা খাদ্যদ্রব্য ছিঁড়িয়া থাকি। ছেদক দন্তের পাশেই আবার দুই পার্শ্বে তিনটি করিয়া আর ছয়টি দাঁত আছে, যাহাদের বলা হয় পেশক (Molar) দন্ত। ইহাদের কাজ হইল খাদ্য দ্রব্যকে চর্বন ও পেষণ করা।

খাদ্য মুখে প্রবেশ করিলে উহা দাঁতের সাহায্যে চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া ডেলার মত হয়। এই সময় মুখের লালাগ্রন্থিসমূহ হইতে লালা (saliva) নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সঙ্গে মিশে। তাহার ফলে খাদ্য নরম ও পিচ্ছিল হয়। এই জন্যই আমরা সহজে খাদ্য গিলিতে পারি। তাহা ছাড়া, লালার মধ্যে টায়ালিন (ptyalin) নামক এক প্রকার এনজাইম্ (enzyme) থাকে। ঐ এনজাইম্ খাদ্যের অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে (starch) দ্রবণীয় মল্টোজে পরিণত করে। আমাদের মুখের মধ্যে তিন জোড়া লালা গন্থি (salivary gland) আছে—(1) প্যারটিড্ (Parotid)। ইহা কানের নিচে থাকে।

(2) সাবম্যাক্জিলারি (Submaxillary), ইহা নিচের চোয়ালের পাশে থাকে এবং (3) সাবলিঙ্গুয়াল (Sublingual), উহা জিহ্বার নিচে থাকে।

জিহ্বা (Tongue) :—খাদ্যকে মুখের মধ্যে সর্বত্র নাড়াচাড়া করিয়া, শক্ত জিনিষকে বাছিয়া পেষণ-দাঁতে পৌছাইয়া দেয়। তাছাড়া, জিহ্বার সাহায্যে আমরা তিতা, মিঠা, নোনা, টক প্রভৃতির স্বাদ পাইয়া থাকি। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত হইলে আমরা উহাকে গিলিয়া ফেলি। মনে রাখিও, আমরা খাদ্য গিলিবার উপক্রম করিলেই আল-জিহ্বা (epiglottis) শ্বাস-নালীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কোন রকমে একটু ভুল হইয়া গেলেই খাদ্যের কণা শ্বাস-নালীতে ঢুকিতে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা "বিষম" খাই। খাদ্য গিলিবার পর উহা অন্ননালীর মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্ননালী (Gullet) :—গলবিল হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত যে নালী আছে তাহাকে অন্ননালী বলে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ইঞ্চি এবং কতকগুলি গোলাকার মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। খাদ্য এই নালীতে পৌছিলেই ঐ মাংসপেশীগুলি সংকোচন-প্রসারণের ঢেউ তুলিয়া ও চাপ সৃষ্টি করিয়া খাদ্য দ্রব্যকে ঠেলিয়া পাকস্থলীতে পৌছাইয়া দেয়।

পাকস্থলী (Stomach) :—পাকস্থলী একটি মাংসের থলি বিশেষ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় একফুট এবং প্রস্থে প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি। ইহার দুইটি দ্বার আছে। একটি দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তাহাকে আগমন দ্বার (cardiac end) বলে। আর একটি দিয়া খাদ্য বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। উহাকে নিগম দ্বার (Pyloric end) বলে। পাকস্থলীর ভিতরের আবরণের গায়ে অসংখ্য গ্রন্থি থাকে। সেই গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার অম্লরস (gastric juice) বাহির হইয়া খাদ্যে মিশিতে থাকে। সেই রসে পেপসিন ও রেনিন নামক এন্‌জাইম্ এবং কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিঃসৃত গ্যাষ্ট্রীক রসের পরিমাণ প্রায় দশ লিটার হইবে, ইহার প্রায় সবটাই পরে ক্ষুদ্রান্ত্রে শোধিত হইয়া রক্তে চলিয়া যায়। পেপসিন্, প্রোটিনকে সহজপাচ্য পেপ্‌টোনে পরিণত করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের সহিত কোন জীবাণু আসিলে তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। যতক্ষণ খাদ্য পাকস্থলীর ভিতরে থাকে ততক্ষণ উহা পাকস্থলীর প্রাচীরের পেশী দ্বারা আন্দোলিত হইতে থাকে। ফলে খাদ্য কাদার মত অর্ধ-তরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে **পাকমণ্ড** (chyme) বলে।

ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) :—ক্ষুদ্রান্ত্র একটি ফাঁপা নলবিশেষ। ইহা ক্ষুদ্র, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ ফুট। চলতি কথায় ইহাকেই নাড়িভুঁড়ি বলে।

ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা (i)—ড্যুডেনাম (Duodenum) (ii) জেজুনাম (Jejunum) এবং (iii) ইলিয়াম (Illeum)।

পাকস্থলীর অর্ধতরল ও অর্ধজীর্ণ পাকমণ্ড (chyme) পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এখানে পেশীর সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য পাচকরসের সংগে আন্দোলিত ও মথিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয় :

(ক) **পিত্তরস** (Bile) :—ইহা যকৃৎ (liver) হইতে নিঃসৃত হয়। ইহা কোন জারক রস নহে। ইহার কাজ শুধু পাকমণ্ডকে ক্ষারীয় অবস্থায় আনা। ইহাতে অগ্নাশয় রস ক্ষারীয় অবস্থায় সহজে বিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে।

(খ) **আন্ত্রিক রস** (Succus entericus) :—অন্ত্র হইতে আগত আন্ত্রিক রসে চার প্রকারের জারক পদার্থ থাকে।

যথা—(i) মল্টেজ (maltase) জারক। ইহা আখ শর্করাকে (cane sugar) গ্লুকোজে পরিণত করে। (ii) ল্যাক্‌টেজ (lactase) জারক। ইহা দুগ্ধ শর্করাকে (milk sugar) গ্লুকোজে পরিণত করে। (iii) ইরেপসিন (erepsen) জারক। পেপ্‌টোনকে অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত করে। এবং (iv) ইন্‌ভার্টেজ (invertase) জারক। ইহা জটিল-শর্করাকে সরল শর্করায় অর্থাৎ ফ্রাক্‌টোজকে (fructose) গ্লুকোজে (glucose) পরিণত করে।

(গ) **অগ্ন্যাশয় রস** (Pancreatic juice) :—এই রস অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত হয়। ইহাতে তিন প্রকারের জারক রস থাকে ; যথা—(i) কার্বোহাড্রেড-জারক, এমাইলেজ (amaylase), (ii) চর্বি-জারক, লাইপেজ এবং (iii) প্রোটিন জারক, ট্রিপসিন (trypsin)। অগ্ন্যাশয়ে ইন্‌সুলিন (Insulin) নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহা শর্করাকে দহন করিয়া দেহের উত্তাপ সৃষ্টি করে। ইন্‌সুলিনের অভাবে বহুমূত্র (Diabetes) রোগ হয়।

বৃহদন্ত্র (Large intestine) :—ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে অজীর্ণ বা আংশিক-জীর্ণ খাদ্য বৃহদন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এই স্থানে কোন পরিপাক-ক্রিয়া হয় না। কেবলমাত্র জীর্ণ খাদ্যের লবণ ও জলীয় অংশ শোধিত হয়। খাদ্যের যে অংশ

জীর্ণ বা শোষিত হয় না—তাহা ক্রমে জীবাণু দ্বারা মলে পরিণত হয় এবং বৃহদন্ত্রের শেষভাগে মলভাণ্ডারে জমা হয়। পরে উহা বায়ু বা মলদ্বার দিয়া (anus) বাহির হইয়া যায়।

১। মানব রক্তের উপাদানগুলির নাম কর। উহাদের কার্য কি কি? উহাদিগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। মানব দেহের রক্ত-সংবহনতন্ত্র বর্ণনা কর। কি উপায়ে দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয়?

৩। একটি হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকিয়া উহার প্রধান কার্য বুঝাইয়া দাও। ঊর্ধ্ব মহাশিরা ও ফুসফুসীয় ধমনী কাহাকে বলে?

৪। শিরা, ধমনী ও জালকের কার্য বর্ণনা কর।

৫। চিত্রসহ রক্ত-সঞ্চালন প্রণালীর ব্যাখ্যা কর।

৬। পরিপাক তন্ত্র কাহাকে বলে? মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

৭। মুখের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য-প্রণালী বর্ণনা কর।

৮। আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় লালা, অগ্ন্যাশয় রস ও ক্ষুদ্রান্ত্র রসের প্রভাব বর্ণনা কর। যকৃৎ ও পিত্তরস সম্বন্ধে কি জান? হজম ক্রিয়ায় বিভিন্ন এন্‌জাইমের প্রভাব বর্ণনা কর।

৯। টীকা লিখ :—শ্বেত-কণিকা, লোহিত-কণিকা, অনুচক্রিকা, রক্তমস্ত, রক্ত-তঞ্চণ, জালক, পাকস্থলী ও বৃহদন্ত্র।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী (Objective tests)

(A) 'Yes' or 'No' type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক, তাহাদের ডানদিকে 'হ্যাঁ' এবং যেগুলি ভুল, তাহাদের ডানদিকে 'না' লিখিয়া উত্তর কর :—

(i) রক্ত-পাম্প করিবার কার্য হৃৎপিণ্ডের।

(ii) প্রাণিজ-প্রোটিন অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ-প্রোটিন আমাদের বেশী প্রয়োজনীয়।

(iii) রুচি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ দরকার।

(iv) রক্তের শ্বেতকণিকা রক্তকে জমাট বাধাইতে সাহায্য করে।

(v) লোহিত কণিকার জন্য রক্তকে লাল দেখায়।

(vi) শ্বাস-নালী দিয়াও সময় সময় খাদ্য পাকস্থলীতে যায়।

(B) Recall type tests :—

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) বাম নিলয় হইতে——রক্ত যাত্রা করিয়া সমস্ত শরীর ঘুরিয়া ——রক্তরূপে দক্ষিণ——ফিরিয়া আসে। উহা——রক্তে পূর্ণ হইলে আপনি সঙ্কুচিত হয় ও রক্ত——নিলয়ে প্রবেশ।

(ii) খাদ্য মুখে প্রবেশ করিলে,——সাহায্যে চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া ——মত হয়। এই সময় সমস্ত——গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হইয়া——সঙ্গে মিশে।

(iii) পিত্তরস——হইতে নিঃসৃত হয়। উহা কোন——রস নহে। উহার কাজ শুধু পাকমণ্ডকে——অবস্থায় আনা।

(C) Multiple choice type tests :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পাশে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যে উত্তরটি ঠিক মনে কর তাহার নীচে দাগ দাও।

(i) রক্তকে জমাট বাঁধাইবার জন্য কে কাজ করে।
লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা।

(ii) হৃৎপিণ্ডে মোট কয়টি কক্ষ থাকে? দুইটি, তিনটি, চারিটি।

(iii) আমাদের দেহের দূষিত রক্ত কোথায় বিশুদ্ধ হয়?
ফুসফুসে, হৃৎপিণ্ডে, মস্তিষ্কে।

—

দ্বিতীয় খণ্ড

দশম শ্রেণীর জন্য

শব্দের উৎপত্তি (Production of Sound) :—

স্কুলে ঘণ্টার শব্দ, ক্লাসে কথাবার্তার শব্দ, রাস্তায় যানবাহনের শব্দ—এই প্রকার আরও অসংখ্য রকমের শব্দ আমরা প্রতিনিয়ত শুনিতে পাই। শব্দকে আমরা দেখিতে পাই না বটে কিন্তু কানের সাহায্যে বুঝিতে পারি। ইহা আমাদের শ্রবণানুভূতিকে জাগ্রত করে। সুতরাং, শব্দকে আমরা এক প্রকার শক্তি বলিতে পারি। তোমরা হয়তো অনেকেই দেখিয়াছ যে বজ্রপাতের শব্দে নিকটবর্তী ঘরবাড়ির দরজা জানালা কাঁপিয়া উঠে। উহা শব্দ-শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। এখানে আমরা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা সর্বদাই দেখিতে পাইব যে ইহার উৎস কোন একটি কম্পমান বস্তু। কাঠি দিয়া আঘাত করিলে ঢাক, ঢোল, কাঁসর ইত্যাদি বাজে। ধাতব বাটি বা গ্লাসে আঘাত করিলে শব্দ হয়। আবার তারযন্ত্রের তারের মধ্যস্থল টানিয়া ছাড়িয়া দিলেও শব্দ শুনিতে
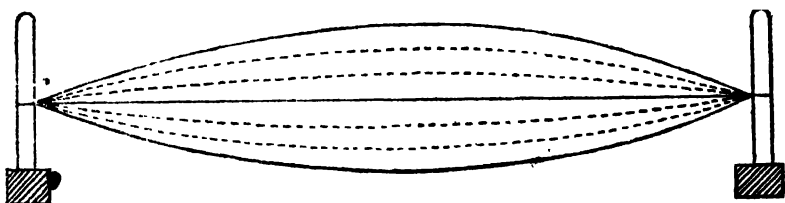
১ নং চিত্র—তারের কম্পনে শব্দের উৎপত্তি

পাওয়া যায়। আঙুল দিয়া স্পর্শ করিলে অনুভব করিবে যে প্রতিটি বস্তুই শব্দ সৃষ্টির সময় কাঁপিতে থাকে। অবশ্য আঙুলের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর কম্পন থামিয়া যাইবে এবং শব্দও বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে

যে বস্তুর কম্পন ছাড়া শব্দ সৃষ্টি সম্ভব নয়। যে কম্পমান বস্তু হইতে শব্দের উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বনক (Source of Sound) বলে। কম্পমান বস্তু তাহার চারিদিকের মাধ্যমে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গ আমাদের কানে পৌছিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

বস্তুর কম্পন দ্বারাই যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা :

সুর-শলাকার (Tuning Fork) কম্পন :—

সুর-শলাকা ইংরাজী U-আকারের দুই বাহু বিশিষ্ট এবং হাতলযুক্ত একটি স্থিতিস্থাপক (elastic) ইস্পাত দণ্ড। উহা একটি ফাঁপা
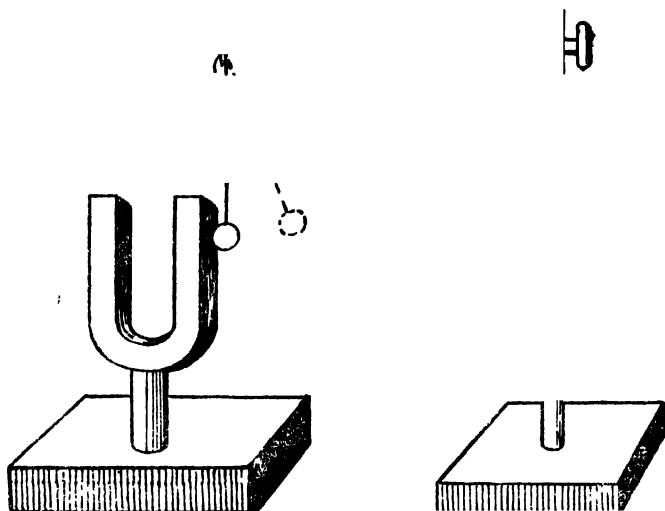
২ নং চিত্র—সুর শলাকার কম্পন

কাঠের বাক্সের উপর বসানো থাকে। সুর-শলাকার যে কোন এক বাহুতে কাপড় জড়ানো হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিলে উহা কাঁপিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট শব্দ বাহির হয়। নির্দিষ্ট আকারের ও আয়তনের সুর-শলাকার নির্দিষ্ট প্রকারের স্বর বাহির হয়। এইজন্য

হারমোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রের সুর পরীক্ষার জন্য সুর-শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একটি শোলার বলকে (pith-ball) ঝুলাইয়া শব্দায়মান সুর-শলাকার বাহুর সংস্পর্শে আনিলে দেখা যাইবে বলটি বারবার আঘাত খাইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে (২ নং চিত্র দেখ)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুর-শলাকার বাহুটি কাঁপিতে থাকে। এইবার উহার বাহুটিকে হাত দিয়া চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে বলটি থামিয়া যাইবে। কারণ, ইহাতে সুর-শলাকার কম্পন বন্ধ হইয়া যইবে এবং শব্দও বন্ধ হইয়া যাইবে।

শব্দের বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় (Material medium is necessary for propogation of sound) :—

বস্তুর কম্পন হইতেই যে শব্দের সৃষ্টি হয় এই কথা আমরা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এই কম্পন যদি কোন জড় মাধ্যমের (material medium) ভিতর দিয়া আমাদের কানে না পৌঁছায় তবে আমরা শব্দ শুনিতে পাইব না। আমরা যখন কথাবর্তা বলি তখন তাহা শুনিবার জন্য কানকে অন্যের মুখের সংগে লাগাইতে হয় না। কারণ বায়ুর মাধ্যমে একজনের মুখের কথা অন্যের কানে পৌঁছায়। শব্দ কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল প্রকার মাধ্যমের ভিতর দিয়াই সঞ্চালিত হইতে পারে। কোন মাধ্যম না থাকিলে শব্দ যে আমাদের কানে পৌঁছাইতে পারে না তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে বুঝা যাইবে।

পরীক্ষা :—একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের (vacuum pump) আসনের (receiver) উপর একটি বড় পাত্র (বেলজার) রাখ। আসনের সহিত পাত্রের মুখ এমনভাবে রাখিবে যেন উহা বায়ুনিরুদ্ধ (air-tight) হয়। পাত্রের উপরের খোলা মুখ একটি ছিপি দ্বারা বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকাও। ছিপির মধ্য দিয়া একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা তারের সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখ (৩ নং চিত্র দেখ)। তারের দুইপ্রান্ত চাবি মারফৎ বিদ্যুৎ-কোষের সঙ্গে যুক্ত কর। এইবার চাবি টিপিলে ঘণ্টা বাজিতে থাকিবে। এখন ক্রমশঃ পাম্প চালাইয়া পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিতে থাক। যতই বায়ু বাহির হইয়া যাইবে ততই শব্দ ক্ষীণতর হইবে। যখন ঐ পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইবে তখন শব্দ আর শোনা যাইবে না, যদিও হাতুড়িকে ঘণ্টার উপর আঘাত করিতে ও ঘণ্টাকে কাঁপিত দেখা যাইবে।

আবার যদি পাত্রে আস্তে আস্তে বায়ু প্রবেশ করানো যায় তবে শব্দ শোনা যাইবে। এবং তাহা ধীরে ধীরে জোরদার হইবে। সুতরাং, এই পরীক্ষা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে কোন জড় মাধ্যম ছাড়া শব্দ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। পৃথিবী হইতে চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ভিতরকার দূরত্বের বেশীর ভাগ স্থানই শূন্য (vacuum)। তাই চন্দ্রে বা অন্য কোন গ্রহে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিলেও তাহার শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। আবার পৃথিবীর কোন বিস্ফোরণের শব্দও অন্যান্য গ্রহে পৌঁছোয় না।
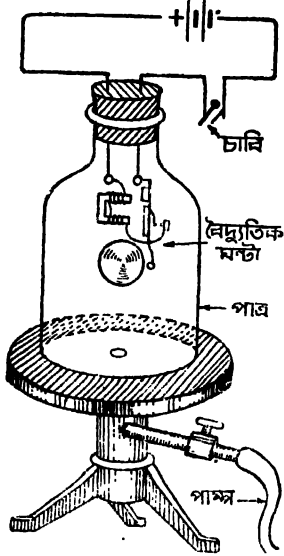
৩নং চিত্র—বেল জারে পরীক্ষা

পূর্বেই বলিয়াছি কঠিন ও তরল মাধ্যমের ভিতর দিয়াও শব্দের বিস্তার সম্ভব। দূরাগত রেলগাড়ীর শব্দ হয়তো তুমি বায়ুর মাধ্যমে শুনিতে পাইতেছ না কিন্তু যদি লোহার রেলের উপর কান পাতিয়া রাখ তবে সহজেই সে শব্দ শুনিতে পাইবে। আবার, পুকুরে বা নদীতে স্নান করিবার সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে দূরে জলের মধ্যে কোন শব্দ করিলে তাহা ডুব দিয়া জলের মাধ্যমে শোনা যায়।

শব্দের প্রতিফলন (Reflection of Sound) :

আলোকের ন্যায় শব্দও একই নিয়মানুসারে প্রতিফলিত হয়। তবে আলোকের ক্ষেত্রে প্রতিফলকের তল মসৃণ হওয়া দরকার এবং উহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও চলে। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিফলক বড় হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য উহার তল মসৃণ না হইলেও চলে। এইজন্য বাড়ীর দেওয়াল, পর্বতগাত্র, গাছের সারি প্রভৃতি শব্দের প্রতিফলকের কাজ করিতে পারে।

সমতলে প্রতিফলনের পরীক্ষা :—

একটি টেবিলের উপর একটি সমতল কাঠের বোর্ড (A) শব্দের প্রতিফলিত হিসাবে স্থাপন কর। (৪ নং চিত্র দেখ) এইবার, বোর্ডের মধ্যস্থলে AP রেখা বরাবর লম্বভাবে একটি কাঠের ফলক রাখ। ইহা পর্দার ন্যায় কাজ করিবে। X ও Y দুইটি ফাঁপা নল টেবিলের উপর এমনভাবে রাখ যেন উহাদের অক্ষদ্বয় (axis) A বিন্দুতে মিলিত হয় এবং AP রেখার সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ যেন ∠XAP ও ∠YAP সমান হয়। এখন একটি ঘড়ি যদি X নলের সামনে রাখিয়া Y নলের মুখের
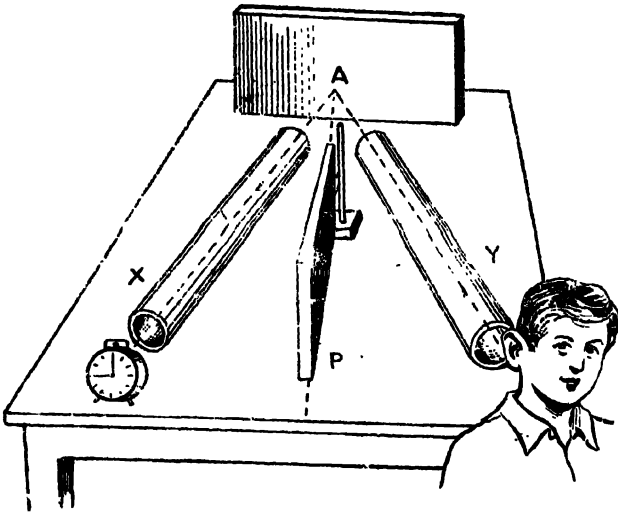
সমতল প্রতিফলকে শব্দের প্রতিফলন

৪ নং চিত্র

কাছে কান পাতা যায় তবে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাইবে। কিন্তু নল দুইটির যে কোন একটিকে যদি অন্তর্ভাবে বাঁকাইয়া ধরা হয় তবে আর শব্দ শোনা যাইবে না।

ইহা প্রমাণ করে যে আলোকের ন্যায় শব্দেরও প্রতিফলন কোণ এবং আপতন কোণ সমান হয়। আবার লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে X ও Y নলের অক্ষদ্বয় ও অভিলম্ব AP একই সমতলে অবস্থিত আছে। ইহা প্রতি-ফলনের দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করে।

অবতলে প্রতিফলনের পরীক্ষা ঃ—

অবতল দর্পণেও আলোকের প্রতিফলনের ন্যায় শব্দের প্রতিফলন হয় ৫ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল। চিত্রের ন্যায় A প্রতিফলকের ফোকাস
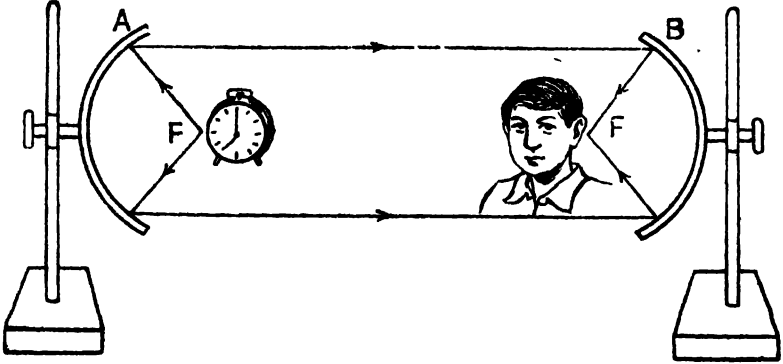
৫ নং চিত্র—অবতল প্রতিফলকে শব্দের প্রতিফলন

(focus) একটি ঘড়ি রাখিয়া B প্রতিফলকের ফোকাসে কান রাখিলে ঘড়ির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইবে। কিন্তু কানকে এদিক-ওদিক সরাইলে শব্দ আর শোনা যাইবে না।

শব্দের প্রতিফলনের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ—

(i) পূর্বে বড় বড় বক্তৃতার হলে বক্তার পিছনে কাঠের অবতল প্রতিফলক ব্যবহৃত হইত। বক্তা অবতল প্রতিফলকের ফোকাসে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন। ফলে, শব্দ প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত ঘরে পৌঁছাইত। আজকাল অবশ্য বক্তারা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন।

(ii) লাউড-স্পিকার, গ্রামোফোনের চোঙ্, কথা বলার চোঙ্, প্রভৃতি
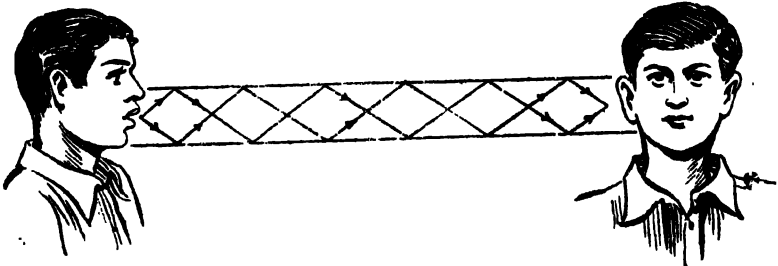
৬ নং চিত্র—চোঙের গায়ে শব্দের প্রতিফলন

শব্দের প্রতিফলন ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া তৈয়ারী হয়। ৬ নং চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে কি করিয়া চোঙের গায়ে শব্দের প্রতিফলন হয়।

(iii) ডাক্তারদের রোগীর বুক-পরীক্ষার-যন্ত্র (Stethoscope), বধিরের কথা শুনিবার যন্ত্র (ear-trumpet) প্রভৃতিও শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগাইয়া তৈয়ারী করা হয়।

(iv) দূরাগত কোন ক্ষীণ শব্দকে স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্ত আমরা

হাতের তালুকে অবতল প্রতিফলক রূপে ব্যবহার

৭ নং চিত্র

অনেক সময় হাতের তালুকে অবতল প্রতিফলকের ন্যায় কাজে লাগাই। (৭নং চিত্র দেখ)

প্রতিধ্বনি (Echo):—পাহাড়ের সামনে, নদীর ধারে বা উঁচু দেওয়ালে দিয়া ঘেরা বড় মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে বা হাততালি দিলে কিছুক্ষণ বাদে সেই শব্দের একটা পুনরাবৃত্তি কানে পৌছায়। শব্দের এই প্রকার পুনরাবৃত্তি শোনার অভিজ্ঞতা হয়তো তোমাদের সকলেরই আছে। ধ্বনির এই প্রকার পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে এবং শব্দের প্রতিফলনের জন্তই উহা উৎপন্ন হয়। কাজেই প্রতিধ্বনি সৃষ্টির জন্যে উপযুক্ত প্রতিফলকের (যেমন, পাহাড়, প্রশস্ত দেওয়াল, গাছের সারি প্রভৃতি) প্রয়োজন। (৮ নং চিত্র দেখ)। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিবে মুখের মূল শব্দ (ধ্বনি) শেষ হইবার পূর্বেই যদি প্রতিফলিত শব্দ (প্রতিধ্বনি) কানে আসিয়া লাগে তবে আমরা প্রতিধ্বনিকে পৃথকভাবে শুনিতে পাই না। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময়ের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। কারণ কোন শব্দের অনুভূতি আমাদের কানে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাকে শব্দ নির্বন্ধ (Persistance of Sound) বলে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি

কানে পৌঁছাইলে তাহাকে ধ্বনি হইতে পৃথকভাবে শোনা যায় না। ধ্বনি শুনিতে হইলে, প্রতিফলকটিকে বক্তার নিকট হইতে কমপক্ষে 56 ফুট দূরে রাখিতে হইবে। কারণ শব্দ বায়ুতে সেকেণ্ডে 1120 ফুট যায়।
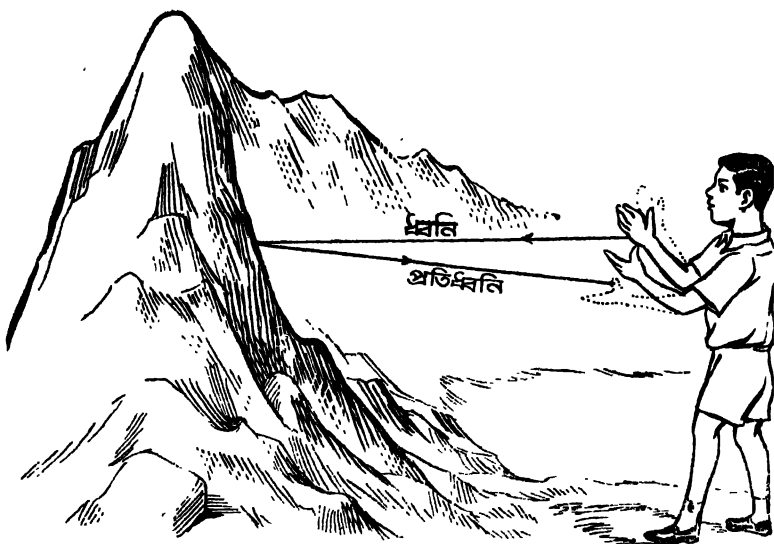
পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি

৮ নং চিত্র

সুতরাং বক্তা হইতে 56 ফুট দূরের প্রতিফলক শব্দের যাতায়াত মোট দূরত্বের ব্যবধান হই 56×2 ফুট এবং সময়ের ব্যবধান হইবে $\frac{56 \times 2}{1120}$ বা $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড।

শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। তাহার প্রণালীটি এইরূপ। জাহাজের তলদেশে একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এবং সেই শব্দ সমুদ্রের তলদেশ হইতে প্রতিফলিত হইয়া প্রতিধ্বনিরূপে জাহাজে ফিরিয়া আসে। সেই প্রতিধ্বনি হাইড্রোফোন নামক একটি যন্ত্রে ধরা পড়ে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করা করা হয়। এক্ষণে, যদি জলের মধ্য দিয়া শব্দ কত বেগে চলে তাহা আমাদের জানা থাকে তবে সহজেই সময়ের ব্যবধান হইতে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। (৯ নং চিত্র দেখ)

শব্দের বেগ (Velocity of Sound) :—

শব্দের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা অনেক কম। আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 2994600 কিলোমিটার। আর শব্দের বেগ বায়ুর মাধ্যমে প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 1120 ফিট বা 349 মিটার। সেইজন্তে বহু দূরে আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় ও বজ্রপাত হয় তখন আলোর ঝলক
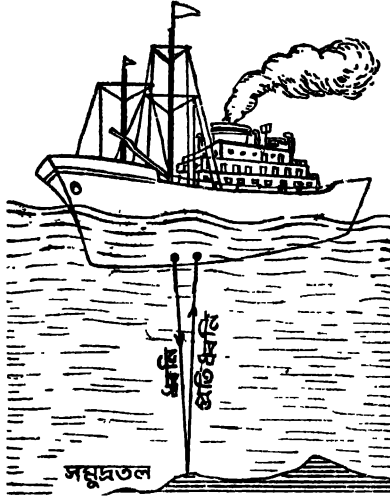
প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়

৯ নং চিত্র

ও শব্দ একই সময়ে উৎপন্ন হইলেও বিদ্যুতের ঝলক দেখিবার অনেক পরে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। দূরাগত ট্রেনে যখন বংশীধ্বনি করা হয় তখন সাদা ধোঁয়া দেখিবার বেশ কিছুক্ষণ পরে ইহার শব্দ আমাদের কানে আসে। যদিও, বংশীধ্বনি এবং ধোঁয়া একই সংগে উৎপন্ন হয়। দূর হইতে ধোপাদের কাপড় কাচা হয়তো তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। কাপড় কাঠের উপর আছাড় দিবার অনেক পরে শব্দ কানে পৌছায়। দূর হইতে ক্রিকেট খেলা দেখিবার সময়ও লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে বলে এবং ব্যাটে সংঘাত হইবার অনেক পরে উহার শব্দ আমাদের কানে পৌছায়। এই সমস্ত সাধারণ ঘটনা হইতে আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে শব্দের গতিবেগ আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা অনেক কম।

প্রশ্নাবলী

1. "কোন কম্পমান বস্তুই শব্দের উৎস"—এই উক্তিটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর।

2. শব্দ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কয়েকটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

3. পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর যে জড় মাধ্যম ব্যতীত শব্দ-বিস্তার সম্ভব নয়।

4. কঠিন, তরল ও বায়ু এই তিন মাধ্যমেই শব্দ চলে—ইহা কি প্রকারে প্রমাণ করিবে?

5. আলোকের ন্যায় শব্দের প্রতিফলন হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

6. শব্দের প্রতিফলনের কতকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের বর্ণনা কর।

7. প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে? প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলক কমপক্ষে কতদূরে থাকা উচিত?

8. প্রতিধ্বনি শুনিয়া সমুদ্রের গভীরতা কিরূপে নির্ণয় করা যায়?

9. বায়ুতে শব্দের গতিবেগ কত? শব্দের গতিবেগ যে আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা কম তাহা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা হইতে বুঝাইয়া দাও।

10. নিম্নলিখিত জিনিসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

    (ক) স্বর-শলাকা (খ) শব্দের অবতল প্রতিফলকে প্রতিফলন

    (গ) কথা বলার চোঙ্।

11. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

    (ক) বিদ্যুৎ চমকানোর অনেক পরে শব্দ শোনা যায়।

    (খ) কোন শব্দায়মান বস্তুকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে শব্দ বন্ধ হইয়া যায়।

    (গ) গ্রহ উপগ্রহের বিস্ফোরণের শব্দ আমরা শুনিতে পাই না।

    (ঘ) সাধারণ বাসগৃহে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।

    (ঙ) দূরের শব্দ শুনিবার জন্য আমরা হাতের তালুকে অনেক সময় কানের কাছে রাখি।

Objective Test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

(A) Alternate-response type tests :—

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি সত্য তাহার পাশে R এবং যেগুলি ভুল তাহার পাশে X বসাও।

(ক) শব্দ কেবলমাত্র বায়ুর মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে।

(খ) শব্দ ও আলোর গতিবেগ প্রায় সমান।

(গ) শব্দের উৎপত্তির জন্য কম্পনের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) আলোকের প্রতিফলকের ন্যায় শব্দের প্রতিফলকও মসৃণ হওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) বক্তা হইতে প্রতিফলক 40 ফুট দূরে থাকিলেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

(B) Completion type test :—

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) যে কম্পমান বস্তু হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে——বলে।

(খ) তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় শব্দও একপ্রকার——।

(গ) শব্দের বিস্তারের জন্য জড়——প্রয়োজন।

(ঘ) শব্দের প্রতিফলক আলোকের প্রতিফলক অপেক্ষা——হওয়া দরকার।

(ঙ) শব্দের গতিবেগ বায়ুতে সেকেণ্ডে——মিটার।

(C) Association type test :—

: : চিহ্নের পূর্বের দুইটি শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক, উহার পরের দুইটি শব্দের মধ্যে কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। পরের দুইটির মধ্যে একটি শব্দ দেওয়া আছে অপরটি বসাও।

(ক) শব্দের প্রতিফলক : বৃহত্তর : : আলোকের প্রতিফলক :—

(খ) কর্ণ : শব্দশক্তি : : চক্ষু : ——।

(গ) আলোক : 186000 মাইল : : শব্দ : ——।

(ঘ) শব্দের উৎস : ধ্বনি : : প্রতিফলক :——

(D) **Multiple-choice type tests :—**

প্রত্যেক প্রশ্নের শেষে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তাহাদের মধ্যে যেটি সত্য তাহার নীচে দাগ দাও।

(ক) শব্দের সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী কে?
উৎসের কম্পন, জড় মাধ্যম, কর্ণ।

(খ) ছোট ঘরে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই না কেন?
ঘরে বায়ু চলাচল কম বলিয়া, দেওয়াল 56 ফুট অপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া, দেওয়ালের মসৃণতা কম বলিয়া।

(গ) সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার সুবিধাজনক উপায় কি?
দড়ির সাহায্যে, শব্দের প্রতিফলনের সাহায্যে, ডুবুরির সাহায্যে।

(ঘ) বিদ্যুতের ঝলক দেখিবার পর মেঘের গর্জন শোনা যায় কেন?
মেঘগর্জন পরে উৎপন্ন হয় বলিয়া, শব্দের গতি আলোকের গতি অপেক্ষা কম বলিয়া, কঠিন মাধ্যম অপেক্ষা বায়ুর মাধ্যমে শব্দের গতি কম বলিয়া।

———

বৈদ্যুতিক সেল বা তড়িৎ-কোষ (Electric Cell)

তড়িৎ-কোষ আবিষ্কারের গোড়ার কথা :—তড়িৎ-কোষ আবিষ্কারের পিছনে আছে এক বিচিত্র কাহিনী। তড়িৎ-কোষে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহার আবিষ্কার হয় দৈবক্রমে। 1786 খৃষ্টাব্দে ইতালির **লুইগি গ্যাল্‌ভানি** নামে একজন ডাক্তার একদিন একটি ব্যাঙের একখণ্ড মাংসপেশীকে লবণ-জলে ভিজাইয়া তামার তার দিয়া বারান্দায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে বাতাসের ধাক্কায় পেশীটি যতবার পার্শ্বস্থ লোহার রেলিং স্পর্শ করিতেছে তত-বারই সংকুচিত হইতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তিনি পুনরায় একটি ব্যাঙ তামার তারে ঝুলাইয়া দস্তার দণ্ড দিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন এইবারের সংকোচন আরও বেশী মাত্রায় হইয়াছে। [১০ নং চিত্র দেখ] ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে সদ্য-মৃত ব্যাঙের পেশীতে প্রাণীজ তড়িৎ (Animal electricity) থাকে।

গ্যালভানির পরীক্ষা
১০ নং চিত্র

কিন্তু ইহার কিছু দিন পরে প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ভোল্‌টা গ্যালভানির** এই সিদ্ধান্তকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিলেন। তিনি বলিলেন প্রাণীদেহে কোন তড়িৎ নাই, লবণ জলের মাধ্যমে তামা ও লোহা অথবা

তামা ও দস্তা—এই দুইটি ধাতুর সংস্পর্শে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অবশ্য এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মূল কারণ রাসায়নিক ক্রিয়া। অতএব, আমরা বলিতে পারি এই মতবাদেও কিছু ত্রুটি ছিল। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকরা স্থির করেন যে, **যে ব্যবস্থা দ্বারা রাসায়নিক শক্তির বদলে স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় তাহাকে তড়িৎ-কোষ বলে।** নিম্নে বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ কোষের আলোচনা করা হইল।

সরল ভোল্টীয় কোষ (Simple Voltaic Cell) :—

এইপ্রকার কোষ সর্বপ্রথম ভোল্টা আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহাকে ভোল্টীয় কোষ বলে।

বিবরণ :—সরল ভোল্টীয় কোষে একটি কাঁচপাত্রে জলমিশান সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। উহাদের মধ্যে একটি তামার পাত ও একটি দস্তার পাত আংশিক ডুবান থাকে। [১১ নং চিত্র দেখ]। এই পাত দুইটিকে তার দ্বারা সংযুক্ত
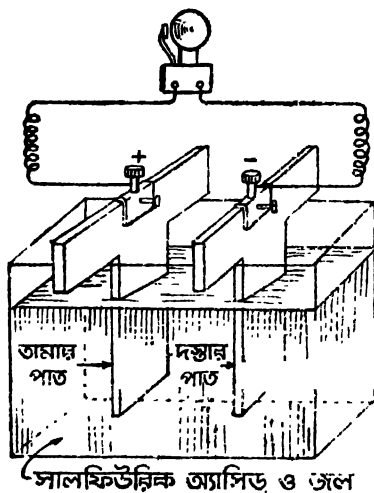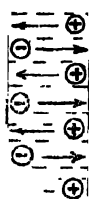
১১ নং চিত্র—সরল ভোল্টীয় কোষ

করিলেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। যদি তারের সঙ্গে কোন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা যোগ করা হয় তবে উহা বাজিতে থাকিবে। ইহা প্রমাণ করে যে তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে। তারের সংযোগ কাটিয়া দিলে দেখা যায় যে ঘণ্টা আর বাজে না।

তড়িৎ কোষে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ব্যাখ্যা :—জলের প্রবাহ যেমন সর্বদা উঁচু তল হইতে নিচু তলের দিকে হয়, তেমন বিদ্যুৎ প্রবাহও উঁচু বিভব (High potential) হইতে নিচু বিভব (low potential) এর দিকে যায়। সরল কোষের তামার পাতকে বলা হয় ধনাত্মক মেরু (positive pole)। ইহাতে ধনাত্মক আধান (positive charge) জমা হয় এবং ইহাকে উচ্চ বিভব সম্পন্ন করে। আর দস্তার পাতকে বলা হয় ঋণাত্মক মেরু (Negative pole)। ইহাতে ঋণাত্মক আধান (Negative charge) জমা হয় এবং ইহাকে নিম্নে বিভব সম্পন্ন করে। তামা ও দস্তার পাতের সহিত অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে থাকে। নিম্নের পরীক্ষাটি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

১২ নং চিত্রে A পাত্রের জল উঁচু তলে আছে আর B পাত্রের জল নিচু তলে আছে। তাই C নল দ্বারা যুক্ত করিলে A পাত্রের জল B পাত্রে প্রবাহিত হইবে। A পাত্রের জল প্রবাহিত হইতে হইতে যখন B পাত্রের জলতলের সমান হইবে তখন জল প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু জল প্রবাহের সময় যদি পাম্পের সাহায্যে B পাত্রের জল সর্বদা A পাত্রে তোলা হয় তবে প্রবাহ কখনই বন্ধ হইবে না। সেইরূপ তড়িৎ-কোষেও রাসায়নিক বিক্রিয়া পাম্পের ন্যায় কাজ করে। উহা তামা ও দস্তার পাতের মধ্যে জলতলের ন্যায় তড়িৎ বিভবের পার্থক্য বজায় রাখে। ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্থায়ী হয়। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হইলে বিদ্যুৎ-প্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়।
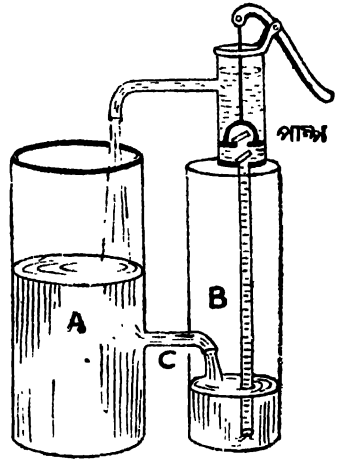
তড়িৎ-প্রবাহের সহিত জলপ্রবাহের তুলনা

১২ নং চিত্র

সরল তড়িৎ-কোষে সাধারণতঃ দুইটি ত্রুটি থাকে, যথা—(a) স্থানীয় ক্রিয়া (local action) ও (b) ছদন (Polarisation)।

(a) **স্থানীয় ক্রিয়া**—দস্তার পাতে সাধারণত লোহ, সীসা, কার্বন প্রভৃতি অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ইহারা অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে দস্তার পাতের

উপর স্থানীয় কোষের সৃষ্টি করে এবং পাতটিকে তাড়াতাড়ি ক্ষয় করিয়া ফেলে। বিশুদ্ধ দস্তা বা পারদ-দস্তার মিশ্রণ (amalgamated zinc) ব্যবহার করিয়া এই ত্রুটির প্রতিকার করা যায়।

(b) **ছন্দন :**—রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎ কোষে যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা তামার ফলকের উপর জমা হইয়া একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণের ফলে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ ক্রমশ কমিতে থাকে এবং শেষে এক সময় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে পাতাটিকে ব্রাশ করিয়া বা কোন রাসায়নিক দ্রব্য কোষে ব্যবহার করিয়া এই ত্রুটি দূর করা যায়। ডেনিয়েল ও লেক্লান্সের কোষে এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ডেনিয়েল কোষ :—এই কোষের পাত্র তামার তৈয়ারী থাকে এবং তামার পাত্রই ধনাত্মক মেরুর কাজ করে। এই পাত্রে লওয়া হয় তুঁতের দ্রবণ (কপার সাল্‌ফেট) আর, পাত্রের উপরের দিকের দুইটি সচ্ছিদ্র
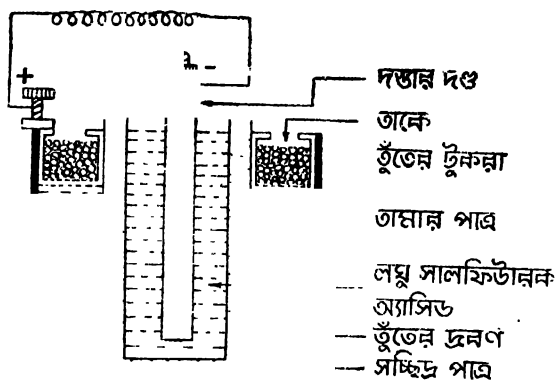
১৩ নং ডেনিয়েল কোষ

তাকে কিছু তুঁতের টুকরা রাখা হয়। [১৩ নং চিত্র দেখ] ইহাতে তুঁতের দ্রবণ সর্বদা সংপৃক্ত (Saturated) থাকে। আর একটি দস্তার দণ্ড পারদের প্রলেপ যুক্ত করিয়া একটি গ্লাসের মত সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্রে রাখা হয় এবং উহার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড লওয়া হয়। এইবার এই পাত্রটিকে তামার পাত্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয় দস্তার পাতটি ঋণাত্মক মেরুর

কাজ করে। চীনামাটির পাত্রের ছিদ্রপথে অ্যাসিড ও কপারসালফেট দ্রবণের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ পাইতে হইলে এই কোষ খুব সুবিধাজনক।

লেক্লাঙ্কের কোষ:—এই কোষে সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে নিশাদলের (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড) দ্রবণ রাখা হয়। ইহার ধনাত্মক মেরুটি তৈয়ারী হয় কার্বন দণ্ড দ্বারা। দণ্ডটিকে একটি চীনামাটির সচ্ছিদ্র পাত্রের মাঝখানে রাখিয়া ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড কাঠ কয়লার গুঁড়া দিয়া পূর্ণ
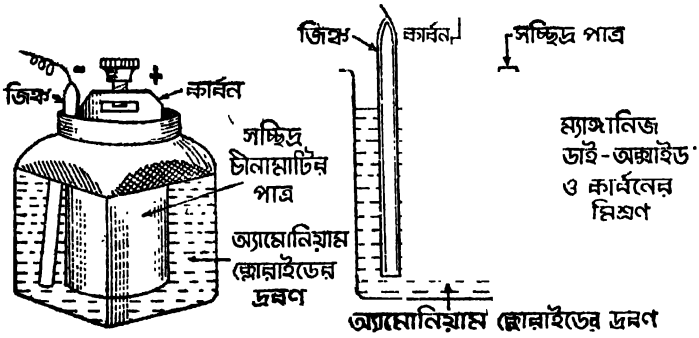
১৪নং চিত্র—লেক্লাঙ্কের কোষ

করিয়া দেওয়া হয়। এইবার পাত্রটিকে একটি বড়-মুখের বোতলে বসাইয়া দেওয়া হয়। বড়-মুখের বোতলে থাকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ। [১৪ নং চিত্র দেখ]

বড় পাত্রের অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে একটি দস্তার দণ্ড ডুবান থাকে, ইহা ঋণাত্মক মেরুর কাজ করে। ইহাকে বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। অল্পক্ষণ স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহের জন্য ইহা বেশ সুবিধাজনক। সেইজন্য টেলিগ্রাফের কাজে এই সেল প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়।

তোমরা টর্চের যে ব্যাটারি ব্যবহার কর তাহাও প্রকৃতপক্ষে লেক্লাঙ্কের তড়িৎ-কোষেরই একটু পরিবর্তিত রূপ।

তড়িৎ-প্রবাহের ফল (Effects of current)

কোন পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিতে থাকিলে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ফল দেখিতে পাই। যথা—

(i) **তাপীয় ফল** (heating effect)

(ii) **রাসায়নিক ফল** : (chemical effect)

(iii) **চুম্বকীয় ফল** (magnetic effect)

নিম্নে উহাদের বিষয় পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

(i) **তাপীয় ফল** :—তড়িৎ-প্রবাহ যে কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কিছু বাধা অতিক্রম করে। বাধা বা প্রতিরোধ (resistance) অতিক্রম করিবার সময় স্বভাবতই কিছু কার্য সম্পাদন হয়। এবং এই কার্য তড়িৎ শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাহার ফলে পরিবাহী তার বা দণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ইহাই তড়িৎ-শক্তির তাপীয় ফল। তড়িৎ-শক্তি হইতে এই প্রকারে অদ্ভুত তাপ দ্বারা বৈদ্যুতিক হিটার, ষ্টোভ, কেটলী, ইস্তিরী, প্রভৃতি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মিত হইয়াছে। তড়িৎ বাতির কৌশলও এই প্রকারের। বিজলীবাতির ভিতরে যে সরু-বাঁকানো তারটি (ফিলামেণ্ট) আঁটা থাকে তাহার বাধা বা রোধ অত্যন্ত বেশী। ফলে যখন উহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে তখন তারটি এত গরম হইয়া পড়ে যে, তাহা হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

(ii) **রাসায়নিক ফল** :—কোন যৌগিক পদার্থের দ্রবণের [যেমন, ঈষৎ অম্লযুক্ত জল, তুঁতের দ্রবণ (Copper Sulphate Solution), সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (Silver Nitrate Solution) ইত্যাদি] ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালনা করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে অনেক সময় যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis)।

একটি পাত্রে জল লইয়া একটু অ্যাসিড মিশাইয়া দাও। [১৫ নং চিত্র দেখ] এখন এই জলের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে দেখা যাইবে

যে ধনাত্মক মেরু (Positive pole) হইতে অক্সিজেন গ্যাস উঠিতেছে আর ঋণাত্মক মেরু (Negative pole) হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস উঠিতেছে।
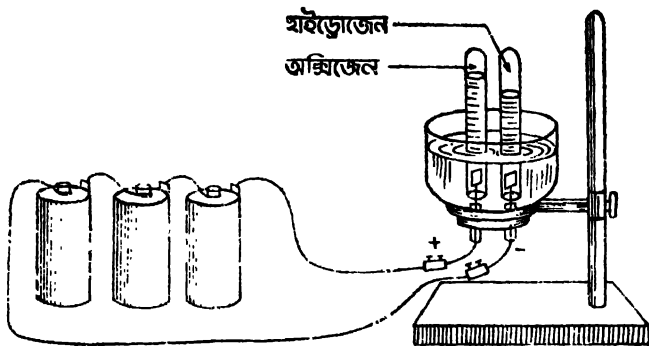
তড়িৎ-প্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জলের বিশ্লেষণ

১৫ নং চিত্র

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তড়িৎ প্রবাহের ফলে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়াছে।

তড়িৎ-বিশ্লেষণের দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুনির্মিত বোতাম, কাঁটা, ছুরি, চামচ, যন্ত্রপাতির অংশ প্রভৃতির উপর সোনা, রূপা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর আবরণ
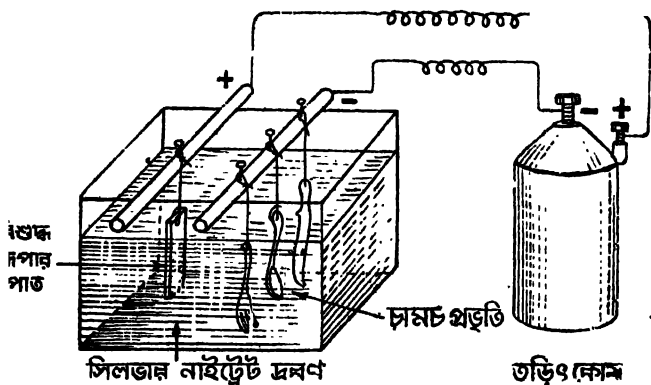
তড়িৎ-প্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তড়িৎ প্রলেপন

১৬ নং চিত্র

দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে তড়িৎ-প্রলেপন (electroplating) বলে। কোন পরিবাহী দ্রবণে, (যেমন, সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ) দুইটি দণ্ডের একটিতে বিশুদ্ধ ধাতুর পাত ও অপরটিতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ঝুলান থাকে (১৬ নং

চিত্র দেখ)। দণ্ড দুইটিতে ঋণাত্মক (–) ও ধনাত্মক (+) মেরুর সহিত যোগ করিলে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বিশুদ্ধ পাত হইতে ধাতুকণা ছুরি কাঁচি প্রভৃতির উপর জমা হইতে থাকে। ফলে, জিনিষগুলি বিশুদ্ধ ধাতুর বর্ণে
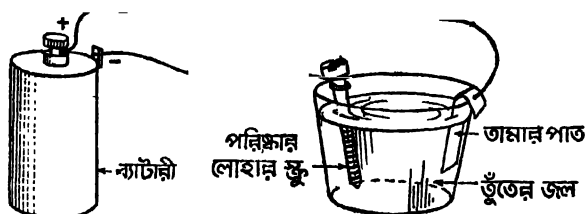
১৬ ক নং চিত্র

চকচকে হইয়া উঠে। ১৬ (ক) নং চিত্রের ন্যায় একটি পরীক্ষা তোমরা বাড়ীতে করিয়া দেখিতে পার।

(iii) **চুম্বকীয় ফল**:—কোন তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে তারের চতুর্দিকে একটি চুম্বক ক্ষেত্রের (Magnetic field) সৃষ্টি হয়। যদি তারটি একটি কার্ডবোর্ডের ভিতর দিয়া লম্বভাবে ঢুকানো থাকে এবং উহার চারিদিকে লৌহচূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে সাধারণ চুম্বক ক্ষেত্রের মত লৌহচূর্ণগুলিও বৃত্তাকারে তারের চতুর্দিকে সজ্জিত হইতে দেখা যাইবে। এই সজ্জা চুম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা (Lines of force) নির্দেশ
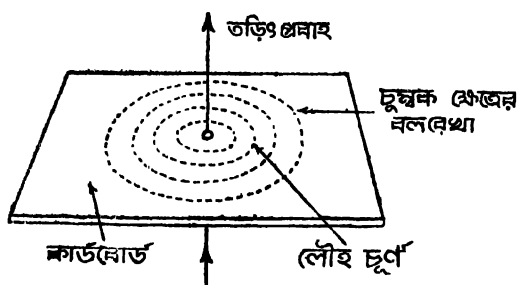
সোজা তারে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্ষেত্র
১৭ নং চিত্র

করে (১৭ নং চিত্র দেখ)। ইহা প্রমাণ করে যে তড়িৎ-বাহী তারের চতুর্দিে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া যদি তড়িৎ-বাহী তারের নিকট একটি চুম্বক-শলাকা আনা যায় তবে দেখা যাইবে শলাকাটি বিক্ষিপ্ত

হইতেছে। বিজ্ঞানী ওয়রস্টেড্ সর্বপ্রথম ইহা লক্ষ্য করেন। তাহার পরীক্ষাটি (Orested's Experiment) সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা
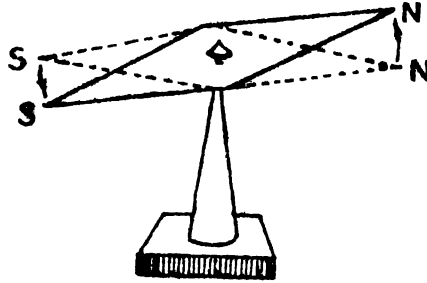
তড়িৎ প্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ
১৮ নং চিত্র

করা হইবে। তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ১৮নং চিত্রে দেখান হইল।

তড়িৎ-চুম্বক :—

তড়িৎ-বাহী তারের চুম্বকীয় ফলের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল তড়িৎ-চুম্বক (Electro-magnet)। তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে এই চুম্বক তৈয়ারী হয় বলিয়া ইহাকে **তড়িৎ-চুম্বক** বলে। নিম্নে ইহার বিষয় আলোচনা করা হইল।

প্রথমে একটি কাঁচা লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি অন্তরিত (insulated) তার দ্বারা জড়াইয়া লওয়া হয়। তারপর ঐ তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে লৌহ দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব বজায় থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে ইহার চুম্বকত্বও লোপ পায়। এইপ্রকার অস্থায়ী চুম্বককে **তড়িৎ-চুম্বক** বলে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবে দণ্ড যদি ইস্পাতের হয় তবে কিছুক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চলিবার পর ইস্পাতের দণ্ডটি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হইয়া যাইবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলেও উহার চুম্বকত্ব নষ্ট হইবে না তাই ক্ষণস্থায়ী অথচ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক-চুম্বক তৈয়ারী করিতে কাঁচা লোহার দণ্ডই ব্যবহার করা হয়, ইস্পাত

ব্যবহার করা হয় না (১৯ নং চিত্র দেখ)। তড়িৎ-চুম্বকের বিশেষত্ব এই যে ইহাকে ইচ্ছামত চুম্বকে পরিণত করা যায় আবার তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া, উহার চুম্বকত্ব লুপ্ত করাও যায়। তাহা ছাড়া প্রয়োজনমত তাদের
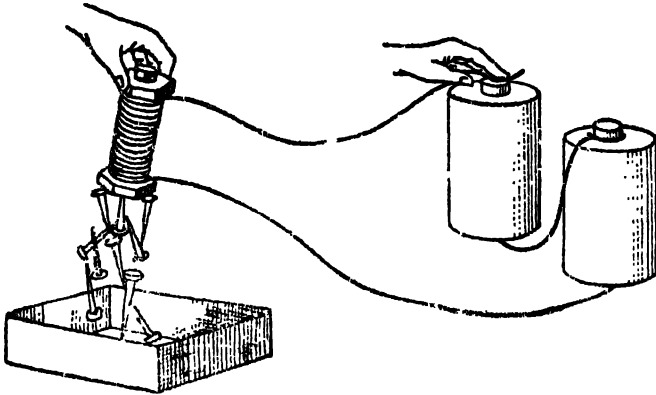
১৯ নং চিত্র—তড়িৎ চুম্বক

পাকের সংখ্যা বাড়াইয়া অথবা তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া উহাকে শক্তিশালী করা যায়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত তড়িৎ-চুম্বক কাজে
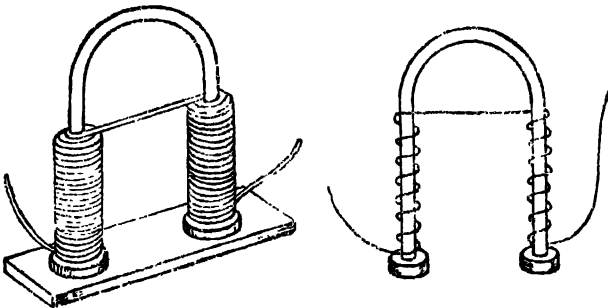
২০ নং চিত্র—অশ্বখুরাকৃতি চুম্বক

লাগানো হয় তাহাদের অধিকাংশই অশ্ব খুরের আকৃতি বিশিষ্ট হয়। (২০ নং চিত্র দেখ) উহাদের গাত্রে অন্তরিত তার জড়ানো থাকে। এবং আকৃতি অশ্ব-খুরের ন্যায় হওয়ায় চুম্বকের শক্তি খুব বেশী হয়।

৬. তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহার (Use of Electro-magnet) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric bell)—

তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহার হয় বৈদ্যুতিক ঘণ্টায়। অফিসে, আদালতে

বা বাড়িতে যে 'কলিংবেল' ব্যবহার করা হয় তাহাই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। বোতাম টিপিলেই এই ঘণ্টায় ক্রিং ক্রিং শব্দ হয়। কি করিয়া এই শব্দ
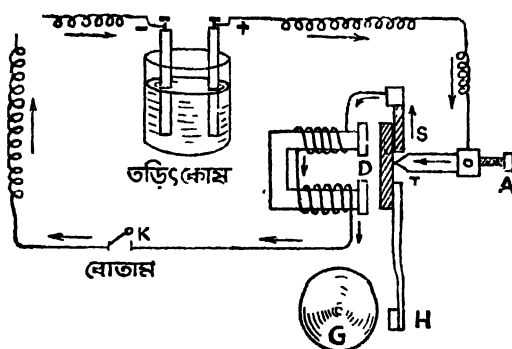
২১ নং চিত্র—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

গঠন প্রণালী :—বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিভিন্ন অংশকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে দেখান যায়। যথা—

(i) তড়িৎ কোষের ধনাত্মক মেরু (+) হইতে আরম্ভ করিয়া A স্ক্রু পর্যন্ত প্রথমাংশ।

(ii) তড়িৎ কোষের ঋণাত্মক মেরু (−) হইতে আরম্ভ করিয়া বোতাম (K), এবং অশ্ব খুরাকৃতি কাঁচা লোহার দণ্ডকে লইয়া S স্প্রিং-এর গোড়া পর্যন্ত দ্বিতীয়াংশ।

আর (iii) S-স্প্রিং, তাহার গায়ে লাগানো আর্মেচার, যাহা একটি পেটা-লোহার টুকরা, আর্মেচারের সম্মুখ প্রান্তে আটকানো হাতুড়ি (H) ও তাহার সম্মুখের G-ঘণ্টাটিকে লইয়া তৃতীয়াংশ।

কার্য-প্রণালী :—প্রথমে K-বোতাম টিপিতে হইবে। তাহার ফলে তারে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হইবে এবং ধনাত্মক মেরু (+) হইতে বাহির হইয়া A স্ক্রু, আর্মেচার (D) এবং স্প্রিং (S) এর ভিতর দিয়া অশ্বখুরাকৃতি দণ্ডে জড়ানো তারে পৌঁছাইবে। এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া K চাবির ভিতর দিয়া তড়িৎ-কোষের ঋণাত্মক (−) মেরুতে পৌঁছাইবে। এইরূপে তড়িৎ-প্রবাহের একটি বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ হইলে অশ্বখুরাকৃতি দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে D আর্মেচারটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবে।

ফলে H হাতুড়িটি G ঘণ্টার উপর আঘাত করিয়া শব্দ করিবে। কিন্তু সংগে সংগে D আর্মেচার ও A স্ক্রুর সংযোগস্থল T-তে একটি ফাঁকেরও সৃষ্টি হইবে। ইহাতে তড়িৎ-বর্তনী কাটিয়া যাইবে এবং অশ্বখুরাকৃতি চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় S স্প্রিং পুনরায় D আর্মেচারকে ঠেলিয়া A স্ক্রুতে লাগাইবে। সংগে সংগে আবার বর্তনী সম্পূর্ণ হইবে এবং পূর্বের ন্যায় আঘাতের শব্দ হইবে। এইভাবে চাবি টিপিয়া রাখা পর্যন্ত হাতুড়ির বারবার আঘাতের জন্য ক্রিং ক্রিং শব্দ হইতে থাকিবে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ছাড়াও তড়িৎ-চুম্বকের বহুবিধ ব্যবহার আছে। বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোটর, ডায়নামো প্রভৃতি যন্ত্রে ইহার ব্যবহার হয়। ইহাদের বিষয় পরে আলোচনা করা হইল।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

টেলিগ্রাফ:—ইহাতে একটি প্রেরক যন্ত্র ও একটি গ্রাহক যন্ত্র থাকে। (২২নং চিত্র দেখ)। প্রেরক যন্ত্রের চাবি (বামদিকের চিত্রে) টিপিলে লাইনের
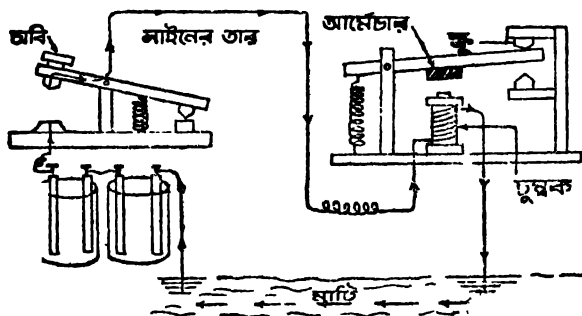
২২ নং চিত্র—টেলিগ্রাফ যন্ত্র

তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গ্রাহক যন্ত্রে (ডানদিকের চিত্রে) একটি তড়িৎ চুম্বকের সৃষ্টি করে। ফলে ইহার সম্মুখের একটি আর্মেচার আকৃষ্ট হইয়া একটি স্ক্রুতে আঘাত করে। এইরূপে প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপিয়া যেরূপ আঘাত করা হয় গ্রাহক যন্ত্রেও অনুরূপ আঘাতের সৃষ্টি হয়। এইভাবে নানারকম আঘাতের সংকেতের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠানো হয়। প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র হইতে তার মাটিতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ফলে মাটির ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পুনরায় ব্যাটারিতে ফিরিয়া আসে এবং তড়িৎ-বর্তনী পূর্ণ হয়।

টেলিফোন :—ইহার প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র একই প্রকারের থাকে। ২৩নং চিত্রে ঐরূপ একটি যন্ত্র দেখানো হইল।

এই যন্ত্রের মধ্যে একটি স্থায়ী চুম্বক থাকে। ইহার একপ্রান্তে একটি অন্তরিত (insulated) তামার তারের কুণ্ডলি জড়ানো থাকে। এই তারের

২৩ নং চিত্র—টেলিফোন যন্ত্র

প্রান্ত দুইটি লাইনের তারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কুণ্ডলীর সামনে একটি নরম লোহার পাতলা পর্দা থাকে। পর্দার সামনে কথা বলিলে ইহাতে যেরূপ কম্পনের সৃষ্টি হয় ঠিক অনুরূপ কম্পন গ্রাহক যন্ত্রেও সৃষ্টি হয়। ফলে প্রেরক যন্ত্রের কথাগুলি গ্রাহক যন্ত্রে পুনরাবৃত্তি ঘটে।

তড়িৎ চুম্বকের পারস্পরিক ক্রিয়া (Interation of Electric current and Magnetism):—তড়িৎপ্রবাহের ফল আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখায়াছি যে উহার একটি চুম্বকীয় ফলও আছে। অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহের নিকটে অবস্থিত কোন চুম্বক-শলাকা তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। আবার, অপর পক্ষে চুম্বক শলাকাও তড়িৎবাহী তারকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে। চুম্বক ও তড়িৎবাহী তারের এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাই আমরা এখানে আলোচনা করিব।

চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়া (Action of electric current of magnet):—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়রষ্টেড্ (Oersted) প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখান যে একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ চালনা করিলে ইহার নিকটস্থ কোন চুম্বক শলাকা বিক্ষিপ্ত হয়। চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ, তড়িৎপ্রবাহের দিক বা তারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। নিম্নের পরীক্ষা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

ওয়রষ্টেডের পরীক্ষা (Oersted's Experiment):—

AB একটি পরিবাহী তার। উহাকে উত্তর-দক্ষিণমুখী অবস্থায় রাখা আছে। তারের নিচে একটি চুম্বক শলাকা রাখা আছে। যখন তারের ভিতর

দিয়া কোন তড়িৎপ্রবাহ চলে না তখন চুম্বক শলাকাটি তারের সমান্তরাল ভাবে উত্তর দক্ষিণমুখী ভাবে অবস্থান করে (২৪ক নং চিত্রে কাটা কাটা রেখা
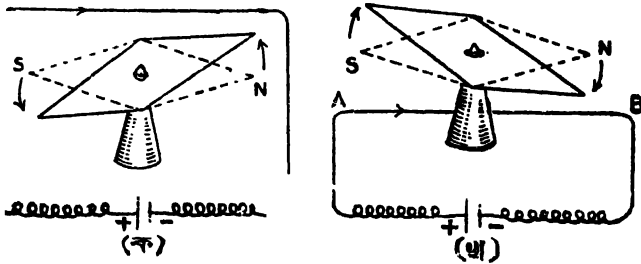
তড়িৎ-প্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার নিক্ষেপ

২৪ নং চিত্র

দ্বারা অবস্থানটি দেখান হইল)। কিন্তু যেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করা হয় অমনি চুম্বক-শলাকাটি বিক্ষিপ্ত হয়। যদি তারটি শলাকার নিচ দিয়া নেওয়া হয় তবে বিক্ষেপ উল্টা দিকে হয় (২৪খ নং চিত্র দেখ)। অথবা, তড়িৎপ্রবাহ যদি বিপরীত মুখী করা যায় অর্থাৎ A হইতে B-এর দিকে প্রবাহিত না করিয়া B হইতে A-এর দিকে প্রবাহিত করা হয় তবে শলাকার বিক্ষেপও বিপরীত মুখী হইবে।

নানাবিধ উপায়ে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের দিক্-নির্ণয় করা যায়। নিম্নে অ্যাম্পিয়ারের সাঁতারের (Ampere's swiming Rule) নিয়মটির ব্যাখ্যা করা হইল। মনে কর একজন সাঁতারু চুম্বকের দিকে মুখ রাখিয়া তড়িৎ-

সাঁতারুর বাম হাতের দিকে চুম্বকের উত্তর-মেরু বিক্ষিপ্ত হয়
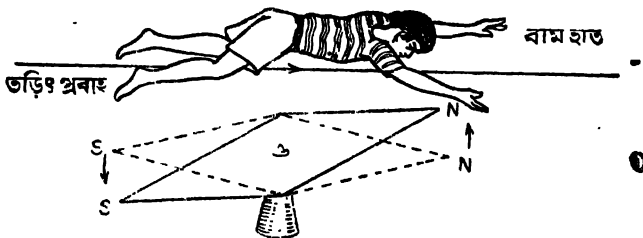
২৫ নং চিত্র

প্রবাহের অনুকূলে সাঁতার কাটিতেছে। এইরূপ মনে করিলে তাহার বাম হাতের দিকে চুম্বকের উত্তর মেরু বিক্ষিপ্ত হইবে (২৫নং চিত্র দেখ)।

তড়িৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া (Action of magnet on current) :—

বৈজ্ঞানিক নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়া আছে। তাই তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চুম্বক শলাকার উপর ক্রিয়া করে তেমনি চুম্বক শলাকাও তড়িৎ-প্রবাহের উপর একটি সমান প্রতিক্রিয়ার (reaction) সৃষ্টি করে। চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া দেখাইবার সময় তারটিকে স্থির রাখিয়া চুম্বক শলাকাটি যাহাতে বিনা বাধায় ঘুরিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু যদি চুম্বক শলাকাটি স্থির রাখিয়া তারটিকে চলনশীল রাখার ব্যবস্থা করা হইত তবে দেখা যাইত চুম্বক শলাকার প্রতিক্রিয়ার ফলে তারটি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ প্রমাণিত হইল যে চুম্বকও তড়িৎ-প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তড়িৎ-প্রবাহের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া দেখাইবার জন্য বিজ্ঞানী ফ্যারাডে একটি সহজ পরীক্ষার প্রবর্তন করেন।

ফ্যারাডের ঘূর্ণায়মান তারের পরীক্ষা (Faradays rotating wire Experiment) :—ইহাতে একটি কাচনলের উপরের দিক ছিপি দিয়া বন্ধ করা থাকে। উপরের মুখের ছিপি হইতে হুকের সাহায্যে একটি তামার তার এমনভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে তারটির অপর প্রান্ত নলটির নিচের দিকে রাখা পারদের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। SN একটি চুম্বক। উহার উত্তর মেরু (N) পারদের ভিতর দিয়া নলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো থাকে। (২৬ নং চিত্র দেখ, এখন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে তারটি ঐ চুম্বকের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকিবে। আবার তড়িৎ-প্রবাহের গতিমুখ পরিবর্তন করিলে তারটিও বিপরীত পাকে ঘুরিতে থাকিবে। তারটি কখন কোন পাকে ঘুরিবে তাহা ফ্লেমিং-এর 'বাম-হস্তের নিয়ম' অনুযায়ী বাহির করা যায়।
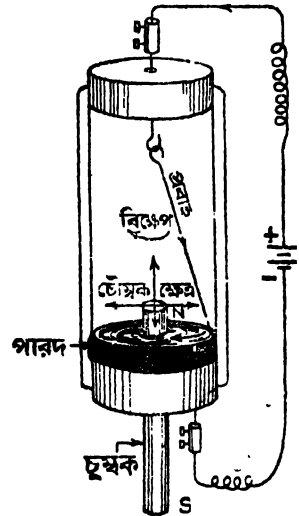
২৬নং চিত্র—ফ্যারাডের ঘূর্ণায়মান তার

ফ্লেমিং-এর বাম-হস্তের নিয়ম (Fleming's left-hand rule) :— বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী, তর্জনী ও মধ্যমা এমনভাবে প্রসারিত কর যেন উহারা পরস্পর সমকোণে থাকে (২১ নং চিত্র দেখ)। এই অবস্থায় যদি তর্জনী
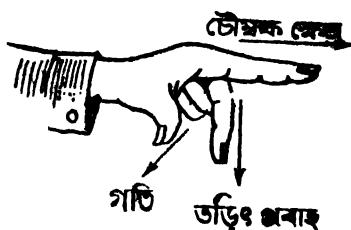
ফ্লেমিং-এর বাম হস্তের নিয়ম
২১ নং চিত্র

চৌম্বক ক্ষেত্রের নির্দেশ করে এবং মধ্যমা তড়িৎ-প্রবাহের দিক নির্দেশ করে, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলী নির্দেশ করিবে তড়িৎবাহী তারের বিক্ষেপের দিক।

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ
(Electro-magnatic Induction)

বিজ্ঞানী ফ্যারাডে পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে একটি বদ্ধ কুণ্ডলীর (closed circuit) ভিতরে চুম্বক দণ্ডের একটি মেরু বা অন্য কোন চুম্বকীয় ক্ষেত্র খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাইলে কুণ্ডলীর তারে একটি ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আবার ইহাদিগকে কুণ্ডলী হইতে দ্রুত বাহির করিবার সময়ও বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যে আপেক্ষিক গতির ফলে কুণ্ডলীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই ব্যাপারটিকে **তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ** (Electro-magnetic Induction) বলা হয়।

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত পরীক্ষা :—

(A) চুম্বক দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহ (Current induced by a magnet) :—একটি কার্ড বোর্ডের চোঙের উপর তামার তারের অনেকগুলি পাক (turn) দিয়া একটি ঘন কুণ্ডলী প্রস্তুত কর। কুণ্ডলিটিকে খাড়াভাবে

টেবিলের ওপর রাখিয়া তারের প্রান্ত দুইটি গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের দুই প্রান্তের সহিত সংযুক্ত কর। (গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে আমরা কোন তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও প্রবাহের দিক নির্ণয় করিতে পারি)। (a) এখন একটি দণ্ড চুম্বকের এক প্রান্ত খুব তাড়াতাড়ি কুণ্ডলীটির মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। দেখিবে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা এক দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে (২৮ নং চিত্র
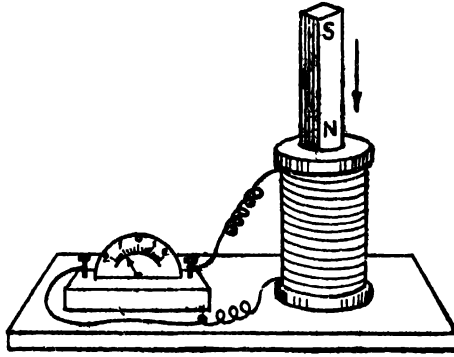
চুম্বক-দণ্ডের দ্রুত কুণ্ডলীতে প্রবেশ করানো হইতেছে

২৮ নং চিত্র

দেখ)। ইহাতে বুঝা যায় যে চুম্বক কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। (b) আবার চুম্বকটিকে কুণ্ডলীর ভিতর স্থির রাখ দেখিবে কোন প্রবাহের সৃষ্টি করিবে না। ফলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা পুনরায় শূন্য দাগে
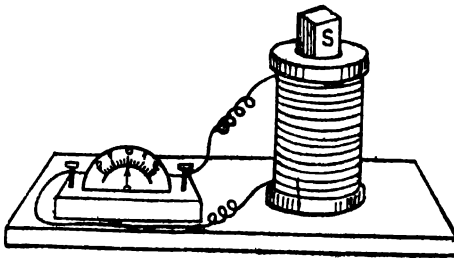
চুম্বকটি কুণ্ডলীর মধ্যে স্থির আছে

২৯ নং চিত্র

ফিরিয়া যাইবে। (২৯ নং চিত্র দেখ)। (c) এইবার চুম্বকটি কুণ্ডলীর ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির করিয়া আন দেখিবে এইবারও গ্যালভানোমিটারের

কাঁটা বিক্ষিপ্ত হইবে। তবে এক্ষেত্রে কাঁটা, চুম্বক প্রবেশ করাইবার সময় যেদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার বিপরীত দিকে হইবে। (৩০ নং চিত্র দেখ)
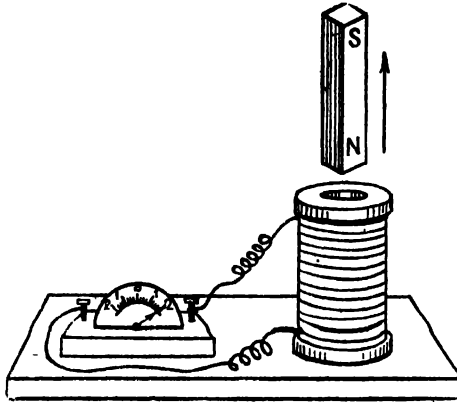
৩০ নং চিত্র—চুম্বকটিকে হঠাৎ কুণ্ডলী হইতে বাহির করা হইল

নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিও তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। (i) যদি চুম্বক দণ্ডটিকে ধীরে ধীরে তারের কুণ্ডলীতে প্রবেশ করাও তবে কোনরূপ প্রবাহের সৃষ্টি হইবে না। (ii) যদি চুম্বকের উত্তর মেরুর পরিবর্তে দক্ষিণ মেরু প্রবেশ করাও তার গ্যালভানোমিটারের কাঁটা বিপরীত দিকে ঘুরিবে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন হইবে। (iii) আবার যদি চুম্বকটিকে স্থির রাখিয়া কুণ্ডলীটিকে গতিশীল কর তখনও তারে আবিষ্ট প্রবাহের সৃষ্টি হইবে।

(B) **তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহ** (Current induced by current) :—কোন তারের কুণ্ডলী বা সলিনয়েডের (Solenoid) মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে তাহা চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে। সুতরাং কোন দণ্ড চুম্বকের পরিবর্তে যদি কোন তড়িৎযুক্ত ছোট তারের কুণ্ডলী কোন বড় তড়িৎবিহীন তারের কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকান যায় (৩১ নং চিত্র দেখ) তবে উপরোক্ত পরীক্ষার ন্যায় সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ আমরা ছোট কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করিয়া বড় কুণ্ডলীটিতে আবিষ্ট প্রবাহের সৃষ্টি করিতে পারি।

তড়িতোৎপাদক যন্ত্র (Generator) **তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নীতি প্রয়োগ** :—উপরের আলোচনা হইতে বোঝা গেল চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যে

আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি করিতে পারিলেই ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কেন? কারণ, চুম্বকের মেরুর সম্মুখে অসংখ্য চৌম্বক
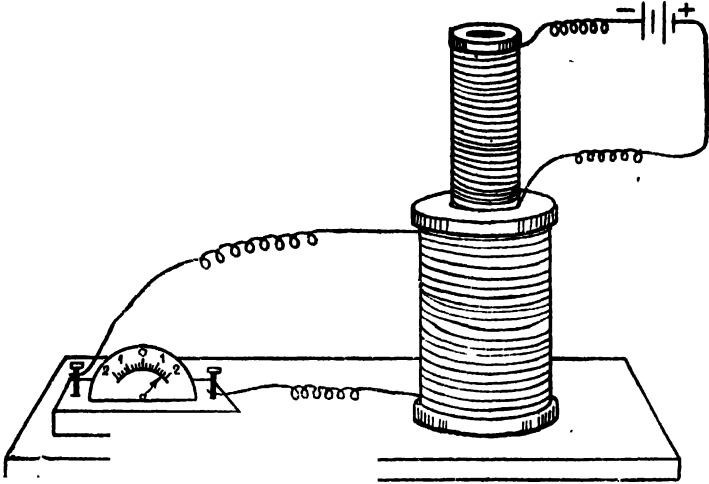
৩১ নং চিত্র—তড়িৎযুক্ত তারের কুণ্ডলীর সাহায্যে আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি

বলরেখা (Magnetic Lines of Force) থাকে। চুম্বকটিকে কুণ্ডলীর মধ্যে ওঠানামা করাইবার সময় বলরেখাগুলি কুণ্ডলী দ্বারা ছিন্ন হয় এবং ছিন্ন
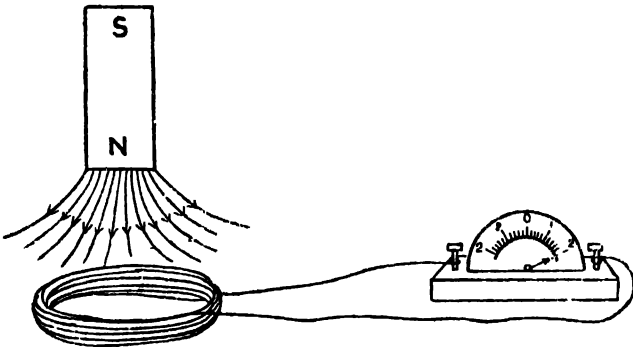
৩২ নং চিত্র—কুণ্ডলী কর্তৃক চুম্বক বলরেখাগুলি ছিন্ন হইতেছে

বলরেখাগুলির সংখ্যার তারতম্য ঘটে। সংখ্যার এইরূপ তারতম্যের জন্যই কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় (৩২ নং চিত্র দেখ)। অবশ্য চুম্বকটিকে স্থির রাখিলে উহার মেরুর সম্মুখে কুণ্ডলীটিকে ঘুরাইলেও ছিন্ন বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হইবে। এবং ইহাতেও কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহের

সৃষ্টি হইবে। আবার কুণ্ডলিটিকে চুম্বকের সম্মুখে ঘোরান অনেক সহজ সেইজন্য এই পদ্ধতিটিই তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রে (Generator) প্রয়োগ করা হয়। তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রকে ডায়নামো (Dynamo) বলা হয়।

ডায়নামো (Dynamo) :—ডায়নামো হইতে আমরা ব্যাটারী অপেক্ষা অনেক অল্প খরচে অনেক বেশী পরিমাণে তড়িৎ পাইয়া থাকি। আধুনিক যুগে ডায়নামোই তড়িৎ উৎপাদনের প্রধান উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়। উহাকে একটি বদ্ধ কুণ্ডলীকে (closed circuit) কোন শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অনবরত ঘুরাইয়া আবিষ্ট-তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে উৎপন্ন
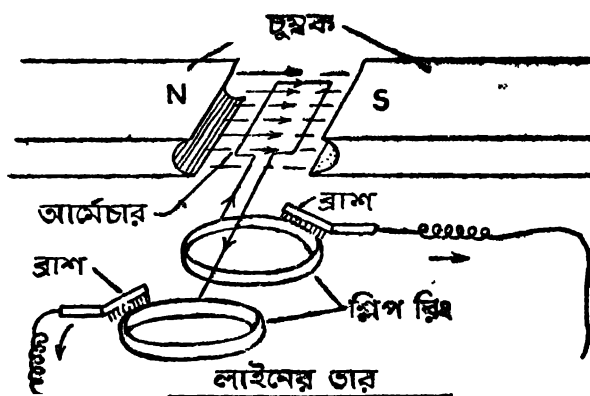
৩৩ নং চিত্র—ডায়নামোর কার্য প্রণালী

তড়িৎকে দুইটি আংটি (slip rings) ও দুইটি ব্রাশ (brush) এর সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লাইনের তারে পাঠানো হয়। (৩৩ নং চিত্র দেখ)

একটি নরম লোহার চোঙের উপর তার জড়াইয়া কুণ্ডলীটি প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে আর্মেচার (armature) বলে। আর্মেচারটিকে তৈল বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন (oil or steam engine) দ্বারা ঘুরান হয়। নদী স্রোতের শক্তি দ্বারাও ইহাকে ঘুরান যায়। নদীস্রোতের শক্তিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে জল-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ডায়নামো এমন একটি যন্ত্র যাহার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। ডায়নামোর তড়িৎ-উৎপাদন শক্তি নির্ভর করে (i) চুম্বকের শক্তি, (ii) আর্মেচারের ঘূর্ণনের হার এবং (iii) বর্তনীতে তারের পাকের (turns of wire) সংখ্যার উপর। ডায়নামো দুই প্রকারের হয়। যথা :

(i) পরবর্তী প্রবাহের ডায়নামো (A.C. generator) এবং (ii) অপরিবর্তী বা সমপ্রবাহ ডায়নামো (D.C. generator)।

বৈদ্যুতিক মোটর (Electirc moter):—ডায়নামোর সাহায্যে আমরা যান্ত্রিক-শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করি। কিন্তু বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তিকে যান্ত্রিক-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। ইহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক পাখা, জলের পাম্প, গমভাঙ্গার যাঁতা, ট্রাম, বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক-শক্তি উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈদ্যুতিক মোটরের কাজ ডায়নামোর কাজের ঠিক বিপরীত।

মোটরের গঠন প্রণালী ডায়নামোর অনুরূপ। ইহাতেও ডায়নামোর ন্যায় আর্মেচার, শক্তিশালী চুম্বক, ব্রাশ, রিং প্রভৃতি থাকে (৩৪ নং চিত্র দেখ)।
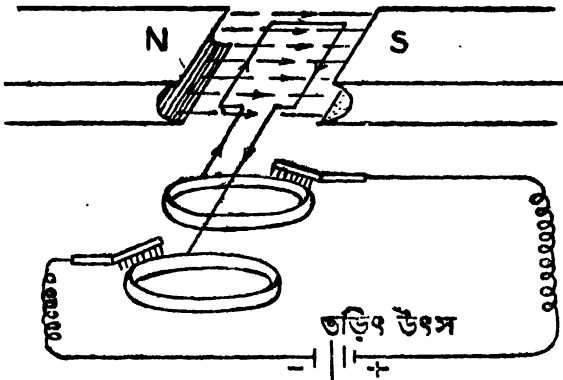
৩৪ নং চিত্র—বৈদ্যুতিক মোটরের কার্য প্রণালী

কিন্তু ইহার কার্যপ্রণালী ডায়নামোর বিপরীত। ডায়নামোর মত রিং ও ব্রাশের সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ লাইনের তারে যায় না। এক্ষেত্রে বাহিরের কোন তড়িৎ উৎস (Generator) হইতে রিং ও ব্রাশের সাহায্যে আর্মেচারে তড়িৎ-প্রবাহ প্রবেশ করে। ফলে আর্মেচারটি বিক্ষিপ্ত হয় এবং ফ্লেমিং-এর বামহস্ত-সূত্র অনুযায়ী ঘুরিতে থাকে। তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া বা শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করিয়া আর্মেচারের ঘূর্ণনের শক্তিকে বাড়ান যায়। এখানে চুম্বকটি স্থির বলিয়া তড়িৎবাহী কুণ্ডলীটির (armature) বিক্ষেপ ঘটিয়াছে। (ফ্যারাডের ঘূর্ণায়মান তারের পরীক্ষাটি দ্রষ্টব্য)

ফিউজ তার (Fuse wire)—তোমরা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে একটি চীনামাটির বাক্সের সংযোগ থাকে।

বাক্সটিতে থাকে একটি ছোট তার (৩৫ক নং চিত্র দেখ)। তারটি টিন ও সীসার মিশ্রণে তৈয়ারী থাকে। ইহার গলনাংক লাইনের তারের গলনাংক অপেক্ষা কম থাকে। ইহাকে লাইনের তারের সঙ্গে এমন ভাবে সংযোগ করা হয় যাহাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ ইহার ভিতর ছাড়া বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা প্রভৃতিতে যাইতে পারে (৩৫খ নং চিত্র দেখ)। কোন কারণে যদি লাইনের দুইটি তার এক সঙ্গে ঠেকিয়া যায় বা অন্য কোন কারণে লাইনে তড়িৎ-প্রবাহের বাধা
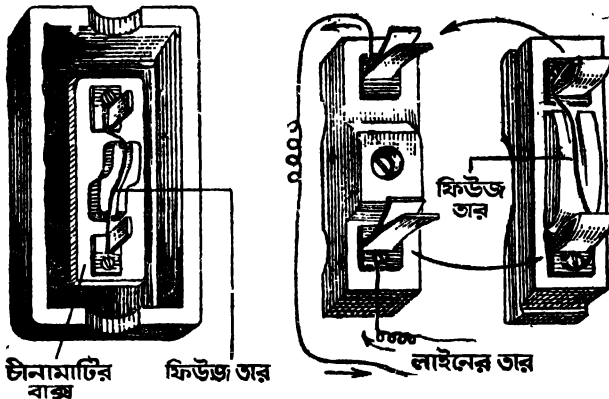
৩৫ ক নং চিত্র—চিনামাটির বাক্স

৩৫ খ নং চিত্র—দুইটি কাঠামো এক সঙ্গে সংস্থাপন করিয়া লাইনের তারের সঙ্গে ফিউজ তারের সংযোগ সাধন করা হয়

(resistance) কমিয়া আসে তবে বর্তনীতে (circuit) প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ হয়। তাহাতে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহা লাইনের তারকে পুড়াইয়া দিতে পারে এবং অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ প্রথমে ফিউজ তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই ফিউজ তারটি গলিয়া যায় এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের পথ কাটিয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফিউজ তার লাইনেরই একটি দুর্বল অংশ যাহা নিজের জীবন দিয়া সমস্ত লাইনকে রক্ষা করে।

বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র (Electric heater) :—বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপীয় ফলের কথা তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ। যদি উচ্চ রোধ বিশিষ্ট সরু তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করা যায় তবে তারটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই তাপকে কাজে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক হিটার, কেট্‌লি, ইস্ত্রি, তাপ-বিকিরক (heat radiotor), বৈদ্যুতিক-চুল্লী প্রভৃতি তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্র তৈয়ারী

হইয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ ফিউজ তার সহজেই গলিয়া যায়। সুতরাং হিটারের তার এমন হওয়া দরকার যাহাতে ইহা উচ্চতাপে না গলে অথচ তাহার রোধশক্তি অত্যন্ত বেশী থাকে। নিকেল, ক্রোমিয়াম ও লৌহ মিশাইয়া এক প্রকার সংকর-ধাতু প্রস্তুত করিয়া এই প্রকার তার তৈয়ারী করা হয়। উহাকে নাইক্রোম (Nichorome) তার বলে। তারটিকে কুণ্ডলীর আকারে কোন তাপসহ এবং বিদ্যুৎ অন্তরকযুক্ত (insulator) [যেমন অভ্র বা পোড়া
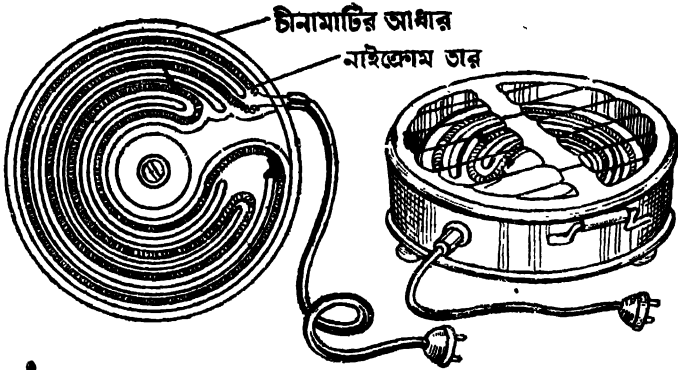
চীনামাটির পাত্রে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী
৩৬ ক নং চিত্র

বৈদ্যুতিক হিটার
৩৬ খ নং চিত্র

চীনামাটির পাত্র] কোন আধারের খাঁজে খাঁজে রাখা হয়। (৩৬ ক নং চিত্র দেখ)

কুণ্ডলীসহ চীনামাটির আধারটি আবার আর একটি ধাতব-আধারের মধ্যে বসান থাকে (৩৬ খ নং চিত্র দেখ)। কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহিত হইলে, কুণ্ডলীটি লোহিত-তপ্ত হইয়া উঠে এবং তাপ বিকিরণ করে। এই তাপশক্তি ব্যবহার করিয়া রান্না, জল গরম, শীতের সময় ঘর গরম রাখা প্রভৃতি কাজ করা যায়। তাপ বিকিরক যন্ত্রেও উপরোক্ত উপায়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়। তবে ইহাতে নাইক্রোম কুণ্ডলীটিকে একটি অবতল দর্পণের কেন্দ্রে রাখা হয়। ফলে বিকিরিত তাপরশ্মি দর্পণের দ্বারা কেন্দ্রীভূত হয়। শীতপ্রধান দেশে ঘর-বাড়ী গরম করিবার জন্য এই প্রকার তাপযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বেগ-নিয়ামক বা রেগুলেটর (Regulator)

একটি কাঁটাকে ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক পাখার বেগ কমানো বা বাড়ানো যায়, ইহা হয়তো তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। এই যে ব্যবস্থা, যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ

প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ হয় তাহাকে বেগ-নিয়ামক বা রেগুলেটর (Regulator) বলে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ রেগুলেটর কাঁটার ভিতর দিয়া পাখায় পৌছায়। (৩৭ খ নং চিত্র দেখ)। কাঁটাটিকে ঘুরাইয়া বিভিন্ন রোধকুণ্ডলী *a*, *b*, *c*, *d*, প্রভৃতিকে তড়িৎ প্রবাহের পথ স্থাপন করা যায়। মনে রাখিবে তড়িৎ-প্রবাহের পথে রোধ (resistance) যত বাড়িবে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা তত কম হইবে। যদি
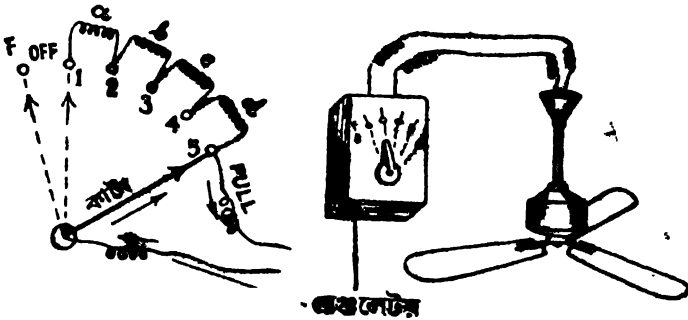
কাঁটার সাহায্যে রেগুলেটরের ভিতরের বিভিন্ন রোধকুণ্ডলীর সংযোগ করা হয়
৩৭ ক নং চিত্র

বিদ্যুৎ প্রবাহ রেগুলেটরের ভিতর দিয়া পাখায় পৌছায়
৩৭ খ নং চিত্র

কাঁটাটিকে 4 নং, বিন্দুতে সংযোগ করা হয় তবে *d* রোধকুণ্ডলীটি তড়িৎ-প্রবাহের পথে পড়িবে এবং ফলে পাখায় তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা কিছু কম হইবে (৩৭ ক নং চিত্র দেখ)। যদি 1 নং বিন্দুতে সংযোগ করা হয় তবে *a*, *b*, *c*, *d* প্রভৃতি সব কয়টি রোধক-কুণ্ডলীই তড়িৎ-প্রবাহের পথে পড়িবে। ইহাতে প্রবাহ মাত্রা খুবই কম হইবে এবং পাখা আস্তে আস্তে ঘুরিবে। আর যদি *F* বিন্দুতে কাঁটা রাখা হয় তবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পথ কাটিয়া যাইবে এবং পাখা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

বৈদ্যুতিক বাতি (Electric Bulb) :—উচ্চ গলনাঙ্ক ও রোধ বিশিষ্ট সরু তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং শেষ পর্যন্ত ভাস্বর হইয়া আলো বিকিরণ করে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত হইয়াছে। নিম্নে কয়েক প্রকার বৈদ্যুতিক বাতির উল্লেখ করা হইল।

(i) **কার্বন ফিলামেন্টের বাতি** :—এই বাতি সর্বপ্রথম মার্কিন বিজ্ঞানী এডিসন আবিষ্কার করেন। ইহাতে একটি বায়ু শূন্য বাল্বের মধ্যে

কার্বনের একটি সরু তার ঢুকানো থাকে [৩৮ নং চিত্র দেখ]। সরু তারটিকে ফিলামেণ্ট (filament) বলে। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এই সরু তারটি ভাস্বর হইয়া আলো বিতরণ করে। বাল্‌বটি বায়ুশূন্য থাকায় ফিলামেণ্টের কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। এই বাতির আলো পীতাভ (সাদা নয়) হয়; আলো বেশী হয় না এবং কাঁপে। অনেকদিন ব্যবহারে বাল্‌বটি কালো হইয়া যায়। আজকাল টাংস্টেন বা কুণ্ডলিত টাংস্টেনের ফিলামেণ্ট ব্যবহার করিয়া ঐ সমস্ত অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। তাই কার্বন বাতির প্রচলন আজকাল আর বিশেষ নাই।

(ii) **সোজা তারের টাংস্টেন বাতি** :—ইহাও কার্বন বাতির মতই একটি বায়ুশূন্য বাল্‌ব। কার্বন ফিলামেণ্টের বদলে ইহাতে কতকগুলি সোজা-
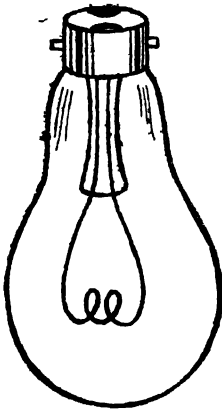
৩৮ নং চিত্র—কার্বন ফিলামেণ্ট বাতি
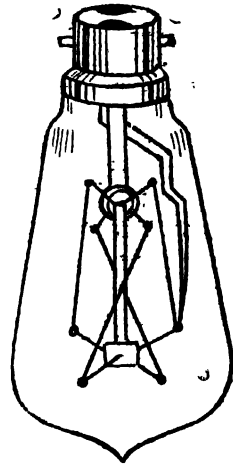
৩৯ নং চিত্র—সোজা তারের টাংস্টেন বাতি

তারের টাংস্টেন ফিলামেণ্ট ব্যবহার করা হয় (৩৯নং চিত্র দেখ)। এই প্রকার বাতির আলো বেশী হয় এবং আলো কাঁপে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার কয়েকটি ত্রুটি আছে। অতিরিক্ত তাপে ফিলামেণ্ট বাষ্পীভূত হইয়া বাল্‌বটিকে ক্রমশঃ কালো করিয়া ফেলে এবং ফিলামেণ্টও বেশী দিন টিকে না।

কুণ্ডলীত তারের টাংস্টেন বাতি :—ইহাও পূর্বের বর্ণীত বাতিগুলির মতই দেখিতে, তবে ইহাতে টাংস্টেনের ফিলামেণ্টকে কুণ্ডলীত করিয়া দেওয়া

হয় [৪০ (ক ও খ) নং চিত্র দেখ]। তাছাড়া বাল্‌বটি বায়ুশূন্য না রাখিয়া তাহার মধ্যে কিছু পরিমাণ নিষ্ক্রিয় (inert) গ্যাস, যেমন—আরগন্‌ নিয়ন,
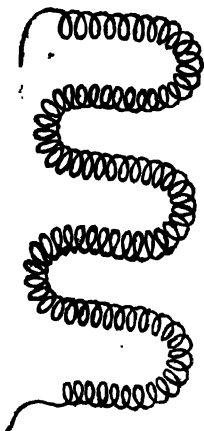
৪০ ক নং চিত্র—কুণ্ডলীত ফিলামেণ্ট
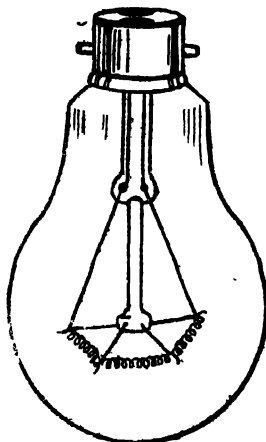
৪০ খ নং চিত্র- কুণ্ডলীত তারের টাংষ্টেন বাতি

প্রভৃতি ভর্তি থাকে। ইহাতে টাংস্টেনের ক্ষয় বহুল পরিমাণ হ্রাস পায় এবং বাল্‌বটিও কালো হয় না। এই প্রকার বাতিই আজকাল অধিক প্রচলিত।

প্রশ্নাবলী

1. চিত্রসহ একটি সরল ভোল্টার কোষের বিবরণ দাও এবং উহার কার্য প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. তড়িৎ কোষে তড়িৎ-প্রবাহ কি ভাবে স্থায়ী হয় তাহার ব্যাখ্যা কর।

3. লেক্‌লান্সে কোষের বর্ণনা দাও। ইহার সহিত ডেনিয়েল কোষের তফাৎ কি ?

4. চিত্রসহ ডেনিয়েল কোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং ইহার কার্য-প্রণালী লেখ।

5. তড়িৎ প্রবাহের বিভিন্ন ফলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলিতে কি বুঝ? জলকে কি উপায়ে তড়ি-বিশ্লেষণ করা যায় তাহা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

7. টীকা লিখ :—

(a) তড়িৎ-প্রলেপন, (b) ওয়রষ্টেডের পরীক্ষা,

(c) গ্যালভানির পরীক্ষা, (d) তড়িৎ চুম্বক,

(e) ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম।

8. একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

9. চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

10, ফ্যারাডের ঘূর্ণায়মান তারের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। ইহা কি প্রমাণ করে?

11. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও :—

(a) টেলিগ্রাফ, (b) টেলিফোন,

(c) ফিউজ তার, (d) মোটর,

(e) ডায়নামো।

12. তোমাকে একটি তারের কুণ্ডলী, একটি চুম্বক ও একটি গ্যালভানোমিটার দেওয়া হইল। ইহাদের দ্বারা তুমি কি কি উপায়ে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ঘটনাগুলির পরীক্ষা করিবে।

13. আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ কাহাকে বলে? একটি চুম্বক ও একটি কুণ্ডলীর সাহায্যে আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবার একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

14. এমন কয়েকটি যন্ত্রের নাম কর যাহাতে তড়িৎ- চুম্বকীয় আবেশের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের যে কোন একটির চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও।

15. বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক বাতির নাম কর এবং ইহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

16. বৈদ্যুতিক পাখার গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং কি ভাবে তাহা করা হয়—বুঝাইয়া লিখ।

17. নাইক্রোম তার বলিতে কি বুঝ? এমন একটি জিনিষের বর্ণনা দাও যাহাতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

18. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(i) তড়িৎ-চুম্বকে কাঁচা লোহার ব্যবহার হয়।

(ii) ফিউজ তারের বাক্সটি চীনামাটির তৈয়ারী থাকে।

(iii) ডেনিয়েল কোষে একটি তাকে কিছু তুঁতের টুকরা রাখা হয়।

(iv) আজকাল বৈদ্যুতিক বাতিতে কার্বন তারের ব্যবহার কম হয়।

Objective test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

A. True or False type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহার পার্শ্বে T এবং যেগুলি ভুল তাহার পার্শ্বে F লিখ :—

(i) তড়িৎ সর্বদাই উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়।

(ii) বৈদ্যুতিক মোটরে যান্ত্রিক শক্তির পরিবর্তে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়।

(iii) সরল টেলিগ্রাফ যন্ত্রে মাটিও তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ করিবার জন্য অংশ গ্রহণ করে।

(iv) মোটর ও ডায়নামোর কার্যপ্রণালী অভিন্ন।

(v) টর্চের ব্যাটারীকে লেক্লান্সে কোষের একটু পরিবর্তিত রূপ বলা যাইতে পারে।

(vi) তড়িৎ কোষে আমরা তড়িৎ-শক্তির পরিবর্তে রাসায়নিক শক্তি পাই।

B. 'Yes' or 'No' type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি হ্যাঁ বা না লিখিয়া উত্তর কর।

(i) মোটর কি তড়িৎ উৎপাদন করে?

(ii) বৈদ্যুতিক বেল আর কলিং বেল কি এক জিনিষ?

(iii) সময় সময় টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে কথাবার্তাও হইতে পারে কি?

(iv) লেক্লান্সে কোষে নিশাদলের দ্রবণ ব্যবহার করা হয় কি?

(v) তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে ইহার নিকটবর্তী চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের দিক পরিবর্তন হয় কি?

C. Multiple Choice type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির কয়েকটি করিয়া সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তর সঠিক তাহার নিচে দাগ দাও।

(i) সরল তড়িৎ-কোষ কে আবিষ্কার করেন?

—ওয়রস্টেড্, ভোল্টা, ফ্যারাডে।

(ii) বিদ্যুৎ-প্রবাহের তাপীয় ফলের প্রয়োগ কোন্‌টিতে হয় ?
—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, হিটার, ডায়নামো।

(iii) দূরবর্তী স্থানে কথাবার্তা বলার জন্য কোন্ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় ?
—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, কলিং বেল।

(iv) কোন্ যন্ত্রটিতে নাইক্রোম তার ব্যবহার করা হয় ?
—রেগুলেটর, হিটার, ফ্লুরেসেন্ট বাতি।

D. Recall type test.

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী চুম্বক শলাকার—নির্ণয় করা যায়।

(ii) কোন্ কুণ্ডলীকে চুম্বক মেরুর সম্মুখে ঘুরাইলে ছিন্ন—সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

(iii) নদীস্রোতের দ্বারা বিদ্যুৎকে—বলে।

(iv) মোটরের কাজ—কাজের ঠিক বিপরীত।

(v) তড়িৎবাহী লাইনের তারে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই—গলিয়া যায়।

E. Association type test.

:: চিহ্নের বামদিকের দুইটির শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক ডান দিকের শব্দ দুইটির মধ্যেও সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। ডান দিকের একটি শব্দ দেওয়া আছে। অপর শব্দটি লিখ।

(i) চুম্বকীয় আবেশ :: ডায়নামো :: তড়িৎ চুম্বক :—।

(ii) ডায়নামো :: তড়িৎ শক্তি :: মোটর :—।

(iii) নাইক্রোম তার :: হিটার :: টাংস্টেন তার :—

(iv) তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়া :: ওয়রস্টেড্ :: সরল কোষ :—।

(v) তড়িৎ প্রলেপন :: চুম্বকের রাসায়নিক ফল :: তড়িৎ-ইস্ত্রি :—।
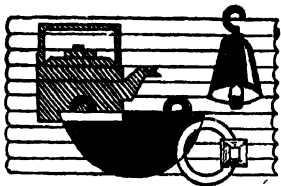
তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু এবং সঙ্কর ধাতু

METALS AND ALLOYS

কয়েকটি ধাতুর অবস্থান (occurrence), ভৌত ধর্ম (physical properties) এবং ব্যবহার (uses) :—

লোহা, তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতুসমূহ আমরা সাধারণতঃ যে অবস্থায় দেখিতে পাই প্রকৃতিতে তাহাদিগকে সেইরকম অবস্থায় পাওয়া যায় না। উহারা খনিতে অন্যান্য পদার্থের সংগে যৌগিক অবস্থায় থাকে। এই সকল যৌগিক পদার্থকে **খনিজ পদার্থ** (minerals) বলে। সকল খনিজ পদার্থ হইতেই ধাতু নিষ্কাশন করা যায় না বা আর্থিক দিক দিয়া লাভজনকও হয় না। যে খনিজ হইতে সহজে এবং সুলভে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাহাকে **আকরিক** (ore) বলে। সাধারণত আকরিকগুলি ধাতুর অক্সাইড, কার্বনেট, ও সালফাইড রূপে পাওয়া যায়।

লৌহ (Iron)

অবস্থান (Occurrence) :—ভারতবর্ষের উড়িষ্যা, বিহার, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশে লোহার উত্তম আকরিক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায়ও কিছু পরিমাণ আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। **হিমাটাইট, পারাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট** প্রভৃতি লোহার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম। বর্তমান ভারতবর্ষে পাঁচটি বিরাট লৌহ-উৎপাদন কারখানা আছে। যথা—জামসেদপুর, বার্ণপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুর।

ভৌত ধর্ম (Physical properties) :—

লোহা সাধারণতঃ তিন প্রকারের তৈয়ারী করা হয়, যথা—কাস্ট আয়রণ (cast iron) বা ঢালাই লোহা, রট আয়রণ (wrought iron) বা পেটা লোহা এবং ষ্টিল (steel) বা ইস্পাত। এই তিনপ্রকারের লোহায় বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন

মিশ্রিত থাকে। ফলে ইহাদের ধর্মেরও কিছু কিছু তফাৎ হয়। নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের ধর্মের কথা সামান্য আলোচনা করা হইল।

(ক) **ঢালাই লোহা** :—ইহার গলনাঙ্ক প্রায় 1200°C। তাই অন্যান্য লোহা অপেক্ষা কম তাপে গলে। ইহা বেশ কঠিন এবং ভারসহ হয় কিন্তু ভঙ্গুর। ইহা দ্বারা স্থায়ী চুম্বক প্রস্তুত হয় না।

(খ) **পেটালোহা** :—ইহা নরম এবং নমনীয়। তাই ইহাকে সহজেই পাতে ও তারে পরিণত করা যায়। ইহার গলনাঙ্ক অনেক বেশী (প্রায় 1500°C)। এই লোহায় চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না। সেইজন্য তড়িৎ চুম্বকে (Electro-magnet) ইহা ব্যবহার করা হয়।

(গ) **ইস্পাত** :—ইহা শক্ত, ভারবহনক্ষম, নমনীয় কিন্তু ভঙ্গুর। ইহাকে পিটাইয়া জোড়া দেওয়া যায়। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায় এবং পান (Tempering) দেওয়া যায়। ইহার গলনাঙ্ক ঢালাই ও পেটা লোহার মাঝামাঝি।

মনে রাখিবে সব লোহাই চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং দেখিতে অনেকটা সাদা রং-এর হয়।

ব্যবহার :—ভারতে লোহার ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরাজত্বের আমলে নির্মিত দিল্লীর লৌহ স্তম্ভটি আজও ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বর্তমান যুগেও ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। সামান্য একটি সূচ হইতে আরম্ভ করিয়া দা, খন্তা, রেল, পুল, কল-কব্জা ট্যাঙ্ক, বন্দুক, কামান প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ লোহা হইতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং সহজেই বুঝিতেছ লোহা আমাদের কত প্রয়োজনীয় জিনিষ।

ঢালাই লোহা প্রধানত ইস্পাত ও পেটা লোহা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া সহজেই গলান যায় বলিয়া ইহার দ্বারা কড়াই, আলোকস্তম্ভ (light post) রেলিং, পাইপ প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

তার, জাল, শিকল, লোহার শিট্ বা পাত, দা, খন্তা, বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পেটা লোহার ব্যবহার করা হয়।

রেল লাইন, বরগা, সেতু, কামান, কাঁচি, ছুরি, স্প্রিং, রেলের চাকা, ইঞ্জিন, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইস্পাতের ব্যবহার হয়।

তামা (Copper)

অবস্থান :—পৃথিবীতে যত তামা উৎপন্ন হয় তাহার বেশীর ভাগই আমেরিকা হইতে আসে। আমাদের দেশে বিহারের সিংভূম জেলার ঘাটশীলাতে তামার আকরিক পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সিকিম ও দার্জিলিংএর নিকটস্থ পাহাড়েও কিছু কিছু তামার আকরিক পাওয়া যায়। তামার প্রধান আকরিকের নাম **কপার পাইরাইটস্**। ইহা ছাড়া **ম্যালাকাইট্** ও **অ্যাজুরাইট** নামক আকরিক হইতেও তামা পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্ম :—তামার একটি বিশেষ লাল রং আছে যাহাকে 'তামাটে লাল' বলা হয়। ইহা নরম, ঘাতসহ ও প্রসারণশীল। ইহা উত্তম বিদ্যুৎ ও উত্তাপের পরিবাহী। ইহার গলনাঙ্ক 1083°C। গলনাঙ্কের ঠিক নিচে ইহা ভঙ্গুর হইয়া যায়।

ব্যবহার :—বিদ্যুৎ-শিল্পে তামা সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে অধিকাংশ সময়েই তামার তার ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ প্রলেপণ (electro plating), ব্লক তৈয়ারীর কাজে, বাসনপত্র ও মুদ্রা প্রস্তুত করিতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তাহা ছাড়া সোনা, রূপা, টিন, দস্তা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশাইয়া নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সংকর ধাতু উৎপন্ন করা হয়। সোনার সহিত অল্প তামার খাদ দিয়া গিনি সোনা প্রস্তুত করা হয়। তামা ও দস্তার সংকর ধাতুর নাম পিতল।

অ্যালুমিনিয়ম (Aluminium)

অবস্থান :—অ্যালুমিনিয়াম প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না বটে কিন্তু প্রচুর পরিমানে মাটি, পাথর, কাদা প্রভৃতির সংগে যৌগিক পদার্থরূপে অবস্থান করে। সকল ধাতু অপেক্ষা আলুমিনিয়ামের পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠে সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম **বক্সাইট, ক্রায়োলাইট**, **ক্যাওলিন** এবং **ফেলস্পার**।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানে উৎকৃষ্ট বক্সাইট পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও কেরালায় আলুমিনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা আছে।

ভৌত ধর্ম :—অ্যালুমিনিয়াম খুব হাল্কা, রূপার মত সাদা এবং উত্তম

নমনীয় এবং প্রসার্যমান। ইহাকে চাপ দিয়া পাত ও টানিয়া তার করা যায়। ইহা তামার মত বিদ্যুৎ ও উত্তাপের সুপরিবাহী। ইহা খুব শক্ত।

ব্যবহার :—অ্যালুমিনিয়াম এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী ও নানাপ্রকার বাসন-প্রস্তুত করিতে লাগে। বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট। উচ্চচাপে উহাকে কাগজের মত পাতলা পাতে (foil) পরিণত করা যায়। এই পাত দিয়া সিগারেট, চকোলেট প্রভৃতির প্যাকেট মোড়া হয়। উহার গুড়া সাদা রং ও বাজি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সংকর-ধাতু ইহা দ্বারা তৈয়ারী হয়। চুনি, পান্না প্রভৃতি দামী পাথর আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। কৃত্রিম উপায়েও এই পাথরগুলি প্রস্তুত করা যায়।

দস্তা (Zinc)

অবস্থান :—জিঙ্ক বা দস্তা প্রকৃতিতে যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার প্রধান আকরিকের নাম **জিঙ্ক-ব্লেন্ড**। ইহা জিঙ্ক ও সালফারের একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা ছাড়া **ক্যালামাইন** ও **জিঙ্কাইট** আকরিক হইতেও জিঙ্ক পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম দেশে জিঙ্ক নিষ্কাশন করা হয়। ভারতের অনেক স্থানে জিঙ্ক ব্লেন্ড পাওয়া যায় কিন্তু ভারতে এখন জিঙ্ক নিষ্কাশন করা হয় না।

ভৌত ধর্ম :—দস্তা নীলাভ সাদা ধাতু। সাধারণ তাপমাত্রায় উহা ভঙ্গুর 100—150°C তাপমাত্রায় উহা নমনীয় হয় এবং তারে বা পাতে পরিণত করা যায়। 419°C উষ্ণতায় দস্তা গলিয়া যায় এবং 920°C উষ্ণতায় উহা উদ্বায়ী হয়।

ব্যবহার :—দস্তার ব্যবহার বহুবিধ। টর্চের ব্যাটারীর খোল দস্তার পাতের নির্মিত। লোহার জিনিষকে মরিচা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দস্তার প্রলেপ (galvanization) দেওয়া হয়। জলের বালতি, ঘর ছাউনির টিন প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে লোহার পাতের উপর দস্তার প্রলেপ যুক্ত পাতের তৈয়ারী নানাপ্রকার সংকর-ধাতু (পিতল, কাসা প্রভৃতি) তৈয়ারী করিবার জন্য জিঙ্কের প্রয়োজন হয়। মুদ্রা ও জিঙ্ক হোয়াইট (একটি বিশেষ রং) প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

রূপা (Silver)

অবস্থান :—রূপা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণত তামা ও সোনার সহিত মিশ্র অবস্থায় উহাকে মেক্সিকো এবং নরওয়ে দেশে পাওয়া

যায়। ভারতবর্ষে রূপার আকরিক নাই বলিলেই চলে। **আরজেনটাইট্, হর্নসিলভার, রুবি সিলভার** প্রভৃতি রূপার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম।

ভৌত ধর্ম ঃ—রূপা চক্‌চকে সাদা ধাতু। ইহাকে বেশ মসৃণ এবং পাতলা করা যায়। ইহা খুবই নমনীয়। ইহার গলনাঙ্ক 960°C। ইহা তাপ ও তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে সর্বোত্তম।

ব্যবহার ঃ—ইহা মুদ্রা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে ইহার নানা প্রকার যৌগিক-দ্রবণ বিক্রিয়ক (Reagent) রূপে ব্যবহৃত হয়। রূপার তড়িৎ-প্রলেপন দিয়া অনেক নিকৃষ্ট ধাতুকে চক্‌চকে করা হয়। ইহার দ্বারা নানা প্রকার অলংকার প্রস্তুত করা হয়।

সোনা (Gold)

অবস্থান ঃ—সোনা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলি পাথরের সংগে মিশিয়া থাকে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, কোরিয়া এবং ভারত স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি বিখ্যাত।

ভৌতধর্ম ঃ—সোনা হলুদ রঙের চক্‌চকে ধাতু। ইহা খুবই নমনীয় এবং প্রসারণশীল। ইহা তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশী (19·5)।

ব্যবহার ঃ—গহনাপত্র ও মুদ্রা প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের ব্যবহার হয়। ইহার সাহায্যে অন্যান্য ধাতুর উপর তড়িৎ প্রলেপন দেওয়া হয় ; নানাপ্রকার স্বর্ণঘটিত ঔষধ প্রস্তুতে ইহা লাগে।

সংকর ধাতু (alloy) :—

দুই বা ততোধিক ধাতু একসঙ্গে মিশাইয়া তাপ প্রয়োগ করিলে গলিয়া পরস্পরের মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া যায়। পরে বিগলিত মিশ্রণটিকে শীতল করিলে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে **সংকর ধাতু** বলে। পিতল, কাঁসা, জার্মান সিলভার, ঝালাই-ধাতু প্রভৃতি সংকর ধাতুর উদাহরণ।

পিতল (Brass) :—পিতল হলুদ রং-এর একটি সংকর ধাতু। ইহা তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয়। দস্তা ও তামার অনুপাতের উপর নির্ভর করে পিতলের গুণাগুণ। পিতলে সাধারণত তামার ভাগ শতকরা 60—30

ও দস্তার ভাগ 40—20 হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত পিতলের বাসনপত্র ব্যবহার করি তাহাতে প্রায় শতকরা 30 ভাগ দস্তার সহিত 70 ভাগ পিতল মিশ্রিত থাকে।

ঘটি, গামলা, গাড়ু প্রভৃতি নানাবিধ তৈজসপত্র পিতলে তৈয়ারী হয়। টিউব, রড, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খেলনা, তালা, চাবি প্রভৃতিতেও পিতলের ব্যবহার খুব আছে। তাহা ছাড়া পিতলের উপর তড়িৎ-লেপন (electro-plating) করিয়া বহু প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করা হয়।

কাঁসা (Bell-metal)—কাঁসা তামা ও টিনের একটি সংকর ধাতু। 4 বা 5 ভাগ তামার সঙ্গে একভাগ টিন মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। কাঁসার পাত্রে আঘাত করিলে বেশ জোর শব্দ হয় বলিয়া ইহা দ্বারা খুব ভাল ঘণ্টা তৈয়ারী হয় তাই ইহাকে ইংরাজীতে Bell-metal বলে।

শতকরা 90 ভাগ তামার সংগে 10 ভাগ টিন মিশাইয়া যে সংকর ধাতু তৈয়ারী করা হয় তাকে ব্রোঞ্জ (Bronze) বলে। ব্রোঞ্জের ব্যবহার আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালেও ছিল। প্রাচীন যুগের মানুষেরা ইহা দ্বারা বাসন-পত্র, মূর্তি ও নানাপ্রকার অস্ত্রাদি তৈয়ারী করিত। ব্রোঞ্জে ঢালাই-এর কাজ খুব ভাল হয়, তাই পদক, মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি ব্রোঞ্জের তৈয়ারী করা হয়। আজকাল মূর্তি তৈয়ারী করিবার জন্য যে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা 90 ভাগ তামা, 5 ভাগ টিন, 4 ভাগ দস্তা ও 1 ভাগ সীসা থাকে।

অল্প দস্তা ও সীসা মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করিলে ইহা সহজে ক্ষয় পায় না তাই জলের কল, ভালভ্ (valve) পিষ্টন প্রভৃতি এই জাতীয় ব্রোঞ্জের করা হয়।

ব্রোঞ্জের সংগে শতকরা একভাগ ফসফরাস মিশাইয়া ফসফর ব্রোঞ্জ (Phosphor-Bronze) পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে ইহার ব্যবহার খুব বেশী।

জার্মান সিলভার (German-Silver) : ইহা তামা, দস্তা ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈয়ারী একটি সংকর ধাতু। ইহাতে সাধারণত শতকরা 50—60 ভাগ তামা, 30—20 ভাগ দস্তা আর 20 ভাগ নিকেল থাকে। মনে রাখিবে ইহাতে রূপার (silver) ভাগ মোটেও নাই। কিন্তু দেখিতে অনেকটা রূপার মত চকচকে বলিয়া ইহাকে 'জার্মান সিলভার' বলা হয়। ইহা নানা প্রকার বাসন-পত্র, প্লেট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়।

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির প্রাকৃতিক অবস্থান, ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—

(a) তামা, (b) দস্তা, (c) অ্যালুমিনিয়াম, (d) রূপা এবং (e) সোনা।

২। লোহার অবস্থান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। বিভিন্ন প্রকার লোহার ধর্ম ও ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। সংকর ধাতু কি? বিভিন্ন ধাতুর অনুপাতের উপর কি সংকর ধাতুর গুণাগুণ নির্ভর করে?

৪। নিম্নলিখিত সংকর ধাতুগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—

(i) কাঁসা, (ii) পিতল ও (iii) জার্মান সিলভার।

৫। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(i) হিমাটাইট হইতে কি ধাতু পাওয়া যায়?

(ii) ঢালাই লোহা ও পেটা লোহার তফাৎ কি?

(iii) ব্রোঞ্জ, ফস্‌ফর-ব্রোঞ্জ ও বেল-মেটাল কি?

(iv) লোহাকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু বলা হয় কেন?
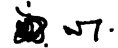
(v) গ্যালভানাইজেসন্ কাহাকে বলে?

Objective test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

A. 'Yes' or 'No' type test.

'হ্যাঁ বা 'না' লিখিয়া উত্তর কর—

(i) ইস্পাত এক প্রকার সংকর ধাতু।

(ii) দস্তার পাতলা পাতে সিগারেট ও চকলেটের প্যাকেট মোড়ান হয়। না·

(iii) ভারতের মহীশূরের কোলার খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

(iv) আলোকস্তম্ভ (light post) প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ ইস্পাত ব্যবহার করা হয়।

(v) জার্মান-সিলভারে কিছু পরিমাণ সিলভার থাকে।

B. Completion type test.

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(i) —দ্বারা ঘণ্টা তৈয়ারী হয়।

(ii) হোয়াইট জিঙ্ক এক প্রকার— ।

(iii) ডুরালুমিন—একটি সংকর ধাতু।

C. Multiple choice type test :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। ইহাদের মধ্যে যে উত্তরটি ঠিক তাহার নিচে দাগ দাও—

(i) প্রাচুর্য হিসাবে নিম্নের কোন্ ধাতু সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়?
লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা।

(ii) নিম্নের কোন্ জাতীয় লোহা অল্প তাপে গলে?
ঢালাই লোহা, ইস্পাত, পেটা লোহা।

(iii) সিগারেটের প্যাকেট কোন্ ধাতুর পাতে মোড়া হয়?
দস্তা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম।

(iv) নিম্নলিখিত ধাতুগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়?
লোহা, সোনা, তামা।

D. Completion type test :—

শূন্যস্থান পূরণ কর—

(i) লোহা এবং—মিশ্রণে ইস্পাত তৈয়ারী হয়

(ii) তামা ও বিদ্যুতের—

(iii) ইস্পাতের সাহায্যে—চুম্বক তৈয়ারী হয়

(iv) ঢালাই লোহার গলনাঙ্ক—সেন্টিগ্রেড।
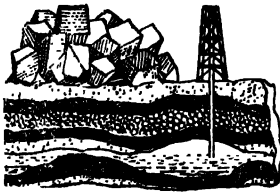
চতুর্থ অধ্যায়

খনিজ এবং আকরিক
MINERALS AND ORES

কয়লা (Coal)—কয়লা খনিজ পদার্থ। কিন্তু উহার উৎপত্তি হয় গাছপালা হইতে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে আমাদের এই পৃথিবী পৃষ্ঠ ছিল ফার্ণজাতীয় (ঢেঁকিশাক) নানাপ্রকারের গাছপালার ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে
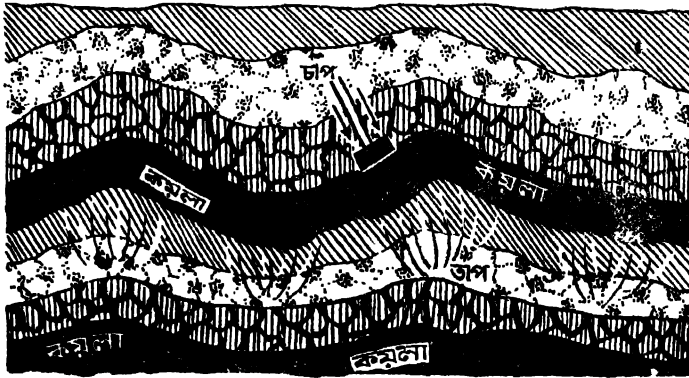
১৪ নং চিত্র—ভূগর্ভে কয়লার উৎপত্তি

ভূপৃষ্ঠের উত্থান পতনে বা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জলস্রোতে নিম্নভূমিতে গিয়া জমিবার ফলে জলাজায়গার বনভূমি স্তরে স্তরে মাটির নীচে চাপা পড়িত। কালক্রমে এই সকল উদ্ভিদ্ নানা প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, উপরকার শিলাস্তরের চাপে এবং ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। (৪১ নং চিত্র)। যদি এক খণ্ড কয়লাকে ভাজে-ভাজে ছুরি দিয়া ভাঙিয়া বেশ ভালভাবে লক্ষ্য কর তবে উহার

মধ্যে ফার্ণ জাতীয় গাছের বিভিন্ন অংশের ছাপ সময় সময় দেখিতে পাইবে। ইহাদিগকে **জীবাশ্ম** বলে। (৪২ নং চিত্র দেখ)।
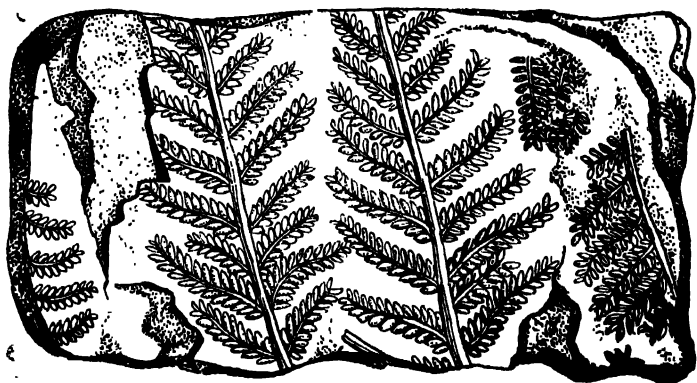
২ নং চিত্র—কয়লায় ভাজে ফার্ণ জাতীয় গাছের ছাপ

কয়লার ব্যবহার বহুবিধ। ইহার প্রধান ব্যবহার হইল জ্বালানী হিসাবে। রেল্ ইঞ্জিন, কলকারখানা, জাহাজ প্রভৃতি পরিচলনে ও গৃহস্থালীর কাজের জন্য যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণতঃ কয়লা হইতে উৎপাদন করা হয়। ইহা ছাড়া কোক, গ্যাস কার্বন ও কোল গ্যাস, আলকাতরা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ কয়লা হইতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকারের রাসায়নিক পদার্থ, সেকারিণ, কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি কয়লা হইতে উৎপন্ন করা হয়।

কোক (Coke) :—ইহা কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation of coal) সময় অনুযায়ী পদার্থ হিসাবে ইহা অবশিষ্ট থাকে। ইহা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত। তাহা ছাড়া ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum) :—পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল মাটির বহু নিম্নে স্তরীভূত শিলার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাও কয়লার ন্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মাটির নিচে চাপা-পড়া জীবজন্তুর দেহ নিঃসৃত তৈলজাতীয় পদার্থসমূহের কোন অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপর জমা হইয়া তৈল খনির সৃষ্টি করিয়াছে। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোলিয়াম প্রস্তুত হইতেছে।

ব্যবহার:—পেট্রোলিয়ামকে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার রক্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। আধুনিক যানবাহন বিশেষতঃ মোটর গাড়ী, বিমান ট্রাক্টর ইত্যাদিতে জ্বালানী হিসাবে ইহার ব্যবহার হয়। তাহা ছাড়া আজকাল অনেক দেশেই জাহাজ, রেলগাড়া এবং বড় বড় শিল্পের যন্ত্রপাতি
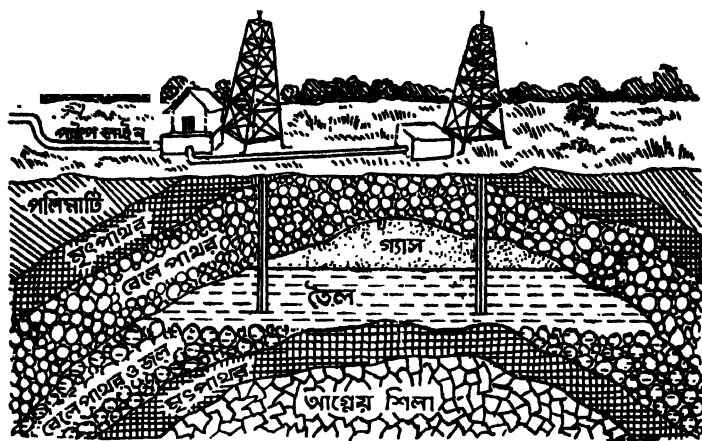
৪৩ নং চিত্র—খনি হইতে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন

পেট্রোলিয়ামের সাহায্যেই চালান হয়। পেট্রোলিয়মের উপজাত হিসাবে মোম, পীচ, লুব্রিকেটিং ও গ্রীজ তেল পাওয়া যায়। তৈলখনি অঞ্চলে যে দাহ্য গ্যাস পাওয়া যায় তাহাদের সাহায্যে আলো জ্বালান ও রন্ধন কার্য করা হয়। ইন্ধন হিসাবে ইহা কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহা স্থানান্তরে পাইপের সাহায্যে সহজেই লইয়া যাওয়া যায়।

প্রশ্নাবলী

১। লোহা এবং আলুমিনিয়াম সংকর ধাতুর সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৩। নিম্নলিখিতগুলির উপর টীকা লিখ—

(ক) খনিজ, (খ) আকরিক, (গ) কোক এবং (ঘ) জীবাশ্ম।

অ্যামিবা (Amoeba)

অ্যামিবা অতি ক্ষুদ্র এককোষী আদ্যপ্রাণী (Protozoa)। জীবকুলের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জীব। একটি মাত্র কোষের সাহায্যেই ইহা খাদ্য গ্রহণ, চলাফেরা বংশবিস্তার প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করে। ইহাকে খালি চোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইহার অনেক খবর জানা যায়।

দেহের গঠন (Structure) :—আমাদের মত অ্যামিবার দেহে হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ কিছুই নাই। ইহা দেখিতে একবিন্দু থলথলে জেলির মত। (৪৪ নং চিত্র দেখ)। এই থলথলে পদার্থটিকে বলে **প্রটোপ্লাজম**
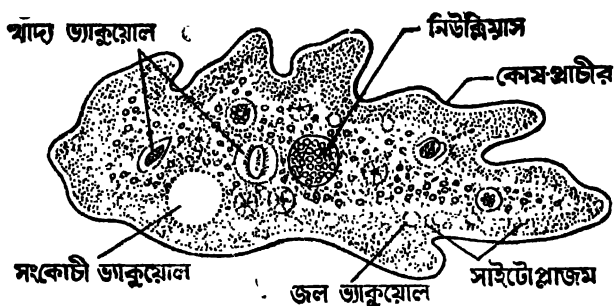
৪৪ নং চিত্র—অ্যামিবা

(Protoplasm) প্রটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত অংশকে বলে **নিউক্লিয়াস** (nucleus) এবং বাকা অংশকে **সাইটোপ্লাজম** (cytoplasm) বলে। ইহা ছাড়া অ্যামিবার দেহকোষের মধ্যে কয়েকটি ছোট বড় বুদ্‌বুদের মত অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে **ভ্যাকুওল** (vacuole) বলে। উহারা আবার তিন প্রকারের, যথা (i) **সঙ্কোচী ভ্যাকুওল**—ইহা বেশ বড় এবং সংখ্যায় মাত্র একটি। ইহার সাহায্যে অ্যামিবা দেহে অতিরিক্ত জলসঞ্চয় করিয়া রাখে এবং দূষিত পদার্থ বাহিরে

নিক্ষেপ করে। (ii) **খাদ্য ভ্যাকুওল**—ইহারা সংখ্যায় অনেক। ইহাদের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। (iii) **জল ভ্যাকুওল**—ইহাদের সংখ্যাও একাধিক। ইহাদের মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে। অ্যামিবার সমস্ত কোষটি একটি পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে। তাহাকে **কোষাবরণী** (plasma membrane) বলে। অ্যামিবার আকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োজন মত ইহার দেহ হইতে কচ্ছপের মত হাত পায়ের অংশ বাহির হইয়া আসে, আবার প্রয়োজন মিটিয়া গেলে ইহারা দেহের সংগে মিলাইয়া যায়। এই নকল হাত-পাগুলিকে ক্ষণপদ (Pseudopodia—**সিউডোপোডা**) বলে। ইহাদের সাহায্যে অ্যামিবা চলাফেরা এবং খাদ্য গ্রহণ করে।

খাদ্যগ্রহণ—চলিবার পথে কোন খাদ্যকণা পাইলে অ্যামিবা উহাকে নকল হাত পা বাহির করিয়া ঘিরিয়া ফেলে এবং ক্রমে দেহের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লয়। (৪৫ নং চিত্র দেখ) ইহা সর্বাঙ্গ দিয়া শ্বাসকার্য চালায়।
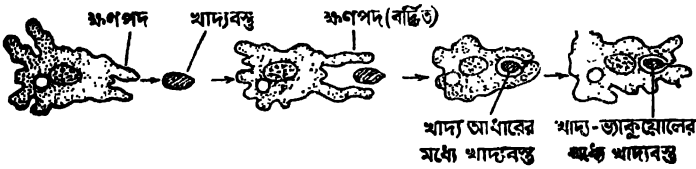
৪৫ নং চিত্র—অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ

বংশবৃদ্ধি (Reproduction)—অনুকূল অবস্থায় অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি হয় অতি সহজে। একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবার নিউক্লিয়াসটি প্রথমে লম্বা হয় এবং পরে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। ইহার পর সাইটোপ্লাজমও দুই
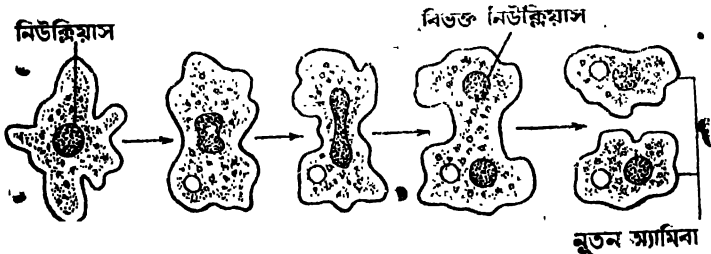
৪৬ নং চিত্র—অ্যামিবার বংশবিস্তার

ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে (৪৬ নং চিত্র দেখ)।

আবার প্রতিকূল অবস্থায় অ্যামিবা দেহের চারিদিকে একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় ভিতরের নিউক্লিয়াসটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হইয়া যায়। পরে অনুকূল অবস্থায় আসিলে অ্যামিবার আবরণটি ফাটিয়া যায় এবং প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস একটি শিশু অ্যামিবার সৃষ্টি করে।

ঈস্ট্ (Yeast)

ঈস্ট্ একটি ছত্রাক (fungus) জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার দেহও একটি কোষ দিয়া গঠিত। ইহার দেহের গঠন এবং বংশ বিস্তারের পদ্ধতি খুবই সরল।

গঠন (Structure) :—অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে ঈস্টের আকার গোলাকার, অনেকটা ডিমের মত। ইহার কোষটি একটি পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে। ইহার ভিতরে থাকে সাইটোপ্লাজম এবং মাঝখানে বিশেষ গড়নের একটি নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসটি একটি বড় ভ্যাকুওল এর সংগে যুক্ত থাকে আর ভ্যাকুওলের মধ্যে থাকে ক্রোম্যাটিন নামক পদার্থের একটি জালক। ঈস্টের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রোটিন ও গ্লাইকোজেনের কণা দেখিতে পাওয়া যায়।

বংশবিস্তার (Reproduction) :--ঈস্টের বংশবিস্তার তিনপ্রকারের হইয়া থাকে, যথা—(i) অঙ্গজ, (ii) অযৌন এবং (iii) যৌন।
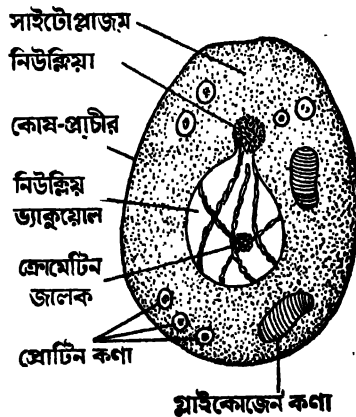
৪৭ নং চিত্র ঈস্টের দেহ

প্রণালীতে ঈস্টের একটি কোষ অ্যামিবার মতই দুইভাগে বিভক্ত

হইয়া দুইটি কোষের সৃষ্টি করে। অযৌন পদ্ধতিতে প্রথমে কোষটি নিউক্লিয়াস চারিটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পরে অনুকূল অবস্থায় প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস এক একটি কোষের সৃষ্টি করে। আর যৌন পদ্ধতিতে দুইটি কোষ কাছাকাছি
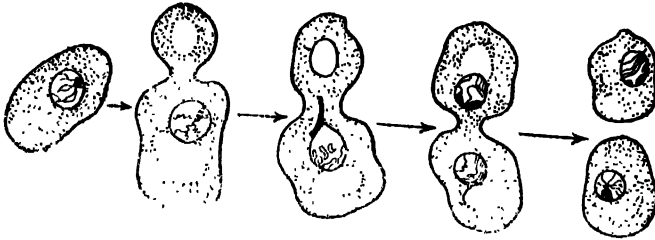
৪৮ নং চিত্র—অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের বিভিন্ন অবস্থা

আসে এবং ইহাদের নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিয়া একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। পরে নিউক্লিয়াসটি ভাঙিয়া আট ভাগে বিভক্ত হয় এবং এক একটি নূতন ঈস্টের সৃষ্টি করে।

ঈস্ট শর্করা-জাতীয় পদার্থকে, অ্যালকোহলে পরিণত করে। তাই চিনি, গুড় বা আঙুরের রস হইতে মদ তৈরীর কাজে ঈস্ট অপরিহার্য।

ফার্ণ (Fern)—যে সকল অপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক করা যায় তাহাদিগকে **টেরিডোফাইটা** বর্গের উদ্ভিদ বলে।

৪৯ নং চিত্র—ফার্ণ গাছ
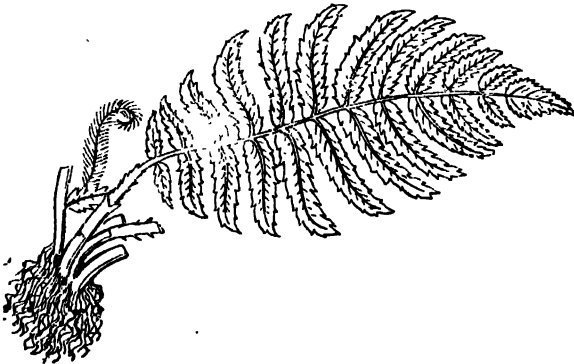
সাধারণ ফার্ণ (ঢেঁকিশাক) গাছ এই জাতীয় উদ্ভিদ্। বাংলাদেশের নানাস্থানে ঝোপে-জঙ্গলে ভিজা মাটিতে ইহাদিগকে জন্মিতে দেখা যায়।

গঠন (Structure) :—ফার্ণ গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা পৃথকভাবে বোঝা যায়। কাণ্ড ছোট ও মোটা এবং ইহার অনেকটা মাটির নিচে থাকে।

ডগাটি মাটি হইতে সামান্য উপরে থাকে। এইরূপ কাণ্ডকে **রাইজোম** বলে। ফার্ণের পাতাগুলি বেশ বড় হয়। পত্রকগুলি পাতার ডাটার চারিধারে পাখীর পালকের মত সজ্জিত থাকে। পাতার কিনারায় খাঁজকাটা থাকে। তরুণ অবস্থায় ইহার অগ্রভাগ কুণ্ডলিত থাকে। পত্রের বিভিন্ন অংশ অসংখ্য রোম দ্বারা আবৃত থাকে।

বংশবৃদ্ধি:—গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে পত্রকের নিম্নপৃষ্ঠে শিরাগুলির উপর পিঙ্গল বা হলুদ বর্ণের অনেকগুলি বৃক্কাকৃতি (kidney-shaped) বিন্দু উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে **সোরাই** (sori) বলে। সোরাই এর রেণুস্থলীতে অসংখ্য রেণু থাকে। পরিপক্ক হইলে রেণুগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

পরে অনুকূল অবস্থায় রেণু অঙ্কুরিত হইয়া পানের ন্যায় দেহ গঠন করে। ইহাকে **প্রোথ্যালাস** বলে। প্রোথ্যালাসের মধ্যে থাকে পুংজনন পুংধানী
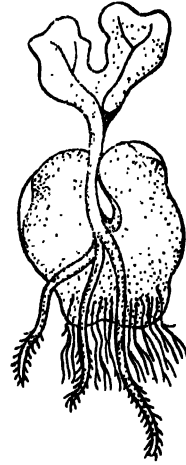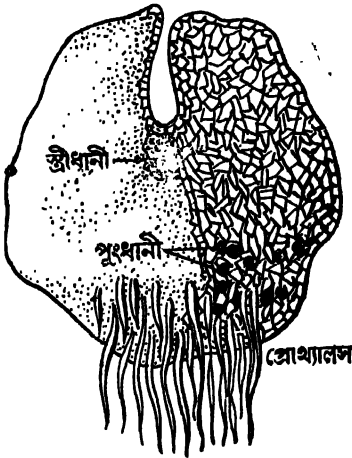
৫০ নং চিত্র—রেণু অঙ্কুরিত হইয়া পানের ন্যায় দেহ গঠন করে

৫১ নং চিত্র—শিশু ফার্ণ গাছ

এবং স্ত্রী জনন অঙ্গ স্ত্রীধানী। স্ত্রীধানীতে থাকে ডিম্বাণু। ডিম্বাণুর সহিত নানা উপায়ে পুংধানীর পরিপক্ক শুক্রাণুর মিলন হইলে ইহা নিষিক্ত হয় এবং **উস্পোরের** (Oospore) সৃষ্টি করে। কালক্রমে উস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া ফার্ণের ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। ভ্রূণ হইতে শিশু ফার্ণ গাছের জন্ম হয় এবং প্রোথ্যালাসটি ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

ফার্ণের জীবন ইতিহাসে পর্যায় ভেদ (Alteration of generation):—

ফার্ণের জীবনে দুইটি পৃথক ভাগ আছে। প্রথম ভাগে উস্পোর হইতে

পূর্ণাঙ্গ ফার্ণের জন্ম এবং উহার পাতার সোরাসে রেণু মাতৃকোষের উৎপত্তি। ফার্ণের জীবনের এই অংশকে রেণুধর উদ্ভিদ (sporophyte) বলা হয়। এই অংশে কোন যৌন-জনন প্রক্রিয়া থাকে না। আর দ্বিতীয় ভাগ হইল রেণু হইতে প্রোথ্যালাসের উৎপত্তি, পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মিলন ও উস্পোরের সৃষ্টি। এই অংশ গৌণ এবং ক্ষণস্থায়ী। এই ভাগকে জনন কোষধর উদ্ভিদ (gamétophyte) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। অ্যামিবার দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। ঈস্টের দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
৩। ফার্ণ গাছের দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
৪। প্রোথ্যালাস ও ভ্যাকুওল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

Objective test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

A. সত্য উক্তির ডানদিকে T এবং মিথ্যা উক্তির ডানদিকে F লেখ।

(i) অ্যামিবারা কিছু খায় না।
(ii) ঈস্ট এক প্রকার প্রাণী।
(iii) অ্যামিবা নাক দিয়া শ্বাস কার্য চালায়
(vi) অ্যামিবার দেহের থলথলে পদার্থটিকে প্রটোপ্লাজম বলে
(v) ঈস্টের আকার অনেকটা ডিমের মত।

B. শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) অ্যামিবা অতি ক্ষুদ্র——জীব।
(ii) জীবকুলের মধ্যে অ্যামিবাই সর্বাপেক্ষা——।
(iii) ঈস্ট একটি—জাতীয় উদ্ভিদ্।
(iv) ঈস্টের বংশবিস্তার——প্রকার উপায়ে হইয়া থাকে।
(v) ফার্ণ গাছ——জাতীয় উদ্ভিদ্।

C. 'Yes' or 'No' type test.

'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর কর :—

(i) অ্যামিবাদের হাত পা, নাক, মুখ ইত্যাদি আছে।
(ii) ফার্ণ গাছের কাণ্ড রাইজোম জাতীয়।
(iii) সোরাই ছত্রাক জাতীয় ঈস্ট গাছে জন্মায়।
(iv) অ্যামিবার বংশবিস্তারের সময় নিউক্লিয়সটি ভাঙিয়া যায়।
(v) সাইটোপ্লাজম প্রটোপ্লাজমেরই একটি অংশ।

পূর্ণাঙ্গ ফার্ণের জন্ম এবং উহার পাতার সোরাসে রেণু মাতৃকোষের উৎপত্তি। ফার্ণের জীবনের এই অংশকে রেণুধর উদ্ভিদ (sporophyte) বলা হয়। এই অংশে কোন যৌন-জনন প্রক্রিয়া থাকে না। আর দ্বিতীয় ভাগ হইল রেণু হইতে প্রোথ্যালাসের উৎপত্তি, পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মিলন ও উস্পোরের সৃষ্টি। এই অংশ গৌণ এবং ক্ষণস্থায়ী। এই ভাগকে জনন কোষধর উদ্ভিদ (gametophyte) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। অ্যামিবার দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। ঈস্টের দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
৩। ফার্ণ গাছের দেহের গঠন ও জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।
৪। প্রোথ্যালাস ও ভ্যাকুওল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

Objective test (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা)

A. সত্য উক্তির ডানদিকে T এবং মিথ্যা উক্তির ডানদিকে F লেখ।

(i) অ্যামিবারা কিছু খায় না।
(ii) ঈস্ট এক প্রকার প্রাণী।
(iii) অ্যামিবা নাক দিয়া শ্বাস কার্য চালায়
(vi) অ্যামিবার দেহের থলথলে পদার্থটিকে প্রটোপ্লাজম বলে। T
(v) ঈস্টের আকার অনেকটা ডিমের — । —

B. শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) অ্যামিবা অতি ক্ষুদ্র——জীব। —
(ii) জীবকুলের মধ্যে অ্যামিবাই সর্বাপেক্ষা——।
(iii) ঈস্ট একটি——জাতীয় উদ্ভিদ্।
(iv) ঈস্টের বংশবিস্তার——প্রকার উপায়ে হইয়া থাকে
(v) ফার্ণ গাছ——জাতীয় উদ্ভিদ্।

C. 'Yes' or 'No' type test.

'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর কর :—

(i) অ্যামিবাদের হাত পা, নাক, মুখ ইত্যাদি আছে। না
(ii) ফার্ণ গাছের কাণ্ড রাইজোম জাতীয়।
(iii) সোরাই ছত্রাক জাতীয় ঈস্ট গাছে জন্মায়। হ্যাঁ
(iv) অ্যামিবার বংশবিস্তারের সময় নিউক্লিয়সেটি ভাঙিয়া যায়।
(v) সাইটোপ্লাজম প্রটোপ্লাজমেরই একটি অংশ। হ্যাঁ